





# ବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସ

ଶ୍ରୀଶରଦିନ୍ଦୁ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ



ଓରୁଦାସ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏଓ୍ଵ୍ ଜର୍ନାଲ୍  
୨୦୭ ୧୧ କର୍ମଓଽଧ୍ୟାୟାଳୟ ଛୁଟିଟ ... କଲିକତା-୬

তিন টাকা আট আনা

শ্রাবণ ১৩৫৮

প্রথম সংস্করণ



এই কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বাখালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের  
বাক্যলাব ইতিহাস গ্রন্থে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণে এইরূপ  
পাওয়া যায়—

‘মহাধাজাধিবাজ প্রথম কুমার গুপ্তের মৃত্যুর পব তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র  
স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আবোধন কবিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্ত যৌবরাজ্যে  
পুত্র মিত্রী ও হুণগণকে পরাজিত কবিয়া পিতৃবাজ্য রক্ষা কবিয়ছিলেন।  
কথিত আছে, যুববাজ ভট্টাবক স্কন্দগুপ্ত পিতৃকুলের বিচলিতা রাজলক্ষ্মী  
দ্বৈ কবিবাব জন্ত বাক্রি ত্রয় ভূমিশায়া অতিবাহিত কবিয়াছিলেন।  
প্রথমবার পরাজিত হইয়া হুণগণ উত্ত্বাপথ আক্রমণে বিরত হন নাই,  
প্রাচীন কপিলা ও গান্ধার অধিকার কবিয়া হুণগণ একটি নূতন রাজ্য  
স্থাপন কবিয়াছিল। ৪৩৫ খৃষ্টাব্দে পব হুণগণ পুনর্বার ভারতবর্ষে  
প্রত্যাগমন করে ও বাববার গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ কবে।’

আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কেবল স্কন্দগুপ্তের চবিত্র ঐতিহাসিক।

এই আখ্যায়িকায় নিক গল্প বনা ছাড়া অল্প কোনও উদ্দেশ্য যদি  
থাকে তবে তাহা বীরেন্দ্রনাথের ভাবায় ব্যক্ত করা বাইতে পারে—

হেথায় আর্থ হেথা অনাথ হেথায় দ্রাবিড় চীন

শক হুণ দল পাঠান মোগল এক দেহে হ’ল লীন।

অতীতে বাহা বাববাব ঘটনাছে ভবিষ্যতেও তাহা ঘটবে, ইতিহাসের  
এই আত্মনির্ভাব অবিশ্বাস কবিবার কাবণ নাই। যাহারা মাছুবে মাছুবে  
ভেদবুদ্ধি চিবহাবা কবিত্তে চাহে তাহারা ইতিহাসের অমোঘ ধর্ম লক্ষণ  
করিবার চেষ্টা করে, তাহারা শুধু বিচাৰমূঢ় নয়—মিথ্যাচারী।

সবশেষে এই কাহিনী সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত ~~বিশ্বাসযোগ্য~~ আছে

তাহা পাঠকপাঠিকাকে নিবেদন করা প্রয়োজন মনে করি। ১৯৩৮ সালে মুম্বৈতে থাকা কালে এই কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করি। কয়েক পরিচ্ছেদ লেখা হইবার পর সুদূর বোম্বাই হইতে আহ্বান আসিল, জীবনের সমস্ত কর্মস্থলী ওলটপালট হইয়া গেল। তারপর দীর্ঘ দশ বৎসব এ কাহিনী আর লিখিতে পারি নাই। শুধু সময়ের অভাবেই নয়, এ আখ্যায়িকা লিখিবার পক্ষে মনের যে ত্রৈকান্তিক অনন্তপবতা প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অতঃপর ১৯৪৮ সালে দৃঢ়ব্রত হইয়া আবার আখ্যায়িকার ছিন্নমুত্র তুলিয়া দিইয়াছি এবং আরম্ভের ঠিক বাবো বৎসর পরে শেষ করিষাছি।

বারো বৎসরের ব্যবধানে মানুষের মন এক প্রকার থাকে না ; চরিত্র দৃষ্টিভঙ্গী রসবোধ সবই বদলাইয়া যাইতে পারে ; সৃষ্টিশক্তিও তাবতমাত্রা ঘটা সম্ভব। গল্পের যে স্থানটিতে বাবো বহুবাব ফাঁক পড়িয়াছে পাঠকপাঠিকা হয়তো সহজেই তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন। যদি না পারেন, বুঝিব আমাদের অন্তর্লোকে মজাকালের মন্দিরা এখনও একই ছন্দে বাজিতেছে, তাহার তাল কাটে নাই।

১৯৫১  
মালাড্ }

শব্দিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### মোঙের বিলাপ

বৃদ্ধ হুণ-শ্রোদ্ধা মোঙ গল্প বলিতেছিল। নির্জন বনপথের পাশে ক্ষুদ্র একটি জলসত্র, এই সত্রের প্রপাপালিকা যুবতী অদূরে বসিয়া কবলঙ্গ-কপোলে মোঙের গল্প শুনিতেছিল।

চাৰিদিনকে প্রস্তবাকীর্ণ অসমতল ভূমিব উপর দেবদারু, গিয়াল ও মধুকৈব বন। পথেব ধাবে রন তত ঘন নয়, যত দূবে গিযাছে ততই নিবিড হইযাছে। অল্পচ পবতের শ্রেণী দ্বিপ্রহবের খব বৌদ্রে শঙ্কবৃত্ত সবীক্ষপেব স্নায় নিদ্রালুভাবে পডিযা আছে। নবাগত গ্রীষ্মের আলস্ত ও পক্ষ মধুক-কদোব গুণ স্নগন্ধ মিশিযা আতপ্ত বাতাসকে মদমহুর কবিযা তুলিযাছে।

এই পবত-কাকাব-তবঙ্গিত বিচিত্র দৃশেব ভিতব দিবা সঙ্গীর্ণ কুটিল পথটি বেন অতি বদ্রে নিজেকে প্রচ্ছন্ন বাপিযা দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে গিযাছে। দ্বিপ্রহবেও পথ জনহীন, এই পার্বত্য রাজ্যেব কেন্দ্রপূরী কপোতকূট এখান হইতে প্রায় ক্রোশেক পথ দক্ষিণে। পথেব পাশে রুদ্ধ প্রস্তবে নির্মিত একটি কুটীব—ইহাই জলসত্র, তাহার দুই পাশে দুইটি দীর্ঘ ঋজু দেবদারু বৃক্ষ ঘন কুঞ্চিত পরভারে স্থানটিকে ছায়াশীতল করিযা বাপিযাছে। বৃদ্ধ হুণ মোঙ, একটি দেবদারুর কাণ্ডে পৃষ্ঠ-ভার অর্পণ করিযা জালুদ্বয় বাহু দ্বারা আশ্বেষ্টন পূবক নিজ স্মৃতিকথা বলিতেছিল।

মহাবাজাধিরাজ পরমভট্টাবক মগধেধর স্বন্দের ষোড়শ রাজ্যকে উত্তর-পশ্চিম ভাবেতব শৈলবন্ধুর অধিত্যকার একপ্রান্তে, বিটক নামক ক্ষুদ্র রাজ্যেব রাজধানী কপোতকূট হইতে অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র জলসত্রের তরুচ্ছাযামূলে আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

বৃদ্ধ মোঙ নিজের বিলাপপূর্ণ স্মৃতিকথা শুনাইতে ভালবাসিত। অর্থাৎ

যোদ্ধা জীবন শেষ হইয়াছে, দেহে আর শক্তি নাই; যে দুর্ধৰ্ষ প্রকৃতি লইয়া পচিশ বৎসর পূর্বে মুক্ত রূপাণ হস্তে এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও বোধকরি নিভিয়া গিয়াছে। তাই, উত্তর মেরুর সূদীর্ঘ রাত্রি তুষার সঙ্কটের মধ্যে অগ্নি জালিয়া মেরুবাসী যেমন সূর্যের স্বপ্ন দেখে, ভরাগ্রস্ত মোড়্ তেমনই হুণ জাতির অতীত বীৰ্য গৌরবের স্বপ্ন দেখিত। তাহার দেহ খর্ব, মাংসপেশী ক্ষয় হইয়া দেহের চর্ম লোল করিয়া দিয়াছে; তথাপি সে যে এককালে অতিশয় বলশালী ছিল তাহা তাহার শিথিল-চর্মাবৃত দেহ-কঙ্কালের স্তম্ভপুল প্রভৃ হইতে অনুমান হয়। কেশলেশহীন মুখমণ্ডল অগণিত কুঞ্চন চিহ্নে শুষ্ক নারিকেল ফলের আকৃতি ধারণ করিয়াছে; উচ্চ হস্ত ও ক্র-অস্থির মাঝখানে ক্ষুদ্র চক্ষুদুটি কিন্তু সূক্ষ্ম। মাথার উপর কয়েক গুচ্ছ পাংশুবর্ণ কেশ আপন বিরলতার ফাঁকে ফাঁকে কবোটির গঠন প্রকট করিতেছে।

মোড়ের কর্ণস্বৰ শ্রুতিমধুর নয়। হুণ জাতির কর্ণস্বৰ স্বভাবতই প্রসাদশুণবর্জিত; মোড়্ কথা কহিলে মনে হইত, শুকভারবাঈ গো-শকটের তৈলহীন চক্র হইতে আর্ত আপত্তি উথিত হইতেছে। নগরের পান-শালায় মোড়্ গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেই শ্রোতা বা উঠিয়া অল্প প্রস্থান করিত। কিন্তু তথাপি মোড়্ নিবাস হইত না; কোনও ক্রমে একটি শ্রোতা সংগ্রহ করিতে পারিলেই সে অতীতের কাহিনী আরম্ভ করিয়া দিত।

বর্তমানে মোড়ের একটি শ্রোত্রী জুটিয়াছিল—সে এই জলসত্রের প্রাপালািকা সুগোপা। তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা তম্বী, বয়স অনুমান কুড়ি বাইশ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুত পচিশ বৎসব। অধর প্রান্তে একটু চটুলতার আভাস, চক্ষুদুটি নীলাঞ্জন মেঘের স্নিগ্ধতায় সরস। সুগোপা কপোতকূটের স্নাজ-উদ্ভানের মালাকরের বনিতা, তাহার হাতের মালা নহিলে রাজকমারী—

কিন্তু স্নগোপাব পূর্ণ পরিচয় পবে প্রকাশ পাইবে।

মোঙ দস্তধাবন কাঠেব অঘেষণে প্রায় নগর বাহিবে জঙ্গলের মধ্যে আসে, কবজবৃক্ষেব দস্তকাঠ অস্ত্র পাওযা যায না। তখন দুদণ্ড স্নগোপার বন্ধুছে বসিয়া সে নিজেব শ্রিয় কাহিনী বলিয়া যায, স্নগোপাও আপত্তি করে না। সারাদিন তাহাকে একাকিনী এই প্রপাথ থাকিতে হয়, কচুং দুই চাবিজন দুবাগত পথিক জনপান করিবার জন্ত ক্ষণেক দাঁডায়, তক্ষা নিবাবণ কবিয়া নগরাভিমুখে চলিয়া যায, এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে মোঙেব গল্প তাহাব মন্দ লাগে না। সূদূব বক্ষু নদীব তীরে হুণেবা কি কবিয়া জীবনযাপন কবিত, তাবপব একদিন যাবাবর জাতির স্বভাবজ অস্থিবতা কেমন কবিয়া তাহাদেব বিশাল গোষ্ঠীকে গান্ধাবের সীমান্তে আনিয়া উপনীত কবিল, তারপর পঞ্চনদ-ধৌত শ্রামল উপত্যকাব লোভে তাহাবা কি ভাবে পঞ্চপালেব মত চাবিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, স্কন্দেব সহিত হুণদেব বুদ্ধ, হুণগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, তাবপব দ্বাদশ সহস্র হুণ এই বিটঙ্গ বাজ্য অধিকার কবিয়া বসিল, কপোতকুটে প্রবেশ কবিয়া বাজপুত্রী আক্রমণ কবিল—

মোঙ গল্প বণিতেছিল, স্নগোপা অদূবে পৌঠিকাব শ্রায় একটি উচ্চ প্রস্তবথণ্ডেব উপব বসিয়া কবলগ্নকপোলে শুনিতেছিলা—

দদূব ধনিবৎ একটি শব্দ মোঙেব কণ্ঠ হইতে বাহিব হঠল, ইগ তাহাব হাস্ত। ঞ্গনিক কৌতুক অপনোদিত হঠলে মোঙ বলিল, ‘মেঘ। গড্ডলিকা। হুণ জাতি আব নাই, ভেডা বনিয়া গিয়াছে। পচিশ বৎসব পূর্বে বাহাবা সিংহ ছিল, তাহাবা আজ ভেডা! কাহাকে দোষ দিব? আমাদেব ধিনি বাজা, ধিনি একদিন. স্বহস্তে এদেশেব বীর্ঘহীন অধিপতিশ মাথা কাটিয়া শূলীর্ঘে স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি আজ অহিংসা ধর্ম গ্রহণ কবিয়াছেন, বরাহ পর্যন্ত আহাির করেন না। ধর্ম! তরবারি

বাহার একমাত্র দেবতা, সে চৈতন্য নির্মাণ করিয়া কোন্ এক মৃত ভিক্ষুকের অস্থি পূজা করিতেছে ! হ হ হ—’ মোঙের কণ্ঠ হইতে আবার শ্লেষপূর্ণ মদূর ধ্বনি বাহির হইল ।

সুগোপা করতল হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—‘মহরাজ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন ।’

মোঙ ও বৃক্ষকাণ্ডের অবলম্বন ‘ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল, তালপত্রের পুত্তলীর দ্বায় সহসা দুই হস্ত আফালিত করিয়া বলিল—‘সেই কথাই তো বলিতেছি । কিন্তু কেন এমন হইল ? দ্বাদশ মন্ত্র শোণিত-লোলুপ মরু-‘সং পঁচিশ বৎসর পূর্বে এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তারারা আজ কোথায় ? ভেড়া—সব ভেড়া ।’

সুগোপার অধর কোণে একটু হাসি দেখা দিল ; সে বলিল—‘মোঙ, তবে তো ভুমিও ভেড়া ।’

মোঙ ও কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনশ্চ হেসে দিয়া বসিল, ক্ষুদ্র চক্ষুগল কিছুক্ষণ সুগোপার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল ; তারপর কতকটা ঘেন নিঙ্গ মনেই বলিল—‘অসির নথ, ঘোড়ার পিছনের পা এবং জীলোকের কটাফ—মাত্রের সমস্ত বিপদেব মূলে তেই তিনটি । হুণ শিশুকাল হইতেই প্রথম দুইটিকে এড়াইয়া চলিতে শিখে, কিন্তু ত্রৈ তৃতীয় বিপদই তার সবনাশ করিয়াছে । বেশ ছিলাম আমরা মরুর কোণে ; আমাদের বাণী বপহীনা নারীরা অশ্ব উত্তের সাহিত একসঙ্গে কাজ করিত, দুর্দম হুণশিশু প্রসব করিত—এদেশের কুহকিনীদের মত পুরুষকে মেঘ-শাবকে পরিণত করিতে পারিত না । প্রবাদ বাক্য মিথ্যা নয়, অসির নথ, ঘোড়ার পা আর জীলোকের কটাফ—’ মোঙ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ভাবে সুগোপার সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া শুষ্ক নারিকেলের মত মাথাটি নাড়িতে লাগিল ।

মুহু হাসিয়া সুগোপা বলিল—‘মোঙ—তোমার নাগসেনার কটাফ কি এখনও খুব তীক্ষ্ণ আছে ?’

মোঙ্ দুই হাত নাড়িয়া স্নগোপার পরিহাস দূরে সরাইয়া দিয়া বলিল—‘এক পুঙ্খের মধ্যে একটা জাতি নিবীৰ্ণ হইয়া গেল! আমরা না হয় বুড়া হইয়াছি—যৌবন ও অশ্বিনীদুগ্ধজাত মদ্যের মাদকতা চিরদিন থাকে না, কিম্বা আমাদের সন্তানেরাই বা কী? তাহারা হুণের পুত্র বটে, তবু তাহারা হুণ নয়। মক-সিংহের গুণসে একপাল ভেড়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।’

ভেড়ার উপমাটা বুদ্ধকে চাপিয়া ধরিয়াছে, তদুপরি সে উত্তরোত্তর উষ্ণতর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া স্নগোপা বলিল—‘সেজ্ঞা বিলাপ করিয়া লাভ নাই। এ দেশের নারীরা তোমাদের সাধিয়া বিবাহ করে নাই, তোমরাই বলপূৰ্বক তাহাদের বিবাহ করিয়াছিলে—এখন কাঁদিলে চলিবে কেন? আর, কলও নিতান্ত মন্দ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তোমাদের বংশধবেবা—আব কিছু না হোক তোমাদের চেয়ে সুশ্রী। তাহাদের কুল না থাক, শীল আছে।’

‘শীল আছে!’ মোঙের স্বর ক্রোধে আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল—‘কী প্রয়োজন শীলের? শিষ্টতার দ্বারা শত্রুর যুগু কাটিয়া লওয়া যায়? কশাব পরিবর্তে নৌজন্ত প্রয়োগ করিলে ঘোড়া অধিক দৌড়াইবে? আমরা যেদিন রাজধানী অধিকার করি সেদিন কি শিষ্টতা দেখাইয়াছিলাম? বাজপাখীর মত আমরা কপোতকুটির উপর পড়িয়াছিলাম—নগরের পথো-নালক পথে বস্তুর স্রোত বহিয়া গিয়াছিল! রাজপ্রাসাদের রক্ষীয়া আমাদের বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল—হ হ হ—’ মোঙ্ আবার হাসিল—‘রাজপ্রাসাদ বিজয়ের কথা শ্রবণ হইলে এখনও আমার রক্ত নৃত্য করিয়া ওঠে—’

স্নগোপা বলিল—‘রক্তপিপাসু হুণ, তবে সেই গল্পই বল, তোমার আক্ষেপ শুনিবার আগ্রহ আমার নাই।’

দূরস্থ শিকারের প্রতি চলচ্ছিত্তিহীন স্থবির ব্যাঘ্র যেভাবে তাকাইয়া

থাকে, মোঙ্ সেইভাবে শূন্নে তাকাইয়া বহিল, লালান্নিত রসনায় বলিতে লাগিল—‘সেদিন দুই মুঠি ভরিয়া সোনা লুঠ কবিয়াছিলাম। প্রাসাদের নিম্নে অন্ধকূপ কক্ষে সোনার দীনাব স্তূপীকৃত ছিল—আটজন বক্ষী সেই গর্তগৃহ পাহারা দিতেছিল তুষফাণ প্রথমে সেই ঙ্গুথ কোষা-গারেব সন্ধান পায়, আমবা ত্রিশ জন হুণ গিয়া বক্ষীদের কাটিয়া ফেলিলাম। তাবপব সকলে মিলিয়া সেই দীনাব স্তূপ . এত সোনা আর কখনও দেবিব না। তুষফাণ ছিল আমাদের নাযক, অধিকাংশ দীনার তাহাব ভাগে পড়িল। যুদ্ধ শেষ হইবাব পব সেই সোনা আমাদের রাজাকে উপহার দিয়া তুষফাণ চষ্টনছর্গেব অবিপতি হইবা বসিল—’

সুগোপা বলিল—‘এ জানি। তাবপর আব কি কবিলে?’

মোঙ্ বলিয়া চলিল—‘বহাগাব হইতে উপবে আসিয়া আমবা বাজ অবরোধেব দিকে ছুটিলাম। আমাদের পূর্বেই সেখানে বহু হুণ পৌছিয়াছিল, চাবিদিক হইতে নাবীকণ্ঠেব চীৎবাব, ক্রন্দন, আর্তনাদ উঠিতেছিল। আমবা অববোধেব অলিন্দে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানে এক পবম কোঁতুককব খেলা চলিতেছে। ছয় সাত জন হুণ যোদ্ধা একটা ক্ষুদ্র বালকেব দেহ লইয়া মুক্ত রূপাণেব উপর ধোবালুকি করিতেছে। বালকটা রাজপুত্র—এক বৎসব বয়ঃক্রম হইবে—মাংসেব একটা উদ্বন্ধ পিণ্ড বলিলেই হয়। একজন তাহাকে তববাবিব ফণাব উপব লইয়া আব একজনেব দিকে ছুঁড়িয়া দিতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে তববাবিব ফণাব উপব গ্রহণ কবিত্তেছে, মাটিতে পড়িতে দিতেছে না। শূন্নে খেলা চলিতেছে। শিশুটা মবে নাই, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কাঁতবোক্তি কবিত্তেছে। পাছে তববাবিব আঘাতে কাটিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় এইজন্য সকলেই তাহাকে ফলাব পার্শ্বদেশে গ্রহণ কবিত্তেছে, তবু শিশুটাব সবান্দ কাটিয়া বন্ধ বরিয়া পড়িত্তেছে।

‘আমবাও গিয়া খেলাষ যোগ দিলাম, মাঝে মাঝে হাসিব অট্টরোল



উঠিতে লাগিল। একটা যুবতী দ্বার পথে উকি মারিয়া সহসা চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল, আমাদের মধ্যে দুই চারিজন খেলা ছাড়িয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

‘এই সময় কে একজন আশিয়া সংবাদ দিল, রাজা ধরা পড়িয়াছে। স্বরূপাগল হুণের দল শিশুকে সেইখানে ফেলিয়া চলিয়া গেল। আমি কিছ তুহাদের সঙ্গে গেলাম না। শুধু হত্যা আর লুণ্ঠনে হুণের তৃপ্তি হয় না; নধ তরবারি হস্তে আমি অবরোধের ভিতর প্রবেশ করিলাম।’

এঁতক্ষণ গল্প বলিতে বলিতে মোঙের ক্ষুদ্র চক্ষুয়ুগল হিংস্র উল্লাসে জ্বলিতেছিল, এখন সহসা যেন চক্ষুর জ্যোতি নিভিয়া গেল। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বিষন্ন স্বরে বলিল—‘এই অবরোধের একটা কক্ষে প্রথম নাগসেনার সাক্ষাৎ পাই। পালঙ্কের নীচে লুকাইয়াছিল, তাহাকে টানিয়া বাহির করিলাম। সে কক্ষণ দিয়া আমার কপালে আঘাত করিল। আমি তরবারি ফেলিয়া তাহাকে সাপটাইয়া ধরিলাম; সে আমার বক্ষে কামড়াইয়া দিল। কামড়ের দাগ এখনও আমার বুকে আছে। সেই অবধি—’ মোঙের স্বর অত্যন্ত করুণ হইয়া ক্রমে ধামিয়া গেল।

সুগোপা করতলে কপোল রাখিয়া নিঃশব্দে শুনিতেছিল, এই নৃশংস কাহিনী তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দেশব্যাপী বিপ্লবের মধ্যে নাগর জন্ম, অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বহু চিত্র যাহার শৈশব স্মৃতির মূল উপাদান, যাহার নিজের জননী ও বহু পরিজন এই শোণিতস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে—মোঙের কাহিনী শুনিয়া তাহার বিচলিত হইবার কথা নয়। শুধু রাজপুত্রী অধিকারের এই পুরাবৃত্ত তাহার অজ্ঞাত ছিল বলিয়াই সে মনোবোগ দিয়া শুনিতেছিল।

কিয়ৎকাল নীরবে কাটিবার পর সুগোপা মুখ তুলিয়া বলিল—‘সেই শিশুর কি হইল?’

‘শিশুর—?’ মোঃ স্মৃতির জলে পুনর্বার ডুব দিয়া বলিল—‘শিশুটা সেই অলিন্দে বক্ত-কর্দমেব মধ্যে পড়িয়া ছিল—তাবপব—? হাঁ ঠিক, মনে পড়িয়াছে। চু-ফাঙ! পাগলা চু-ফাঙ! অববোধ হইতে নাগ-সেনাকে লইয়া যখন বাহির হইতেছি, দেখি আমাদের পুংগল চু-ফাঙ, শিশুটাকে নিজের কোণার মধ্যে পুঁবিত্তেছে। জিজ্ঞাসা কবিলাম, ‘এটাকে লইয়া কী করিবে—শূন্য মাংস তৈয়ার কবিয়া খাইবে?’ চু-ফাঙ, ভাস্কী দাত বাহির কবিয়া হাসিল—‘মোঃ আশব চিত্তামজ্জিত হইবা পড়িল— আশ্চর্য্য, চু ফাঙকে সেদিনের পব আব দেখি নাই, হযতো মবিয়া গিয়াছে। হুণেব আবু আব মবীচিকাব মাযা কখন শেষ হইবে কেহ জানে না। চু-ফাঙ, পাগল ছিল বটে কিন্তু অনেক যত্ন-মন্ত্র জানিত, গাছেব পাতা ও শিকড়ের বস দিয়া দেহেব অঙ্গস্বত অবিবল জুড়িয়া দিতে পাবিত—’

সুগোপা জিজ্ঞাসা কবিল—‘আব সেহ যুবতী? তাহার কি হইল?’

‘কোন যুবতী? নাগসেনা?’

সুগোপাব অধব একচু প্রসাবিত হলা, সে বলিল—‘না, নাগসেনা কী হইল তাহা আমবা জানি, নাগসেনা এখন নাগিনী হন্বা তোমাব বণ চাপিয়া ধবিয়াছে। আমি অচ যুবতী কথ্য বলিতেছি—যে তোমাদেব খেলা দেবিয়া চীৎকাব কবিয়া পলাইয়াছিল—’

মোঃ ভাঙ্ছিন্যভবে বলিল—‘কে তাহার সখাব বাথে। তে তিন জন তাহাকে ধবিবাব লন্ত চুটিয়াছিল তাবপা কি হইল জানিনা। বাদ-পুরীতে বহু কিস্ববী পবিচাবিকা ছিল, কণেবা যে যাহাকে পাইল দণ্ডা করিল। কষেকটা যুবতী আয়ত্ত্যা বিবিয়াছিল—’

সুগোপা নিখাস ত্যাণ কবিয়া বলিল ‘বোধহব সেই যুবতীই আমাব মাতা। তিনি বাজপুত্রের ধাত্রী ছিলেন, আমবা এবই স্তনভক্ষ পান করিয়াছিলাম।’

মোড়, বিশ্বয় প্রকাশ কবিল না, নিকংস্ক ভাবে স্নগোপাব পানে  
চাহিয়া বলিল—‘হইতেও পাবে। তাহার বয়স তোমাবই মতন ছিল।’

ভূমিব দিকে তাকাইয়া থাকিয়া স্নগোপা বলিল—‘জানিনা আমার  
মাষেব কি দৃশ্য হইয়াছিল। তিনি আৰ রাজপুৰী হইতে গৃহে কিয়ন  
নাই। হয় তো আশ্চর্য্যই কবিযাছিলেন—’

এই সময় তাহাদের বিশ্রান্তাণাপে বাধা পড়িল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### অশ্চচোব

ভূমিনি ক দৃষ্টি তুলিয়া স্নগোপা চমবিযা দেখিল, এক পুৰুষ দেবদারু  
ছাষাব তলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কখন এই অপরিচিত আগতক নিঃশব্দ  
পদে তাহাদের অত্যন্ত সন্নিবটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে গ্রাহবা জানিতে  
পাবে নাই।

স্নগোপা বলিয়া উঠিল—‘কে তুমি?’

আগতক উত্তর কবিল ‘পথিক। তুমি প্রপাণিকা? ডব দাঁও।’

স্নগোপা পথিককে আপাদমস্তক নিবীক্ষণ কবিল। আগতক যে  
বিদেশে তাহা তাহাব বেশ চূষা দেখবা নন্দেহ থাকে না। একটি জীর্ণ  
গোহালিকে উপরীক্ষ আঁপুত, মফকেও অন্তাপ গৌহজালিকের শি বস্মাণ।  
কটিতে চম-কোষবন্ধ ওরগাবি, পদধব পুা ব্বেচমেব পাত্ৰকাষ চমবজু ছাবা  
আবন্ধ। দেহে কোথাও মাংসেব বাত্ৰণ্য নাই, বব দৈগ্যেব অল্পপাতে  
ঈষৎ রুশ। সমস্ত মিলাইয়া তিলাগীন ধল-দণ্ডেব মও দেহ ঝজু ও নমনীয়,  
কিন্তু মনে হয়, প্রযোজন হইলে মস্তক মধ্যে গুণসংবুদ্ধ হইয়া প্রাণবর্তী  
আকাষ ধাবণ কবিত্তে পাবে।

আগতকেব বয়ঃক্রম অল্পমান করা বস্টিন, তবে দিশ বংসরের অধিক

নয়। মুখাবয়বের মধ্যে চক্ষু ও নাসা অতিশয় তীক্ষ্ণ। ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষুর দৃষ্টিতে একটা সতর্ক দুঃসাহসিকতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাহুবল ও কূট-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যাহাদের জীবনধারণ করিতে হয়, তাহাদের চক্ষে এরূপ দৃষ্টি বোধকরি অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

ফলতঃ আগস্থক যে একজন বুদ্ধজীবী তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহার মুখে ও বাহুতে অগণিত সূক্ষ্ম ক্ষতরেখা দেখিয়া এই অনুমান দৃঢ় হয়। ছিন্ন লৌহজালিকের কাঁকে বক্ষের উপরেও বহু রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, দেখিলে মনে হয় গোরবর্ণ স্বকের উপর কজ্জল দিয়া কেহ বেথাগুলি আঁকিয়া দিয়াছে। উপরস্থ ক্রয়ুগলের মধ্যস্থলে গোলাকৃতি তিলকের ঠায় একটি তাম্রবর্ণ চিহ্ন আছে। ইহা ক্ষতচিহ্ন অথবা সহজাত জটুল তাহা নির্ণয় করা যায় না।

স্বগোপা ক্ষিপ্তদৃষ্টিতে আগস্থককে দেখিয়া লইয়া জল আনিবার চণ্ড কুটার অভিযুখে প্রস্থান কবিল। আগস্থক মস্থবপদে আসিয়া তাহাব পরিত্যক্ত শিলাপট্টের উপর বসিল। তাহার বসিবার ভঙ্গীতে একটু ক্রান্ত্যাব প্রকাশ পাইল।

মোঙ এতক্ষণ কোঁতুল সহকারে নবাগতকে দেখিতেছিল, এখন বলিল—‘তুমি দেখিতেছি বিদেশী। তোমার দেশ কোথায়?’

বিদেশী উত্তর না দিয়া এমনভাবে হস্ত সঞ্চালন কবিল, যাহাতে গাঙ্গাব হইতে পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত যে-কোনও দেশ হইতে পারে।

মোঙ আবার প্রশ্ন করিল—‘তুমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী?’

বিদেশী সতর্ক দৃষ্টি তাহাব দিকে ফিঝাইয়া এগাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তাবপব সস্মৃতিশ্চক বাড় নাড়িল।

মোঙের ভেকধ্বনিবৎ বাঙ্গশাস্ত্র আবাব উখিত হইল—‘ভাগ্য দেবতা দেখিতেছি তোমার প্রতি স্বপ্নসম নয়; অস্বক্ষত ছাড়া যুদ্ধ ব্যবসায়ের আঁব কিছু লাভ করিতে পার নাই। কোন রাজ্যের সেনাভুক্ত ছিলে?’

বিদেশী এবারও উত্তর দিল না, উর্ধ্বদিকে তাকাইয়া যেন অন্তমনস্ক রছিল। মোঙের কোতুহল উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, সে অতঃপর গাঙ্গীর্ষ অবলম্বনপূর্বক পৌত্রস্ব সহকারে বলিল—‘যুবক, তুমি এ রাজ্যে নূতন আসিয়াছ, ষ্টোথহয় জান না ইহা হুণ অধিকৃত। মহাপরাক্রান্ত হুণ কেশরী রোট্ট ধর্মাদিত্য এই বিটঙ্ক রাজ্যের অধীশ্বর। আমিও হুণ। হুণগণ বিদ্রোহীদের স্পর্ধা সহ্য করে না। তোমার নাম কি?’

যুবকের স্বল্প গুণ্ডের অন্তরালে একটু হাসি দেখা দিল; সে বলিল—  
‘আমার নাম চিত্রক।’

‘চিত্রক! চিত্তা বাব!’ মোঙের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—‘তোমার নাম সার্থক বটে, তোমার সর্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাত চিহ্ন দেখিয়া তোমাকে চিত্তা বাব বলিয়াই মনে হয়। এরূপ নাম কেবল হুণদের মধ্যেই ছিল—সিংহ শূকর নাগ রম—যাহার যেকপ আকৃতি প্রকৃতি সে সেইকপ নাম গ্রহণ করিত। এখন আর কিছু নাই—’ সখেদ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আগ্রহ-ভরে মোঙ বলিল—‘তুমি বয়সে নবীন, কিন্তু নিশ্চয় অনেক যুদ্ধ করিয়াছ! বজ্র নগর লুণ্ঠন কবিয়াছ। এই বিটঙ্ক বাজা একদিন আমরা—কিন্তু এদেশে যুদ্ধবিগ্রহ আর হয় না। মেঘপাল কাহার সহিত যুদ্ধ করিলে? পঁচিশ বৎসর পূর্বে একদিন ছিল—’

যুবক জিজ্ঞাসা কবিল—‘কপোতকূট এখান হইতে কত দূর?’

মোঙ বলিল—‘তুমি কপোতকূট খাইবে? অধিক দূর নয়, হুদগের পথ। এক গ্রামের এখানে বিশ্রাম কবিয়া যাত্রা করিলেও সন্ধ্যার পূর্বে রাজধানী পৌছিতে পাবিলে। তোমার অশ্ব নাই দেখিতেছি, হুণ যোদ্ধা কিন্তু অশ্ব বিনা এক পা চলে না। উষ্ট্র বোমেব শিবিব এবং অশ্বের পৃষ্ঠ—হুণের ইহাই বাসস্থান। পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমবা দ্বাদশ সহস্র অশ্বাবোগী—’

সুগোপা মৃৎপাত্রে জল লইয়া ফিরিয়া আসিল, স্তব্বাং মোঙের গল্পে

বাধা পড়িয়া গেল। পথিক সতাই তৃষ্ণার্ত ছিল, সে মাগ্রহে উঠিয়া আসিয়া প্রথমে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিল, তারপর গণ্ডুষ ভরিয়া তৃপ্তি-সহকারে জল পান করিল। সুগোপা তাহার অঞ্জলিতে জল চালিয়া দিতে দিতে মোঙের দিকে বাড় ফিরাইয়া বলিল—‘মোঙ, আর বিলম্ব করিও না, দাঁতন লইয়া গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইলে তোমার নাগসেনা দাঁতনের পরিবর্তে তোমার মূণ্ডটি চিরাইবে।’

মোঙ, চকিতভাবে উর্বে চাছিল, সূর্যদেব মধ্য গগন অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মোঙ, শঙ্কিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল; জঙ্গলের মধ্যে কল্পকাষ্ঠ অন্বেষণ করিতে সময় লাগিলে, তারপর গৃহে ফিরিবার পথও অনেকখানি। বৃদ্ধ বয়সে দ্রুত চলিবার শক্তি নাই, নাগসেনার সম্মুখে ফিরিয়া যাইতে ভয়তো সক্ষ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। সেটা মোঙের পক্ষে স্বথকর হইবে না। পাবিবারিক ব্যাপারে যুক্‌বিগ্রহ মোঙ, ভালবাসে না।

পঁচিশ বৎসর পূর্বেকাল বীৰত্ব কাহিনীটা আগছককে শুনাটবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাগ আর ঘটিয়া উঠিল না। মোঙ, গাভ্রোপান কবিল; কাহ্যকেও কোনও সম্ভাষণ না কবিয়া দ্রুত অস্পষ্ট স্বরে তববাবিব নথ, ঘোড়ার ক্ষুব ও জীজ্ঞাস্তি কটাফ সধক্ষীয় প্রবাদ বাক্যটা আবৃত্তি করিতে করিতে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কবিল।

এদিকে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্রক আবার শিলা-পীঠের উপর বসিয়াছিল। সুগোপা বেখিল, সে দুই জাগ্রত উপর কফোনি বাখিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তের দীর্ঘে চিবুক স্তম্ভ করিয়া স্থিবনেত্র তাধাব গানে চাতিয়া আছে। তঠাৎ সুগোপা একটু অস্বস্তি অনুভব করিল। সে মাসেব পব মাস একাকিনী এই ভলসেত্র দিন কাটা়য়, বত পথিক আসে যায়; কেহ নবীনা প্রপাণালিকাকে দেখিয়া দুটা বঙ্গ পরিচাদের কথা বলে, সুগোপা চটুলকণ্ঠে তাহার উত্তর দেয়; কেহ বা প্রগল্ভতার সীমা অতিক্রম

করিলে ছই চারিটি কঠিন বাক্যবাণে জর্জরিত করিয়া তাহাকে অধোবদনে বিদায় করে। কোনও অবস্থাতেই স্নেহোপার আশ্রয়প্রত্যয় বিচলিত হয় না। কিন্তু আজ এই জীর্ণবেশ বিদেহী যুবকের নিম্পলক চাহনি তাহাকে উদ্ভিগ্ন করিয়া তুলিল।

অলিত নিচোলপ্রান্ত যুবকের উপর টানিয়া দিয়া স্নেহোপা বলিল—‘তুমি তো কেপোতকুটে ঘাইবে, তবে বিলম্ব করিতেছ কেন?’

চিত্রক তেমনিভাবে চাহিয়া থাকিয়া মূহুরবে বলিল—‘শান্তি দূর করিতেছি। আমার ভরা নাই।’

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল; চিত্রকের অচঞ্চল দৃষ্টি স্নেহোপার উপর নিশ্চল হইয়া আছে। স্নেহোপা ক্রমে অধীর হইয়া উঠিল, ঈষৎ রুদ্ধস্বরে কহিল—‘তুমি কোন্‌ বব দেশেব মানুষ—স্নীগোক কখনও দেখ নাই?’

এইবার চিত্রক স্নেহোপার মুখ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া সাবধানে চারিদিকে চাহিল। তাহার অধবোষ্ঠ একবার সন্দুচিত ও প্রসারিত হইল। তারপর আবার নৃষ্টি উপর চিবুক রাখিয়া সে ধীরে ধীরে বহিল—‘স্থানটি বেশ নির্জন।’

এই অসংলগ্ন উদ্ভবে স্নেহোপা রম্ভভাবে অধর দংশন করিল, তারপর স্নি হইতে পদপাত্র তুলিয়া লইয়া কুটীরের দিকে চলিল।

— ‘তুমি স্নন্দরী এবং যুবতী।’

স্নেহোপা চকিতে গ্রীবা বাঁকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। চিত্রকের ঋগ্ধস্বরের সমতা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, সে পুনশ্চ বহিল—‘তুমি স্নন্দরী এবং যুবতী। এই জনহীন স্থানে একাকিনী থাকিতে তোমার ভয় করে না?’

ভ্রম্ব করিয়া স্নেহোপা বলিল—‘ভয়! কিসের ভয়?’

‘বনে হিংস্র জন্তু আছে।’

‘হিংস্র জন্তুকে আমি ভয় করি না।’

‘আর—মাহুষকে?’

‘মাহুষ ধৃষ্টতা করিলে আমার অস্ত্র আছে।’

‘কী অস্ত্র?’

সুগোপা তর্জনী তুলিয়া কুটারের প্রাক্ষণ দেখাইল। ‘চিত্রক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল প্রাক্ষণের একপ্রান্তে একটি সন্মার্জনী রহিয়াছে। তাহার কণ্ঠে একটু নীরস হাশ্বধ্বনি পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। সে বলিল—‘তুমি সাহসিকা বটে। কিন্তু ঐ অস্ত্রের দ্বাৰা লোলূপ পুরুষকে নিবারণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়?’

‘হয়।’ অস্পষ্টস্বরে এই কথাটি বলিয়া সুগোপা আবাব কুটারের দিকে পা বাড়াইল। কিন্তু তাকে এক পদের অধিক অগ্রসর হইতে হইল না।

চিত্রক এতক্ষণ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ভঙ্গিতে বসিয়া ছিল, এখন সহসা বহু বিড়ালের মত লক্ষ দিয়া সুগোপাব সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহার মুখের অত্যন্ত নিকটে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—‘সাত্ৰসিনি, এখন কোন অস্ত্র ব্যবহার করিবে?’ তাহার কণ্ঠস্বরে গভীর ব্যঙ্গের সহিত গভীরতর একটা উত্তেজনার আভাস স্মৃতিত হইয়া উঠিল।

সত্রাস চক্ষু তুলিয়া সুগোপা দেখিল, চিত্রকের দুই চক্ষু গীবকখণ্ডেব মত জ্বলিতেছে, তাহার ললাটস্থ ত্র্যম্বক চিহ্নটা রক্ত তিলকের মত লাল হইয়া উঠিতেছে। সুগোপা ক্ষণকাল স্তম্ভিতবৎ থাকিয়া বলিল—‘পথ ছাড়, বর্বর।’

‘যদি না ছাড়ি?’

সুগোপা অসহায় নেত্রে চারিদিকে চাহিল। এই সময়, যেন তাহার রিক্রান্ত উৎকর্ষার সাক্ষাৎ প্রত্যুত্তর স্বরূপ শিলাকঙ্করপূর্ণ পথের উপর দ্রুত অশ্বের আঙ্কনিত ধ্বনি শুনা গেল। পরক্ষণেই একটি স্মৃষ্ট কণ্ঠস্বরে উচ্চ আহ্বান আসিল—



‘সুগোপা ! সুগোপা !’

চিত্রক সুগোপার পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণেক পরে অশ্বারোহীকে দেখা গেল ; বিদ্যুতের মত দ্রুতগতি অশ্ব পথ হইতে দেবদাক বৃক্ষের তলে আসিয়া দাঁড়াইল। আৰোহী এক লক্ষ্যে ভূমিতে অবতরণ করিতেই সুগোপা ছুটিয়া গিয়া তাকে দুই বাহুতে জড়াইয়া ধরিল।

অশ্বারোহীর বয়স অধিক নয়, কিশোর বলিলেই হয়, মুখে শাশ্বৎক্ষয় চিহ্নমাত্র নাই। মস্তকে উজ্জ্বল ধাতুনির্মিত উষ্ণীয়, বক্ষ্যে বর্ম, পৃষ্ঠে ঝুলি ও তুণী। অপরূপ স্নানব আকৃতি, দেখিয়া মনে হয় দেব-সেনাপতি কিশোর কার্ণিকেষ শত্রু বিজয়ে বাহিব হইয়াছেন।

তরুণ বীর প্রফুল্ল বক্তাধবে হাসিয়া বলিল—‘সুগোপা, কী হইয়াছে ‘সখি ?’

সুগোপার মন হইতে ক্ষণিক বিপন্নতাৰ সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গিয়াছিল, সে গদ গদ আনন্দের স্ববে বলিল—‘কিছু না—এ বিদেশী গ্রামীণটা প্রগলভতা ববিয়াছিল মান। এস—ঘবে এস। শিকারে বাহিব হইয়াছিলে বুঝি ? গাল দুটি যে বোঁদে বাঙা হইয়া গিয়াছে।’

চিত্রক ইতিমধ্যে নিঃশব্দে সবিয়া গিয়া দেবদাক বৃক্ষের কাণ্ডে এক ভাত বাধিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অল্প হস্তটি অবহেলাভাবে তববাবির উপর লুপ্ত ছিল। তরুণ ঈষৎ বিশ্বয়ে তাহাব দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ক্ষণিকের জন্ম উভয়ের চক্ষু মিলিত হইল। তারপর অবজ্ঞাপূর্ণ তাকিলেব সহিত অশ্বের বগা চিত্রকেব দিকে নিঃক্ষেপ কবিয়া সুকুমার কান্তি তবণ বলিল—‘আমাব অশ্ব বক্ষ্য কব—পাবিতোষিক পাইবে।’ বলিয়া সুগোপাব কটি বাহুবেষ্টিত কবিয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে কুটীবের দিকে চলিল।

সুগোপা সোহাগ-বিগলিত-কণ্ঠে বলিল—‘তুমি যে এই নিভৃত স্থানে আমাকে দেখা দিতে আসিবে তাহা আমাব সকল দুৰাকাজ্ঞাব অতীত !’

তরল শাসিয়া তরুণ বলিল—‘প্রশাপালিকা কিরূপ কর্তব্য পালন করিতেছে রাজপক্ষ হইতে তাহাই পরিদর্শন করিতে আসিলাম।’

তাহারা কুটীর মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলে চিত্রক ধীরে ধীরে অশ্বেশ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দর কাঞ্চাজীয় অশ্ব, প্রস্তর মূর্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মধুপিপ্বলবর্ণ অকে চীনাশুকের মসৃণতা, গ্রীবাব চামর মুক্তামালার মণ্ডিত, গুণ্ডে কোমল রোমাবলি নিমিত্ত আসন, বল্গাব রজ্জু স্বর্ণালরুত।

চিত্রক অশ্বেশ গ্রীবায় একবার লঘু স্পর্শে হাত ধুলাইল, অশ্ব আপ্যায়িত হইয়া নাসা মধ্যে ঈষৎ হর্ষস্বক শব্দ করিল। চিত্রক তখন সঙ্কুচিত মতর্ক চক্ষে চারিদিকে চাঙ্গিয়া দেখিল। নিশুরু অপবাহু; কেবল কুটীরেব অভ্যন্তর হইতে মাঝে মাঝে কলশাস্ত্রের ধ্বনি প্রকৃতিব বৈকালী তন্দ্রানসতা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে। পথে জনমানব নাহ।

চিত্রকের গুহপ্রাণে ঈষৎ হৃদি দেখা দিল, কুটিল শিভ হৃদি, তাহাতে আনন্দ বা কোতুকের স্পর্শ নাই। তাহার নপাটের তিলকচিহ্ন আবার ধীবে ধীরে আরক্ত হইয়া উঠিল।

অশ্বেশ বন্যা ধবিয়া চিত্রক সতপণে তাহাকে পথের দিকে লক্ষ্য চালাইল; শম্পাকীর্ণ ভূমির উপর শব্দ হইল না। শরপর একবার পিছনে কুটীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক বাক্ষে সে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। আসনের উপর সুকিয়া এসিয়া জন্বা দাবা তাহার পত্রব চাপিয়া ধরিতেই অশ্ব তাড়ন পৃষ্ঠের হায় লালাইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। প্রস্তরময় পথের উপর তাহার দ্বিপ্র সুরধ্বনি কয়েকবার শব্দিত হইয়াই আবার পরপাথের তৃণভূমির উপর নীরব হইয়া গেল।

নিমেষ মধ্যে অশ্ব ও আরোহী পথিপার্শ্ব গভীর বনানীর মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### মগধের দূত

মহাকবি কালিদাস রঘুব দিগ্বিজয় বর্ণনাচ্ছলে যে অমিত-বিক্রম মগধেশ্বরের বিজয়গাথা রচনা কবিযাছিলেন, তাঁহার নাম সমুদ্রগুপ্ত<sup>১</sup>। এক হিসাবে সমুদ্রগুপ্ত আলেকজান্ডার অপেক্ষাও শক্তিশর ছিলেন; আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর পবেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার নমুদ্রমেখলাপ্ত বিশাল সাম্রাজ্যকে এমন সুকঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশধরগণ তিন পুরুষ পর্যন্ত প্রায় নিরুপদ্রবে তাহা ভোগ করিয়াছিলেন, শত বর্ষ মধ্যে সে বন্ধন শিথিল হয় নাই।

গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভাঙন দিল সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র কুমারগুপ্তের সময়। তখনও সাম্রাজ্য কাপিশ হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত বিস্তৃত; কিন্তু বিধ্বংসকর্তা অটুট থাকিবেও গজভুক্ত কাপিথবৎ অন্তঃশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। যে ছদ্ম জীবনশক্তি এই বিরাট ভূখণ্ডকে একত্রীভূত করিয়া রাখিয়াছিল, কাণক্রমে জরার প্রভাবে তাহা শ্লথ হইয়া গিয়াছে।

কুমারগুপ্তের দীর্ঘ রাজত্বকালের শেষভাগে উন্নত বন্ধাবর্তের মত হুণ-অভিযান সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আঘাত করিল। এই প্রচণ্ড আঘাতে জীর্ণ সাম্রাজ্য কাঁপিয়া উঠিল। কুমারগুপ্ত ভোগী ছিলেন, বীর ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার ঔরসে এক মহাবীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—গুপ্তবংশের শেষ বীর স্বন্দ। তরুণ স্বন্দগুপ্ত তখন যুবরাজ-ভট্টারক পদে আসীন; বাজবংশের চঞ্চলা লক্ষ্মীকে স্থির করিবার জন্য স্বন্দ তিন রাত্রি ভূমিশযায় শয়ন করিয়া যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইলেন। সেই দিন হইতে ক্ষয়প্রাপ্ত পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে অটুট রাখিবার অক্রান্ত চেষ্টায় দীর্ঘ জীবনের

শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ও সৈন্য শিবিরে যাপন করাই এই ভাগ্যহীন বীরকেশরীর পূর্ণ ইতিহাস।

বুবরাজ স্কন্দ পঞ্চনদ প্রদেশে হুণ আকোহিণীর সম্মুখীন হইলেন। হিংস্র বর্বর হুণগণ প্রাণপণ যুদ্ধ কবিল, কিন্তু অসামান্য রণপণ্ডিতস্কন্দের সহিত ঐটিয়া উঠিল না। তথাপি আশ্চর্য্য এই যে, তাহারা নিঃশেষে দূরীভূত হইল না। পঞ্চনদ প্রদেশ নদনদী ও পর্বত দ্বারা বহুধা খণ্ডিত; চক্রবর্তী গুপ্তসম্রাটের অধীনে প্রায় পঞ্চাশটি ক্ষুদ্রবৃহৎ সামন্তবাজা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য রচনা করিয়া এই দেশ শাসন করিতেন। হুণদের আক্রমণে সমস্তই লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল, কুলপ্রাবী বক্রায় খড়কুটাব সহিত মগীকুহুও ভাসিয়া গিয়াছিল। অতঃপর স্কন্দেব আবির্ভাবে বক্রাব জল নামিল বটে কিন্তু নানা স্থানে আবদ্ধ জলাশয় রাখিয়া গেল। পবাজিত হুণ অনীকিনীদ অধিকাংশ দেশ ছাড়াই গেল, কতক প্রকৃতি-সুবন্ধিত দুর্গম ভূমি আশ্রয় করিয়া রহিয়া গেল।

কুটিল বোংগ যেমন তীর ওয়ধের দ্বারা বিদূবিত না হইয়া দেহেব দুর্লভ্য দুর্লভগম্য স্থানে আশ্রয় লয়, কবেকটা হুণ গোপ্তীও তেমনি ইতস্তত সাম্ভ-সঙ্কট-বন্ধুর স্থানে অধিষ্ঠিত হইল। হয় তো স্কন্দ আবণ্ড কিছুকাল এই প্রান্ত্রে থাকিতে পারিলে সম্পূর্ণরূপে হুণ উৎপাত উন্মূলিত করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি থাকিতে পাবিলেন না, সাম্রাজ্যেব অপব প্রান্ত্রে গুরুতর অশান্তির সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে ফিবিতে হইল। পঞ্চনদ প্রদেশ বাহুতঃ সাম্রাজ্যেব অন্তর্ভুক্ত বহিল বটে, কিন্তু ধর্মিতা নাবীব স্রায় তাহার প্রাক্তন অনন্তপরতা তার বহিল না।

বিটক নামক ক্ষুদ্র গিরিবাজ্য এই সময় একদল হুণের করতলগত হইয়াছিল। এই হুণদেব প্রধান পুংকষ রোষ্টি বাজ্যেব শ্রেষ্ঠা স্কন্দবী ধারা দেবী নামী এক কুমারীকে অঙ্কশাধিনী করিয়া নূতন রাজবংশের স্রুচনা করিয়াছিলেন।

প্রথম সংঘর্ষের বিক্ষুব্ধিত অগ্ন্যুৎসার নিভিয়া যাঁইবার পর বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে বিদেহ-ভাব হ্রাস পাইতে লাগিল। উগ্র হুণ প্রকৃতি পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ফলে শান্ত হইয়া আসিল। সর্বাঙ্গিক অধিক পরিবর্তন হইল স্বয়ং মহারাজ রোট্টের। ধারা দেবীর কোমল এবং সহিষ্ণু অন্তরে না জানি কোন অপরিমেয় শক্তি ছিল, তিনি এই দুর্ধর্ষ বর্বরকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিলেন। রোট্ট প্রশংসিত বুদ্ধের করুণাবাগীর শরণাপন্ন হইলেন, তাঁহার নামের পশ্চাতে ধর্মানিত্য উপাধি যোজিত হইল। কপোত-কুটের যে চৈত্য হুণদের প্রথম আগমনে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা পুনর্গঠিত হইল।

রোট্ট ধর্মানিত্যের রাজত্বকালের সপ্তমবর্ষে মহাদেবী ধারা একটী কন্যা প্রসব করিয়া চিরদিনের জন্ত তাঁহার পরম সহিষ্ণু কোমল চক্ষুদুটি মুদিত করিলেন। কিন্তু রোট্ট আর নূতন মহাদেবী গ্রহণ করিলেন না— একটীমাত্র কন্যার নাম রাখিলেন রট্টা যশোধরা।

প্রথম হুণ অভিযানের পর শতাব্দীর একপাদ ক্ষয় হইয়া গেল। ওদিকে স্বন্দগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পর সম্রাট হইয়াছেন। সাম্রাজ্যের চতুঃসীমা ঘিরিয়া বিদ্রোহ এবং অশান্তির আশুভ আলিতেছে; ধীরে ধীরে মগধকে

যা বহুচক্র অগ্রসর হইতেছে। রাজ্যের অভ্যন্তরেও পুণ্ড্র-গোপনে মাৎস্যছায় ও চক্রান্তের বিন ছড়াইতেছে। এই বিষ-স্বন্দ ক্রান্তিহীন নিদাহীনভাবে যুদ্ধ করিয়া ফিরিতেছেন। মূল বাহিনী কখনও লৌহিত্যের উপকূলে উপস্থিত হইয়া অন্তরে আতঙ্ক সঞ্চার করিতেছে, আবার পরদণ্ডেই সেতুবন্ধ করা করিয়া শান্তি-সেতু বন্ধনের প্রয়াস পাইতেছে। বর্ষান্তে হার মহাস্থানীয়ে পদার্পণ করিবার অবকাশ পান না। উলিপুরে থাকিয়া যথাসাধ্য রাজকার্য চালাইতেছেন।

ব্যাপী এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে রাজকার্য যে স্ফূর্তিরূপে চলিতে-

ছিল না তাহা বলা বাহুল্য। ভূমিকম্পে যখন মাথার উপর গৃহ ভাঙিয়া পড়িতেছে তখন গৃহকোণে রক্ষিত ক্ষুদ্র তৈজস কেহ লক্ষ্য করে না। তুচ্ছ বিটক রাজ্যের কথা পাটলিপুত্রের সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল; পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কেহ তাহার খোঁজ লয় নাই।

রাজ্যের প্রাচীন পুস্তপাল মহাশয়ের মৃত্যু হওয়াতে এক নবীন কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নবীনতার উত্তমে তিনি একদিন অক্ষপটল-পুত্রের পুরাতন নিবন্ধ পুস্তকাদি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বিটক রাজ্যের নাম আবিষ্কার করিলেন। পঁচিশ বৎসর এই রাজ্য হইতে রাজস্ব আসে নাই। রাজ্যটা গেল কোথায় ?

বহু নথিপত্র অহুসন্ধানের পর প্রকৃত তথ্য জানা গেল। চিন্তাশ্রিত নবীন পুস্তপাল মহাশয় দুঃসংবাদটা মহামন্ত্রীর কানে তুলিলেন।

স্বন্দ তখন পাটলিপুত্রে উপস্থিত। সুদূর কেবল দেশে যুক করিতে করিতে একটা গুরুতর দুর্গোগের জনশ্রুতি শুনিয়া তিনি স্মৃতিতে রাজধানী ফিরিয়াছেন। আবার নাকি হুণ আসিতেছে; লক্ষ লক্ষ স্বেত হুণ বক্ষু নদী পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। দুইজন চৈনিক শ্রমণ এই সংবাদ লইয়া কপিশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেখান হইতে রাজদূত দ্বিবারাত্র অঞ্চালনা করিয়া স্বন্দের নিকট বার্তা আনিয়াছে। কেবল যুদ্ধের ভার কয়েকজন প্রাচীন সেনাপতির উপর অর্পণ করিয়া স্বন্দ পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

মহামন্ত্রী বিটক রাজ্যের সংবাদ লইয়া রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন,—  
‘একটা বড় ভুল হইয়াছে। বিটক নামক পঞ্চনদ প্রদেশেব একটা রাজ্য আমাদের হিসাব হইতে হারাইয়া গিয়াছিল। দেখা যাইতেছে হুণেরা সেটা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পঁচিশ বৎসর তাহারা রাজস্ব দেন নাই।’

স্বন্দ তখন প্রাসাদের এক বিশ্রাম কক্ষে একাকী ছিলেন,

কুষ্টিমের উপর বসিয়া অক্ষবাটের সম্মুখে পাষ্টি ফেলিতেছিলেন ; মন্ত্রীর কথায় স্বপ্নাতুর চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন । স্বপ্নের বয়ঃক্রম এই সময় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু বলদৃশ্য দেহে কোথাও জরার চিহ্নমাত্র নাই ; রমণীর ছায় কোমল চক্ষু দুটি যেন সর্বদাই স্বপ্ন দেখিতেছে । তাহার স্মৃতিম দেহ ও লাভণ্যপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া তাঁহাকে পরাক্রান্ত যৌদ্ধা বলিয়া মনে হয় না, কবি ও ভাবুক বলিয়া ভ্রম হয় ।

স্বপ্ন দুই হাঙে পাষ্টি ঘষিতে ঘষিতে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—  
‘পাশা বলিতেছে এবার হুণকে তাড়াইতে পারিব না । তিনবার পাশা ফেলিলাম, তিনবারহ পাশা ত্রৈ কথা বলিল । গুপ্ত সাম্রাজ্য টলিতেছে, ভাঙিয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই ।’—তারপর চকিতে সচেতন হইয়া সসম্মমে বলিলেন—‘আসন গ্রহণ করুন আর্ঘ্য ।’

মহাসচিব পৃথিবীসেন রাজার সম্মুখস্থ আসনে বসিলেন । অশীতিপর বৃদ্ধ, গুক্ষ দেহ বংশযষ্টির ছায় ঋজু ও গ্রন্থিবুক্ত ; ইনি একাধারে এই বৃহৎ রাজ্যের মহাসচিব ও মহাবলাধিকৃত ; স্বপ্নের পিতা কুমারগুপ্তের সমর হইতে অনন্তমনে রাজ্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন ।

পৃথিবীসেন নীরসকণ্ঠে বলিলেন—‘কবি কালিদাস একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন—পাশাব ভবিষ্যদ্বাণী, মণ্ডপের প্রতিজ্ঞা ও শত্রুর হাঙ্গি যাহারা বিশ্বাস করে তাহার বিচাবহুট ।—হায় কালিদাস !’ দীর্ঘশ্বাস মোচন-পূর্বক স্বর্গত কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া মন্ত্রী কহিলেন—‘এখন এই বিটঙ্ক রাজ্যটাই লইয়া কি করা যায় ?’

ঈষৎ হাসিয়া স্বপ্ন বলিলেন—‘রাজ্যটা হারাহয় গিয়াছিল ? বিচিত্র নয় । কেবল যুদ্ধে আমার অঙ্গুরীয় হইতে একটি নীলকাস্ত মণি কখন খসিয়া গিয়াছিল জানিতে পারি নাই । আজ প্রথম লক্ষ্য করিলুশা এই দেখুন ।’ বলিয়া অঙ্গুরীয় দেখাইলেন ।

অতঃপর রাজা ও মন্ত্রী মিলিয়া দীর্ঘকাল মন্ত্রণা করিলেন । বিটঙ্ক

রাজ্য অবশ্য তাঁহাদের চিন্তার অতি ক্ষুদ্রাংশই অধিকার করিল। অবশেষে স্থির হইল যে হুণ যখন আবার আসিতেছে তখন চতুরঙ্গ বাহিনী লইয়া স্বন্দ তাহাদের আগম-পথ রোধ করিবার জন্য এক মাসের মধ্যে পুরুষপুর যাত্রা করিবেন। উপরন্তু পঞ্চদশ প্রদেশে যত সামন্ত রাজা আছে, সকলের নিকট অচিরাতঃ দূত প্রেরিত হইবে, যাহাতে এই সম্মিলিত সামন্তচক্র হুণদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করিয়া স্বরাজ্য রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকেন। বিটক রাজ্যেও মগধের দূত বাইবে; তত্রত্য হুণ রাজার্কৈ মগধের আনুগত্য স্বীকার করিবার আদেশ প্রেরিত হইবে। হুণ যদি স্বীকৃত না হয় তখন স্বন্দ তথায় উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন।

সচিব রাজ সন্নিধান হইতে বিদায় হইবার কিয়ৎকাল পরে বিদূষক পিঙ্গলী মিশ্র আসিয়া দেখা দিলেন। অতি স্থলকায় ব্রাহ্মণ, হস্তে একটি বহুৎ কুম্বাণ্ড। রাজা দেখিয়া বলিলেন—‘পিপুল, একি! কুম্বাণ্ড কেন?’

কুম্বাণ্ড মহারাজের পদপ্রান্তে রাখিয়া বিদূষক মন্ত্রী পরিত্যক্ত আসনে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—‘মহাবাজ, রিক্তপানি হইয়া রাজ সমীপে আসিতে নাই, ইহাই শিষ্ট নীতি।’

রাজা বলিলেন—‘ঠিকই হইয়াছে, তোমার বুদ্ধি ও কলেবর ছই-ই কুম্বাণ্ডবৎ। এটি কোথায় সংগ্রহ করিলে?’

পিঙ্গলী বলিলেন—‘চালে ফলিয়াছিল। ব্রাহ্মণীকে অনেক স্তোক দিয়া বয়স্কের জন্য আনিয়াছি।’

‘ব্রাহ্মণীকে কী স্তোক দিয়াছ?’

‘বয়স্ক, ব্রাহ্মণীর একটি অকাল কুম্বাণ্ড দ্রাতৃপুত্র আছে, তাহার বড়ই দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা। এখন মহারাজ যদি তাহাকে কোনও দূর দেশে দৃঢ়রূপে প্রেরণ করেন তবেই তাহাব সাধ পূর্ণ হয়। আমি মহারাজের নিকট নিবেদন করিব এই স্তোক দিয়া গৃহিণীর কুম্বাণ্ডটি হস্তগত করিয়াছি।’



রাজা সহাস্ত্রে বলিলেন—‘ধন্য পিপুল, তোমার বয়স্ক-শ্রীতি অতুলনীয়। তাহাই হইবে; তোমার ব্রাহ্মণীর ব্রাহ্মপুত্রকে দেশ ভ্রমণে পাঠাইব। এখন এই কুম্ভাণ্ড রক্ষনশালায় প্রেরণ কর।’

কুম্ভাণ্ড স্থানান্তরিত হইলে স্বন্দ বলিলেন—‘পিপুল, এ পাশা খেলি। আর একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিব। তুমি যদি আমাকে পরাজিত করিতে পার, বুধিব নিয়তির বিধান অলঙ্ঘনীয়।’

পিপলী মিশ্র বলিলেন—‘বয়স্ক, পরাজিত করিতে পারি বা না পারি, নিয়তির বিধান চিরদিনই অলঙ্ঘনীয়। কারণ নিয়তি স্বীকৃতি।’

‘দেখা যাক’ বলিয়া স্বন্দ পাঠি ফেলিলেন।

ইহা আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইবার প্রায় তিন মাস পূর্বের ঘটনা।

\* \* \* \*

অশ্বচোর চিত্রক যে বনের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নথ, প্রায় ছয় ক্রোশ ভূমির উপর প্রসারিত। বড় বড় গাছ ঘনসম্মিষ্ট হইয়া উর্ধ্ব মাথা তুলিয়াছে, তাহাদের শাখায় শাখায় জড়াজড়ি, নিম্নে রবিকরবিক্র ছায়াঙ্ককার। বনভূমি সর্বত্র সমতল নয়, স্থানে স্থানে উচ্চ হইয়া কক্ষ উপলাকীর্ণ অঙ্গ প্রকট করিতেছে। কোথাও তরু পরিবেষ্টিত শম্পাচ্ছাদিত উন্মুক্ত স্থান; কোথাও বা কঠিন রসহীন মৃত্তিকার উপর শুষ্ক কণ্টক গুচ্ছ। কচিং দুই একটি ক্ষীণধাবা প্রস্রবণ। এই বনে মৃগ শূকর শশক ময়ূর নানাবিধ শিকার আছে। প্রধান নগরীর উপকণ্ঠে রাজস্ববর্গের মুগয়ার জন্ত এইরূপ ক্রীড়া কানন সবলে রক্ষা করিবার রীতি ছিল।

এই বনের মধ্যে প্রায় তিন ক্রোশ পথ তীর বেগে ঘোড়া ছুটাইবার পর চিত্রক বন্যার ইন্দ্রিতে অশ্বের গতি হ্রাস করিল। বহুদিন চিত্রক ঘোড়ায় চড়ে নাই, তাই ধাবমান অশ্বগৃষ্ঠে বসিয়া বায়ুর ধর প্রবাহে তাহার

রক্তে গতির হর্ষোদ্‌দান জাগিয়াছিল। সে সহসা মস্তক উৎক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই সে থামিয়া গেল; দূর হইতে যেন মহুচ্চ কণ্ঠের আহ্বান আসিল। অশ্রু একটি নিষ্পাদপ মুক্ত স্থানের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছিল, চকিতে তাহাঙ্গ গতি রোধ করিয়া চিত্রক চারিদিকে চাহিল। দেখিল, মুক্ত ভূমির কিনারায় এক বৃহৎ মধুক বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পাশে একটি ঘোটক।

এতক্ষণ এই বনে একটি মানুষের সঙ্গেও চিত্রকের সাক্ষাৎ হয় নাই, সে সন্দিগ্ধচক্ষে এই ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিল। দূর হইতে ভাল দেখা গেল না, তবু বেশভূষা হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। চিত্রক চক্ষুর উপর হস্তাচ্ছাদন দিয়া ভাল করিয়া দেখিল, লোকটি যেই হোক সে একাকী, কাছাকাছি অন্ন কেহ নাই। তথাপি চিত্রক ইতস্ততঃ কবিল; ভারিল, পলায়ন কবি। কিন্তু ঐ ব্যক্তির সঙ্গেও অশ্ব রহিয়াছে, পলাইলে পশ্চাৎদাবন করিতে পারে। একপক্ষেত্র কি করিবে স্থিব কবিতো না পারিয়া চিত্রক ন বর্বো ন তর্হে হইয়া রহিল।

এইবার অন্ন ব্যক্তি অশ্বের বদা ধরিয়া তরু মূল হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখন চিত্রক দেখিল, অশ্বটি খজ, তিন পায়ে ভব দিয়া ঝোড়াইয়া চলিতেছে।

ব্যাপার বুঝিয়া চিত্রক অগ্রসর হইয়া গেল। অন্ন ব্যক্তি তাকে আসিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, মধুকবৃক্ষেব নিকটে উভয়ে মুখো-মুখি হইল। কিছুক্ষণ দুইজনে পরস্পর পর্যবেক্ষণ করিল।

চিত্রক দেখিল লোকটির মেহ মেদ-সুকুমার, মুখমণ্ডল গোলাকৃতি, চক্ষুও ভূরূপ। এক ঘোড়া সুপুষ্ট গুচ্ছ মুখের শোভা বর্ধন করিতেছে বটে, কিন্তু গুচ্ছের স্ফুরক প্রসাধন আর নাই, নানা ছুয়োগেব মধ্যে পড়িয়া বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। মস্তকে রক্তবর্ণ উক্ষীষ, পরিধানে হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র ও

অন্ধাবরণ ; উত্তরীয়টি তুখের ছায় উদর বেষ্ঠন করিয়া পাশে গ্রস্থিবন্ধ ।  
কটি হইতে একটি বৃহৎ তরবারি খুলিতেছে ।

অপরপক্ষে সে ব্যক্তি দেখিল, মহামূল্য সজ্জায় অলঙ্কৃত একটি তেজস্বী  
অশ্ব, তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া আছে এক দীনবেনী সৈনিক । অশ্ব ও  
অশ্বারোহীর বেষভূষা সম্পূর্ণ বিপরীত । তাহার সজ্জা স্নিগ্ধ, অশ্বটি  
কোনও ধনীব্যক্তির সম্পত্তি এবং আরোহী এই অশ্বের রক্ষক ।

সে বলিল—‘বাঁপু, বলিতে পার তোমাদের এই বহু দেশে কোথাও  
লোকালয় আছে কি না ?’

চিত্রক বুঝিল লোকটি তাহারই মত এদেশে নবাগত । সে নিশ্চিত  
হইয়া বলিল—‘তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?’

লোকটি ঈষৎ রষ্ট হইল । এই বিস্ময়টা তাহার সহিত সমকক্ষের মত  
কথা বলে ! এ দেশের লোকগুলা কি একেবারেই গ্রাম্য, সম্মানার্থে বিশিষ্ট  
পুরুষ দেখিলে চিনিতে পারে না ? সে গুম্ফ ফুলাইয়া বলিল—‘কোথা  
হইতে আসিতেছি সে সংবাদে তোমার প্রয়োজন নাই । এই বহু রাজ্যে  
প্রবেশ করিয়া অবধি কেবল পাহাড় পর্বতে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া  
বেড়াইতেছি ; মানবগুলাও এমন অসভ্য যে মাগধী অবহট্ট ভাষা পর্যন্ত  
ভাল করিয়া বুঝে না । সাতদিন ধরিয়া অত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছি,  
এখনও রাজধানী কপোতকূটে পৌঁছিতে পারিলাম না । কাল রাতে  
এক গ্রামে গৃহের কুটারে আশ্রয় লইয়াছিলাম ; প্রাতে উঠিয়া দাসীপুত্রটা  
কপোতকূটের সিধা পথ দেখাইয়া দিল । সেই অবধি পাঁচটা পাহাড় পার  
হইয়াছি, কিন্তু এখনও কপোতকূটের দেখা নাই । তারপর গণ্ডের উপর  
পিণ্ড, এই বনে প্রবেশ করিয়া ঘোড়াটা এক গর্তে পা দিল—’ লোকটি  
সশব্দ নিশ্বাস ত্যাগ করিল—‘ঘোড়ার পা ভাঙিয়াছে, সমস্তদিন পেটে  
অন্ন নাই ; যদি গুরুতর রাজকাৰ্গ না থাকিত কোন কালে এই দেববর্জিত  
দেশ ছাড়িয়া যাইতাম ।’

চিত্রক প্রশ্ন করিল—‘তুমি কপোতকুটে বাইতে চাও ? রাজকার্বে ?’

লোকটি গম্ভীর ভাবে বলিল—‘হাঁ, গুরুতর রাজকার্বে । আমার নাম শশিশেখর শর্মা, মগধের রাজ-বয়স্ক আমার—, কিন্তু সে থাক । কপোতকুট কি এমন হইতে অনেকদূর ?’

পাঠক বুঝিয়াছে শশিশেখর শর্মা আর কেত নয়, বিদ্যক পিঙ্গলী মিশ্রের ব্রাহ্মণীর ভ্রাতুষ্পুত্র । তাহার প্রশ্নের উত্তরে চিত্রক বলিল—‘কপোতকুট অনেকদূর, আজ রাত্রে পৌছিতে পারিবে না । ঘোড়া থাকিলে পৌছিতে পারিতে ।’

মগধের রাজদূত চিত্রকের ঘোড়ার পানে লুক্কনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিল, বলিল—‘এটি কি তোমার ঘোড়া ?’

‘হাঁ ।’

শশিশেখর পূরা বিশ্বাস কবিল না, কিন্তু অশ্বিনীও কোনও লাভ নাই । সে উৎসুক স্বরে বলিল—‘তোমার ঘোড়া বিক্রয় করিবে ?’

চিত্রক কুণ্ঠিত নেত্রে তাহার পানে চাহিল—‘কত মূল্য দিবে ?’

শশিশেখর অশ্বের প্রতি তাকাইয়া গুম্ফের একপ্রান্ত অঙ্গুলি দ্বারা আকর্ষণ করিতে করিতে বিবেচনা কবিল, তাবপর বলিল—‘সসজ্জ অশ্বের জন্ত পাঁচ কার্ষাপণ দিব ।’

চিত্রক ভাবিল, পরের দ্রব্য পবকে বিক্রয় কবিয়া যদি পাঁচ কার্ষাপণ পাওয়া যায় মন্দ কি ? অপহৃত অশ্ব নিজের কাছে বাধা নিবাপদ নয়, ধবা পড়িবার ভয় আছে । কিন্তু চিত্রক দেখিল, রাজদূত মহাশয়ের প্রশ্নোজনের গুরুত্ব বড় বেশী ; প্রশ্নোজনের অল্পপাতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে । চিত্রক অবজ্ঞা ভবে হাসিয়া বলিল—‘কার্ষাপণ ! এই অশ্বের সজ্জাব মূল্যই পাঁচ দীনার । তোমাদের মগধ দেশে সম্ভবত তোমরা গর্দভে আরোহণ করিয়া থাক, তাই অশ্বের মূল্য জান না ।’ বলিয়া অশ্বের মুখ ফিরাইয়া প্রস্থানোত্তত হইল ।

শশিশেখর মনে মনে বড়ই ক্রুদ্ধ হইল ; কিন্তু এদিকে অঝারোহী চলিয়া যায়। শশিশেখর ক্রোধ গলাধঃকরণ করিয়া ডাকিল—‘শুন শুন। তুমি আমার অসহায় অবস্থা দেখিয়া অহুচিত মূল্য দাবী করিতেছ। পাটলিপুত্রে এরূপ করিলে দুই শত পণ দণ্ড দিতে হইত। কিন্তু এই অসভ্য বন্ধ দেশে—, যাক, পাঁচ দীনারই দিব।’

চিত্রক ফিরিয়া বলিল—‘পাঁচ দীনার তো সজ্জার মূল্য। অশ্বটি কি বিনা শুক্রে চাও?’

শশিশেখর বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। সে অর্থ সম্বন্ধে বিলক্ষণ হিসাবী, অকারণে অর্থ-ব্যয় করিতে তাহার বড়ই অরুচি। অথচ এই অর্থ-গৃহ্ন রাক্ষসটি সুরবিধা পাইয়া তাহার রক্ত শোষণ করিতে চায়। সে অস্থির হইয়া বলিল—‘আবার অশ্বের মূল্য। পাঁচটি দীনারেও যথেষ্ট হইল না? এটা কি দস্যুর রাজ্য?’

চিত্রক হাসিল—‘দস্যুর রাজ্যই বটে।—ভাবিয়া দেখ অশ্বের জন্ম আরও পাঁচটি দীনার দিতে পারিবে? না পার—চলিলাম।’

আবার অঝারোহী চলিয়া যায়। তখন শশিশেখর বিষন্ন স্বরে বলিল—‘আমি—আমি ছয়টি দীনার এবং এই অশ্বটি তোমাকে দিব, পবিতর্তে তোমার ঘোড়া আমাকে দাও। ইহার অধিক আর আমি দিতে পারিব না।’

‘তোমার অশ্ব লইয়া আমি কি করিব? মৃত গর্দভের মূল্য কি?’

‘মৃত গর্দভ! উহার সামান্য আঘাত লাগিয়াছে মাত্র, দুই দিনেই সারিয়া যাইবে। তখন উহাকে অনেক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে।’

চিত্রক দেখিল, মগধের দূত আর বেশী উঠিবে না। তাহার ঘোড়াটি নিতান্ত মন্দ নয়, পায়ের আঘাত অল্প শুষ্কযাতেই আরোগ্য হইবে। চিত্রকের একটু ঘোড়া থাকিলে ভাল হয়, যোদ্ধার অশ্বই সম্পদ। সে সম্মত হইল।

তখন শশিশেখর কাটি হইতে উত্তরীয় খুলিয়া তদভ্যস্তর হইতে একটি

খলি বাহির করিল। খলিটি বেশ পরিপুষ্ট। শশিশেখর সঞ্চয়ী ব্যক্তি, বিদেশ যাত্রার পূর্বে নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু এই খলিতে ভরিয়া লইয়াছিল। রাজকোষ হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণরোপ্য তো ছিলই, উপরন্তু কড়ি ছিল, প্রসাধনের জগু, চন্দন তিলক ছিল, কঙ্কতিকা ছিল, মুখ-শুক্ৰিব জগু এলা লবঙ্গ হরীতকী ছিল—আরও কত কি! আড চক্ষে চিত্রকের পানে চাহিয়া শশিশেখর খলির মুখ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

খলি হইতে দীনার বাহির করিতে গিয়া অসাবধানে কষেকটি শলাকার স্তায় ক্ষুদ্র বস্তু মাটিতে পড়িল। চিত্রক সেই দিকেই তাকাইয়া ছিল, এখন ক্ষত অশ্ব হইতে নামিয়া সেগুলি কুড়াইয়া লইল। হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিল, গজদন্তের পাষ্টি।

দ্যুতক্রীড়ার দুর্নিবাব মোহ আছে। চিত্রক উৎসুক বিষয়ে বলিল—  
‘দুত মহাশয়, আপনার খলিতে পাশা খেলাব পাষ্টি দেখিতেছি!’

শশিশেখর কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল—‘অক্ষক্রীড়া চতুঃষষ্টি কলার অক্ষ, পাটলিপুলেব সজ্জন নাগবিক মাহ্রেই পাশা খেলিয়া থাকেন। স্বয়ং পরম ভট্টারক—’

চিত্রক বলিল—‘তুমি আমার সন্তিত পাশা খেলিবে? ঘোড়া বাজি রহিল, যদি জিতিতে পার, বিনা মনো আমার ঘোড়া পাইবে; আব যদি আমি জিতি, তোমাব ঐ খঞ্জ অশ্ব লইব।’

মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া শশিশেখর দেখিল, হাবিলে তাহার কোনও ক্ষতি নাই, জিতিলে বিশেষ লাভ—ছয়টি স্বর্ণ দীনার বাচিয়া যাইবে। সে বলিল—‘উত্তম, খেলিব। আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ হইলেও দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা দ্যুতক্রীড়ার কেহ আহ্বান কবিলে পশ্চাৎপদ হই না।’

তখন দুইজনে, অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া, বৃক্ষতলে তুণেব উপব বসিয়া খেলিতে আরম্ভ করিল। অল্পকাল মধ্যেই উভয়ে খেলায় মাতিয়া উঠিল, ক্ষুধা তৃষ্ণা আর রহিল না।

কিন্তু উত্তেজনা শত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। খেলা যখন শেষ হইল তখন দেখা গেল শশিশেখরের অশ্বটীর স্বত্বাধিকার হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ক্ষোভে গুম্ফের প্রাস্ত টানিতে টানিতে শশিশেখর বলিল—‘তুমি নিপুণ ক্রীড়ক খেটে। ভাগ্য বলে আমাকে পরাজিত করিয়াছ। আবার খেলিবে?’

চিত্রক বলিল—‘খেলিব। এবার কি পণ রাখিবে?’

‘এবার তরবারি পণ।’ বলিয়া শশিশেখর কটি হইতে তরবারি খুলিয়া পাশে রাখিল।

চিত্রক বলিল—‘ভাল, আমি দুটি অশ্বই পণ রাখিলাম।’

শশিশেখর হঠে হইয়া খেলিতে বসিল। কিন্তু এবারও ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি বিমুখ হইলেন। তরবারি তুলিয়া লইয়া চিত্রক বলিল—‘আর খেলিবে?’

যে পরাজিত হয় তাহার খেলিবার কোঁক আবণ্ড বাঁড়িয়া যায়; রূপণও তখন দুঃসাহসী হইয়া উঠে। শশিশেখর আরক্ত নেক্রে চাহিয়া বলিল—‘খেলিব। তুমি দুইবার জিতিয়াছ বলিয়া কি বাব বার জিতিবে?’

‘উত্তম। আমি দুইটি অশ্ব ও তরবারি পণ রাখিলাম। তোমার পণ?’

‘আমার পণ—’ শশিশেখর সহসা থমকিয়া গেল; তাহার মস্তিষ্ক কোটরে ঈষৎ সুবুদ্ধির উদয় হইল। বোড়া ও তরবারি তো গিয়াছে, এইভাবে যদি সব যায়?

তাঁহাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া চিত্রক ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—‘ভয় পাইতেছ?’

সুবুদ্ধিটুকু ভাসিয়া গেল। শশিশেখর ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল—‘ভয়! কোন অবাচীন এমন কথা বলে? আমি যথাসর্বস্ব পণ রাখিয়া খেলিতে পারি। তুমি খেলিবে?’

‘আপত্তি নাই। কিন্তু আপাততঃ ঐ অসুরীয় পণ রাখিতে পার।’

শশিশেখর নিজ অঙ্গুরীর পানে চাহিল। মগধের রাজকীয় মুজাক্কিত অঙ্গুরীয়, ইহাই বিটক রাজসভায় তাহার প্রবেশপত্র। কিন্তু শশিশেখর তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। সে অঙ্গুরীয় খুলিয়া সবেগে ভূমির উপর স্থাপন করিয়া বলিল—‘তাহাই হোক। এস—এবার দেখিব’।

আবার খেলা আরম্ভ হইল। খেলার ফল কিন্তু ভিন্নরূপ হইল না। খেলার শেষে চিত্রক অঙ্গুরীয়টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া নিজ উর্জনীতে পরিধান করিল, বলিল—‘দূত মহাশয়, এবার আমি চলিলাম। আজ সারাদিন আহার হয় নাই, ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। আমাকেও অনেক দূর যাইতে হইবে।’

এতক্ষণে শশিশেখর একেবারে ফাটিয়া পড়িল; লাফাইয়া উঠিয়া গর্জন করিল—‘তুই কিতব! হস্তলাঘব করিয়া আমার পণ জিতিয়া লইয়াছিস!’

চিত্রকও বিজ্ঞাতের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। কিতব শব্দটা অক্ষত্রীড়কের পক্ষে অত্যন্ত দুষণীয়। তাহার ললাটের তিলক-চিহ্ন আঙুনের মত জ্বলিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই তাহার ক্ষিপ্ত রোষ অন্তহিত হইল। শশিশেখরের শেদ-মসৃণ দেহের উগ্র ভঙ্গিমা দেখিয়া জ্বলন্ত শজারুর শল্লকাবৃত বিক্রমের চিত্র স্মরণ হইয়া গেল। সে তাহার স্মীত-শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, বলিল—‘পাষ্টি’ তোমার, আমি হস্তলাঘব কবিলাম কিরূপে?’

কথাটা সঙ্গত। বাহার পাশা সে পাষ্টির মধ্যে ধাতু প্রবিষ্ট করাইয়া কৈতব করিতে পারে। শকুনি ও পুঙ্কর তাহাই করিয়াছিল। কিন্তু শশিশেখরের তাহা বুঝিবার মত মনের অবস্থা ছিল না, সে টাংকার করিতে লাগিল—‘তুই ধূর্ত কিতব, কিতবের অসাধ্য কাজ নাই—’

চিত্রক বলিল—‘ও শব্দ আর ব্যবহার করিও না, বিপদ ঘটবে।



ভাগ্যদেবী তোমার প্রতি বিমুখ তাই তুমি হারিয়াছ। গুন, আর একবার তোমাকে স্মরণ দিতেছি। তুমি এখন বলিয়াছ যে সর্বস্ব পণ রাখিয়া খেলিতে পার। এস, সর্বস্ব পণ করিয়া খেল, আমিও সর্বস্ব পণ করিতেছি। যদি জিতে পার, যাহা কিছু হারিয়াই সমস্তই ফিরিয়া পাইবে, আমার ষোড়াও পাইবে। সম্মত আছ ?’

শশিশেখর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া চিন্তা করিল। তাহার সর্বস্বই গিয়াছে, আছে কেবল খলিটি। খলিতে গুটির স্বর্ণ রৌপ্যের মুদ্রা আছে সত্য, কিন্তু এই নির্জন অরণ্যে সেগুলি কোন কাজে লাগিবে? ষোড়া ফিরিয়া পাইলে আশা আছে লোকালয়ে পৌঁছিতে পারিবে, নচেৎ বনে রাত্রিবাস স্নানিশ্চিত। বনে নিশ্চয় ব্যাঘ্র তরফু আছে—! আসন্ন রাত্রির কথা ভাবিয়া সহসা তাহার হৃৎকম্প হইল। ইহা যে মৃগয়া কানন তাহা সে জানিত না।

শশিশেখর আর দ্বিধা করিল না, আবার খেলিতে বসিল। কিন্তু ভাগ্যদেবী সত্যই তাহার উপর রুষ্ট হইয়াছিলেন, সে জিতে পারিল না। ক্ষোভে হতাশায় পাষ্টি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চিত্রক সবলে পাষ্টিগুলি তুলিয়া লইয়া বলিল—‘এ পাষ্টি এখন আমার। মনে রাখিও তুমি সর্বস্ব হারিয়াছ।’

শশিশেখর উন্নত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—‘তুই চোর তরুর, কৈতব করিয়া আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিস্।’

চিত্রকের চক্ষু অসি ফলকের হ্রায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল—‘আর যাহা বল আপত্তি নাই, কিন্তু কিতব শব্দ আর উচ্চারণ করিও না। একবার নিষেধ করিয়াছি।’

উন্নত শশিশেখর গর্জন করিয়া বলিল—‘কিতব! কিতব! কিতব! সহস্রবার বলিব। আমার হাতে যদি তরবারি থাকিত—’

চিত্রকের নাসা স্ফুরিত হইয়া উঠিল, সে শশিশেখরের তরবারি তাহার

দিকে নিষ্কপ করিয়া বলিল—‘এই নাও তোমার তরবারি। কি করিবে? যুদ্ধ?’

শশিশেখর তরবারি তুলিয়া গেল। সে বোধ হয় কিছু অসিদ্ধি জ্ঞানিত, কিন্তু বস্ত্রের মানসিক অবস্থায় তাহাও বিস্মরণ হইয়াছিল। সে তরবারি উর্ধ্বে তুলিয়া চিত্রককে আক্রমণ করিল।

দুইবার অসিতে অসিতে ঠোকাঠুকি হইল, তারপর শশিশেখরের অস্ত্র ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়িল।

চিত্রক বলিল—‘ভাবিয়াছিলাম তোমাকে দয়া করিব, সর্বস্ব লইব না। কিন্তু তুমি অপাত্র। থলি দাও।’

ক্রন্দনোন্মুখ শশিশেখর কুলিতে কুলিতে থলি ফেলিয়া দিল।

‘এবার তোমার উর্ধ্বম বস্ত্র ও অঙ্গাবরণ দাও।’

শশিশেখর হতভম্ব হইয়া গেল।

‘আঁ্যা—তবে কি আমি উলঙ্গ থাকিব?’

চিত্রক হাসিল। ‘সে তুমি জান। আমার সম্পত্তি আমি লইব।’

‘তুই চোব দস্য তরুণ।’

‘শীঘ্র দাও—নচেৎ কাড়িয়া লইব।’

হতভাগ্য শশিশেখর তখন নিরুপায় হইয়া মধুক বৃক্ষের অন্তরালে গেল, বস্ত্রাদি খুলিয়া চিত্রকের দিকে ফেলিয়া দিল। নিষ্ফল ক্রোধের তপ্ত অশ্রুজল তাহার গুহ্ম ভিঙাইয়া দিতে লাগিল।

নিজের সমস্ত সম্পত্তি লইয়া চিত্রক অশ্রু চড়িয়া বসিল। শশিশেখরের ঘোড়ার পৃষ্ঠে তরবারির কোষ দ্বাৰা সনেগে আঘাত করিতেই সে ধোঁড়াইতে ধোঁড়াইতে পলায়ন করিল। চিত্রক তখন বৃক্ষের কাণ্ড লক্ষ্য করিয়া বলিল—‘তোমাকে তবু একটা দয়া করিলাম, তোমার তরবারিটা ফেলিয়া গেলাম। যদি নকুল অথবা শশক তাড়া করে, আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।’

বেলা তখন পড়িয়া আসিতেছে, স্বর্ধ তরুচূড়া স্পর্শ করিয়াছে । দিক-নির্ঘর করিয়া লইয়া চিত্রক স্বর্ধকে দক্ষিণে রাখিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইল ।

শশিশেখর বনের মধ্যেই পড়িয়া রহিল । তাহার পার্শ্বর্তমান অবস্থায় তাহাকে আর পাঠক পাঠিকাব সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত হইবে না ।

\* \* \* \*

প্রাকার-বেষ্টিত কপোতকূট নগরের উত্তর তোরণের নিকট চিত্রক দুপন পৌছিল তখন সন্ধ্যা ঘনীভূত হইয়াছে । তোরণেব অনতিদূর পর্যন্ত গিয়া বন শেষ হইয়াছে ; এইখানে আসিয়া চিত্রক অশ্ব ছাড়িয়া দিল । তারপর শশিশেখরের বস্ত্রাদি পবিধান করিয়া, মন্তকে লৌহ-জালিকের উপর উষ্ণীয় বাবিবা স্বচ্ছন্দ অল্পবেগ পদক্ষেপে নগরে প্রবেশ করিল ।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাসাদ শিখরে

ম্বাকাশে প্রায় পূর্ণাবব ৮দ্র । চন্দ্রালোকে কপোতকূট নগর অতি হৃন্দন দেখা হতেছিল ।

বিটক রাজ্যটি পারিপার্শ্বিক ভূখণ্ড হইতে উচ্চ মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত । মালভূমিও সমলে নয়, তরদায়িত হইয়া প্রান্ত হইতে বতই কেন্দ্রের দিকে গিয়াছে ততই উচ্চ হইয়াছে । কেন্দ্রস্থলে কপোতকূট নগর । বাজ্যের সর্গোচ্চ শিখরের উপর অধিষ্ঠিত বলিয়াই বোধ হয় ইহান নাম কপোতকূট ।

নগরটি রাজ্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ ; কোথাও মনভূমি নয়, চারিদিকে উচ্চ

প্রাকারের দৃঢ় পরিবেষ্টনী ; তন্মধ্যে মহেশ্বরের জটাজালবদ্ধ চন্দ্রকলার স্থায়  
অপূর্ব সুন্দর নগর শোভা পাইতেছে ।

বসন্ত রজনীতে চন্দ্রবাষ্পাচ্ছন্ন দীপালোকিত নগরের সৌন্দর্য শতগুণ  
বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পথগুলি আঁকাবাঁকা, দুই পাশে পাষাণ নির্মিত হর্যা ।  
নাঝে নাঝে প্রমোদিত ; পথের সন্ধিস্থলে জলাধারেব মধ্যবর্তী গোমুখ  
হইতে প্রস্রবণ ঝরিয়া পড়িতেছে । উদ্ধা-ধাবিণী পাষাণ বনদেবী ব মূর্তি  
রাজপথে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে । বহু নাগবিক-নাগবিকা বিচিত্র  
বেশ প্রদাননে সজ্জিত হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতেছে, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না  
নিষিক্ত বায়ু সেবন করিয়া দিবসেব তাপ-শ্মানি দূব করিতেছে । প্রমোদ  
বন হইতে কখনও বংশীবব উঠিতেছে ; কোথাও লতা নিকুঞ্জ হইতে হৃদ  
জল্পিতপ্রণয় কুজন ও অশ্রুট কনহাস্ত উথিত হইতেছে, কক্ষণ মঞ্জীবক  
ঝঙ্কার কখনও কোতুক উল্লসিত হইয়া উঠিতেছে, কখনও আশে মদানস  
হইয়া পড়িতেছে । কপোতকূটে কপোত-মিথুনের অভাব নাই ।

নগরীব একটি পথ দীপমাণায় উজ্জ্বল । বিলাসিনী নাগবিকাব স্থায়  
রাত্রিকালেই এই পথের শোভা অধিক, কাঁবণ প্রধানতঃ ইহা বিলাসেব  
কেন্দ্র । পথের দুই পাশে অগণিত বিপনি, কোনও বিপণিতে কেশব  
সুবভিত তাব্দুল বিক্রয় হইতেছে, বিক্রেত্রী রক্তাধবা চঞ্চলাক্ষী যুবনী ;  
ক্রেতার অপ্রতুদ নাই, রূপশিখাবৃষ্ট নাগবিকগণ চাবিদিকে ভিঃ কবিয়া  
আছে ; চপল পবিহাস, সবস ইঙ্গিত, লোল কটাঙ্কেব বিনিময় -চলিত ।  
যে পসারিণী যত সুন্দরী ও রসিকা, তাহাব পণ্য তত অধিঃ  
বিক্রয় হইতেছে ।

বিপণির ফাঁকে ফাঁকে মদিবাগৃহ । পিপাসু নাগবিকগণ সেখানে গিয়,  
বিন্জ নিজ রুচি অল্পসাবে গোষ্ঠী মাধ্বী পান কবিতেছে । আসবে বাহাদেব  
রুচি নাই তাহাবা কপিখ সুবাসিত তক্র বা বদায়রস সেবন কবিয়া শরীর  
শীতল করিতেছে । মদিরাগৃহের অভ্যন্তরে বহু কক্ষ, কক্ষগুলি সুসজ্জিত,

ভাষাতে আন্তরণের উপর বসিয়া ধনী বণিক-পূজগণ দূতক্রীড়া করিতেছে। কোনও কক্ষে মৃদঙ্গ সপ্তস্বর সহযোগে সঙ্গীতের চর্চা হইতেছে। মদিরাগৃহের কঙ্করীগণ চষক ও ভৃঙ্গার হস্তে সকলকে আসব যোগাইতেছে।

নগর নারীদের গৃহঘারে পুষ্পমালা ছলিতেছে; অদ্যন্তর হইতে মূহ রক্তাভ আলোকরশ্মি ও যন্ত্রের স্বপ্নমদির নিকণ পথচারীকে উন্নয়ন করিয়া তুলিতেছে। পথে সুখাঘেষী নাগরিকের মস্তুরী যাতায়াত, কুসুমের মদমোহিত গন্ধ, প্রসাধন ও ভূষণাদির বৈচিত্র্য, কচিং কোতুক-বিগলিতা নারীর কণ্ঠ হইতে বিচ্ছুরিত হাস্য, কচিং কলহের কর্কশ রূঢ়স্বর—এই সব মিদিয়া এক অপূর্ণ সম্মোহন সৃষ্টি করিয়াছে।

বিলাস বিহ্বলতার আবর্ত হইতে দূবে নগরের আর একটি কেন্দ্র—রাজপুরী। পূর্বেই বলিয়াছি—নগর সর্বত্র সমভূমি নয়, কোথাও উচ্চ কোথাও নীচ। যে ভূমি উপর রাজপুরী অবস্থিত তাহা নগরীর মধ্যে সর্বোচ্চ, নগরীতে প্রবেশ করিয়া চক্ষু তুললেই সর্বাপ্রে রাজপুরীর ভীমকান্তি আনন্দন চোখে পড়ে, মনে হয় কপোতকূট দুর্গের মধ্যস্থলে আর একটি দুর্গ সগর্বে মাথা তুলিয়া আছে।

প্রথমে প্রাকার পেষ্টন; স্থল চতুর্দশে প্রস্থের নির্মিত—প্রস্থে দ্বাদশ হস্ত, দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্ধ কোশ—বলেরে ছায় চক্রাকায়ে পুরভূমিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রাকারের অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গ আছে; কিন্তু সে কথা পরে হইবে। নগরীর প্রধান পথ যেখানে আসিয়া প্রাকার স্পর্শ করিয়াছে সেখানে উচ্চ ভোবনঘার। ইহাই রাজপুরী হইতে আগম নিগমের একমাত্র পথ। শলাকা কণ্টকিত দৌহেব বিশাল কবাট; দুই পাশে স্থল বর্ত্তন তোরণ স্তম্ভ; তোরণ স্তম্ভেব অভ্যন্তরে প্রতীহার গৃহ। শূলহস্ত প্রতীহার দিনাবাত্র তোরণ পাহারা দিতেছে।

তোরণ অতিক্রম করিয়া সম্মুখেই সভাগৃহ। তাহার পশ্চাতে মন্ত্রগৃহ। অতঃপর দক্ষিণে বামে বহু বহু ভবন—কোবাগার আবুধগৃহ বহুভবন—

কাছাকাছি হইলেও প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র দণ্ডায়মান। মধ্যস্থলে রাজ অরোরোবের মর্মরনির্মিত ত্রি-ভূমক প্রাসাদ—সাত কোটার মধ্যস্থিত যৌক্তিক, সাতশত রাক্ষসীর বিনীত সতর্কতা যেন নিরন্তর তাহাকে বিরিয়া আছে। দ্বারে দ্বারে যবনী প্রতীহারীর পাহারা।

এই ত্রিভূমক শপাসাদের উন্মুক্ত ছাদে পুষ্পাকীর্ণ কোমল পদ্মল আন্তরণের উপর অর্ধশয়ান হইয়া রাজকুমারী রট্টা যশোধরা শ্রিয়সখী স্নগোপার সহিত কথা কহিতেছিলেন। কথা এমন কিছু নয়, আকাশের দিকে চাহিয়া অগসকর্থে ছ'একটি তুচ্ছ উক্তি, তারপব নীরবতা, আবার ছ'একটি তুচ্ছ কথা। এমনি ভাবে আলাপ চলিতেছিল। যেখানে মনের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই, সেখানে অবিচ্ছেদ কথা বলাব প্রয়োজন হয় না।

প্রপাপালিকা স্নগোপার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে। কুমারী রট্টা যশোধরাকেও তিনি দেখিয়াছেন, হয় তো তিনিতে পারেন নাই। যে কিশোর কার্তিকেয় বিদ্বাতের মত স্নগোপার জনসরে দেখা দিয়াছিলেন, ষাঁহার অশ্ব চুরি করিয়া চিত্রক পলায়ন কবিয়াছিল, তিনি আর কেহ নহেন, মুগয়াবেশধারিণী রাঃ নন্দিনী বট্টা। হৃণ-দুতিতা পুণ্যবেশে মুগয়া করিতে ভালবাসিতেন।

কবি কালিদাস বলিয়াছেন, বহুল পরিধান করিলে সুন্দরী তদ্যাকে অধিক সুন্দর দেখায়। হয় তো দেখায়, আমরা কখনও পবীক্ষা করিয়া দেখি নাই। কিন্তু যোগবেশ ধারণ করিলে রূপসৌর রূপ বর্ধিত হয় একথা স্বীকার করিতে পারিব না। ভাল দেখাইতে পারে, কিন্তু অধিক সুন্দর দেখায় না। আমরা বলিব, কুমারী রট্টার মত বিনি তদ্যা ও সুন্দরী, ষাঁহার বয়স আঠার বৎসর—তিনি অলকগুচ্ছ কুন্দকলি দ্বারা অলুবিক করুন, সোত্রেরেণু দিয়া মুখের পাণ্ডুলী আনয়ন করুন, চূড়াপাশে নব কুরবক ধারণ করুন; কর্ণে শিরীষ পুষ্পের অবতংস ঢলাইয়া দিন, হৃৎস্পন্দনের তালে যুথী-কঙ্ক নৃত্য করিতে থাকুক, নীবিবন্ধে কর্ণিকার কাঞ্চী মুচ্ছিত হইয়া থাক —

লোভী পুরুষ তো দূরের কথা, অনসূয়া সখীরাও ফিরিয়া ফিরিয়া সে রূপ দেখিবে।

তেমনই, পুষ্পাভরণভূষিতা রট্টার পানে সখী স্নগোপাও থাকিয়া থাকিয়া বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিতেছিল। ছুই সখীর মধ্যে কৃত্রিম ভালবাসা। রাজকন্যাও যখন স্নগোপার পানে তাঁহার অলস নেত্র ফিরাইতেছিলেন, তখন তাঁহার হিমকরনিক্ত দৃষ্টি অকারণেই সখীকে প্রীতির রসে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছিল। ছুইজনে আশেপাশে খেলার সাথী; যোবনে এই প্রীতি আরও গাঢ় হইয়াছিল। স্নগোপার স্বামী সংসার সবই ছিল, কিন্তু তাহার জীবন আবর্তিত হইত রট্টাকে কেন্দ্র করিয়া। আর, বিশাল রাজ অববোধের মধ্যে একাকিনী কুমারী রট্টা—তিনিও এই বাণ্য সখীকে একান্ত আপনার জানিয়া বৃকে টানিয়া লইয়াছিলেন।

তবু, রাজকন্যার সঙ্গিত প্রপাপালিকার ভালবাসা, বিশ্বয়কর মনে হইতে পারে। কিন্তু এতই কি বিশ্বয়কর? রাজায় রাজায় কি প্রণয় হয়? রাজকুমারীর সঙ্গিত বাজকুমারীর প্রণয় হয়? হয় তো হয়, কিন্তু তাহা বড় দুর্লভ। যেখানে অবস্থার তাবতম্য আছে সেইখানেই প্রকৃত ভালবাসা ভ্রমে। নির্ধারিত জল পর্বত শিখর লইতে গভীর খাদে ঝাঁপাইয়া পড়ে, উচ্চাভিলাষী ধূম নিম্ন হস্তে উর্ধ্বে আকাশে উথিত হয়। ইহাই স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া রট্টার ধমনীতে হুণ রক্ত আভিজাত্যের প্রভেদ স্বীকার করিত না। হুণ বর্ধর হোক, সে আভিজাত্যের উপাসক নয়, শক্তির উপাসক।

রট্টা একমুঠি মল্লিকা ফুল আশ্রয় হইতে তুলিয়া লইয়া আত্মাণ গ্রহণ করিলেন, তারপর চাঁদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—‘মধুসূত্রে তো শেষ হইতে চলিল; এবার ফুলও ফুরাইবে। স্নগোপা, তখন তুই কি করিবি?’

রট্টার বাম কর্ণ হইতে শিরীষ পুষ্পের রুমকা খুলিয়া গিয়াছিল, স্নগোপা

উঠিয়া সযত্নে সেটি পরাইয়া দিল। মুকুরের মত ললাট হইতে ছ'একটি চূর্ণ কুন্তল সরাইয়া দিয়া বলিল—‘ফুল যখন ফুড়াইবে, তখন চন্দন দিয়া তোমাকে সাজাইব। চুলে নিক্ত স্নান-কমায় মাখিয়া কপূর স্নানসিত জলে ধারায়ন্তে তুমি স্নান করিবে, আমি তোমার মুখে চন্দনের ঝিলক, বুকে চন্দনের পত্রলেখা আঁকিয়া দিব; সিন্ধু উশীরের পাখা দিয়া তোমাকে ব্যঞ্জন করিব। সখি, তবু কি তোমার দেহের তাপ জুড়াইবে না?’ স্নগোপার মুখে একটু চাপা হাসি।

হাসির গূঢ় ইঙ্গিত রট্টা বুঝিলেন, পুষ্পমুষ্টি স্নগোপার গায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন—‘তোমার পাখার বাতাসে আমার দেহের তাপ জুড়াইবে কেন?’

স্নগোপা বলিল—‘ধাঁহার পাখার বাতাসে অঙ্গ শীতল হইত তিনি তো আসিয়াছিলেন, তুমি যে হাসিয়াই তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলে।’

রট্টা ক্ষণকাল নীরব রহিলেন, তারপর চঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—‘স্নগোপা, সত্য বল দেখি, গুর্জরের রাজকুমারের গলায় ববমালা দিলে তুই স্নখী হইতিস?’

এইখানে পূর্বতন প্রসঙ্গ কিছু বলা প্রয়োজন।

ইদানীং মহারাজ রোট্ট ধর্মান্দিত্য ঐহিক বিষয়ে কিছু অধিক অগ্ৰমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজকার্যে তিনি বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না; কিন্তু কয়েক মাস পূর্বে একান্তমনে ধর্মচর্চা করিতে কবিত্তে তিনি সহসা উদ্বিগ্ন হইয়া লক্ষ্য করিলেন যে তাঁহার কন্ঠাব যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে। একপ লক্ষ্য করিবার কারণ ঘটয়াছিল।

রোট্ট যখন পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই রাজ্য বিজয় করেন তখন তাঁহার এক সহকারী যোদ্ধা ছিল—তাঁহার নাম তুফান। তুফান তাহার বীর্য এবং বাহুবল দ্বারা রোট্টকে বহুপ্রকারের সাহায্য করিয়াছিল; এমন কি ভূতপূর্ব রাজাকে ধৃত করিয়া সে-ই স্বহস্তে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছিল। তাই, রাজ্য কবলীকৃত হইলে রোট্ট তুষ্ট হইয়া রাজ্যের সীমান্তস্থিত চঠন



নামক প্রধান গিরিভূর্গ তাহাকে অর্পণ করেন। পদমর্ধাদায় রাজার পরেই তাহার স্থান নির্দিষ্ট হয়।

তাহার পর বছবর্ষ অতীত হইয়াছে, তুষফাণের মুছা হইয়াছে। তাহার পুল কিরাত এখন চষ্টন দুর্গের অধিপতি। কিরাত স্মদর্শন যুবা—কিছু কুটিল ও নির্ভর বলিয়া তাহার কুখ্যাতি ছিল। লোকে বণিত, হুণ রক্তই তাহার দেহে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

এই কিরাত একদা নববোবনা তেজধিনী রটাকে দেখিয়া মাজিল। অল্প কৈহ হইলে হয় তো নিজ স্পর্ধায় ভীত হইয়া পলায়ন করিত, কিন্তু কিরাত নিজ দুর্গ ছাড়িয়া কপোতকুটে আসিয়া বসিল। রাজসভার নিত্য খাতায়াতে কুমারীর সহিত প্রত্যহই তাহার সাক্ষাৎ হয়। সুমিষ্ট ভাষণে কিরাত যেমন পটু, আবার মৃগয়াদি পুকষোচিত ক্রীড়ায় তেমনই দক্ষ। মৃগয়ায় সে রাজকুমারীর নিত্য পার্শ্বচর হইয়া উঠিল।

তাঁহার অভিপ্রায় বৃদ্ধিতে রাজকুমারীর বাকি রহিল না। হুণকন্যা শিশুকান হইতে অন্তঃপুবেব নীড় ছাড়িয়া মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত, তাই তাহার বুদ্ধিও একটি অনবগুষ্ঠিত স্বচ্ছন্দ্য লাভ করিয়াছিল। মৃগয়াকালে তিনি কিরাতের অব্যর্থ লক্ষ্যের প্রশংসা করিলেন, উদ্যান বাটিকায তাহাব সবস চাটু বচনে হাস্য করিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রশংসা-দৃষ্ট মোহমুক্ত হইয়াই বসিল, হাসিতে অধররাগ ভিন্ন অন্য কোনও রাগ-বক্তমা ফুটিল না। কিরাত অন্তর্ভব করিল, রাজকন্যা সবদাই তাহাকে মনে মনে বিচাব করিতেছেন, তুলাদেও ওজন করিতেছেন। তাহার দুর্দম অভীপ্সা আলও প্রবল ও ব্যক্ত হইয়া উঠিল।

নগবে এই কথা লইয়া লোকানুফি আরম্ভ হইল। সচিব ও সভাসদগণ পুঃই ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সংশেবে রাজাও লক্ষ্য করিলেন।

রাজা প্রথমে বিস্মিত হইলেন; তারপর সচিবদের ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। উক্ততপ্রকৃতি কিরাতের প্রতি কেহই সন্দেহ ছিলেন না;

তাঁহারা মত দিলেন, একজন সামন্তপুত্রের সহিত বাজকন্ঠাব বিবাহ হইতে পারে না, বিশেষতঃ যখন কুমারীই রাণ্যের উত্তরাধিকাবিণী। তাহাতে বাজবংশের মৰ্যাদাব জানি হইবে। বরং নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত অজ্ঞাত বাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা কৰ্ত্তব্য। মনে যদি সম্বন্ধী হয়, তাহা হইলে বিপৎকালে সাহায্যপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না।

সচিবদেব মন্ত্রণাই মহাবাজের মনঃপূত হইল। তিনি বাজসভায় কিরাতকে মূহু ভৎসনা কবিতা জানাইলেন যে, 'নিজ দুর্গাবিবাব' ত্যাগ কবিতা দীর্ঘকাল বাজধানীতে বিলাস ব্যসনে কালান্বিত কৰা তাঁহাব পক্ষে অশোভন। কিরাত কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে মহাবাজের মুখের পানে চাষ্টিয়া বহিল, তাবপর বাঙ নিপত্তি না কবিতা সভা ত্যাগ কবিল। অপর্যন্ত পবে সে অশ্বপৃষ্ঠে কপোতপট ছাড়িয়া নিজ দুর্গে ফিবিয়া গেল।

কিরাতকে বিদায় কবিতা মহাবাজ প্রাপ্তোবনা স্তাব বিবাহের কথা চিন্তা কবিতে বসিলেন। জীবন অনিত্য, তাঁহাব মৃত্যাব পূবে বৃদ্ধাব বিবাহ না হইলে সিংহাসনের উত্তরাধিকাব হইয়া নিশ্চয় গণ্ডে ।। বসিল। মন্ত্রীদেব সহিত আলোচনা পৰ স্থির হইল, দ্বিত্ব গুচববাচব দ্বিতী পু। কুমাব উট্টাবক বাব বমা মহাখ্যাতিমান বীবপুত্র, তাঁহাব নামে নিমণ পত্র প্রেবিত হোক, তিনি আসিষা কিছু গান বিটম্ববাস্য অবপ্তন কবন। তাবপর বাজকন্ঠাব সহিত সাক্ষাৎ ঘটলে উভয়েব মনোভব বৃষ্টিয়া যথাকৰ্তব্য নিরূপণ কৰা হাইবে।

মাডম্বব নিমন্ত্রণ লিপি যথাকালে প্রেবিত হলে। অবশ্য তাহাতে বিবাহের কোনও উল্লেখ বহিন না, কিন্তু মনোণত অভিপ্ৰায় গু বনা শুবিলেন। বাজধানীতব ক্ষেত্রে পবিদ্যাব কবিতা কথা বলিাব বীতি কোনও কালেই ছিল না।

অনতিকাল পবে গুৰ্জবেব বারণ বৰ্মা মহাসমাবোচে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। রট্টার সহিত রাজসভায় তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল। প্রথম দর্শনে রট্টা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কুমার ভট্টারক বাবণ বর্মার মূর্তি বীরোচিত বটে, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় সমান; সম্মুখে উদব ও পশ্চাতে নিন্তম্ব রণভেরীর ন্যায় উচ্চ, মুখমণ্ডলে বিশাল গুম্ফ ও জ্বংগল প্রায় তুল্য রোমশ। তাঁহাকে দেখিয়া গুর্জর-দেশীয় খ্যাতনামা হস্তীব কথা স্মরণ হয়। রট্টা ক্ষণকাল বিস্ফাবিত ন্যনে তাঁহার পানে চাষ্টিয়া থাকিয়া ছিন্ন বল্লরীৰ মত সভাপ্রলৈই হাসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন।

বিবাহের প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হইল। ক্ষুণ্ণ বারণ বর্মা পরদিনই স্ববাজ্যে ফিবিয়া গেলেন।

সুগোপা সদীক্ষলভ চপলভায় রট্টাকে এই ঘটনার ইঙ্গিত করিয়া পরিচাস কবিয়াছিল। এখন রট্টাব প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল—‘আমি কণা ছাড়িয়া দাও, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের গলায় মালা দিলেও আমি স্তম্ভী হইব না। কিন্তু আমার কথা ভাবিলে তো চলিবে না।’

বড়া বলিলেন—‘তবে কাহার কথা ভাবিব?’

‘নিজেব কথা। এই যে দেবভোগ্য যৌবন, এ কি ফুলচন্দন দিয়া সাজাইয়া শুধু আমিই দেখিব? দেবতার ভোগে লাগিবে-না?’

‘আমার যৌবন আমি সঞ্চয় কবিয়া রাখিব, কাহাকেও ভোগ করিতে দিব কেন?’

সুগোপা হাসিল।

‘সখি, বিধি-প্রেরিত ভোক্তা যেদিন আসিবে সেদিন কিছুই সঞ্চয় কবিয়া রাখিতে পাবিবে না, তল্ল-মন সমস্তই তাঁব পায়ে সমর্পণ কবিবে।’

‘তুই না হয় মালাকরের পায়ে তল্ল-মন সমর্পণ কবিয়াছিস, তাই বলিয়া কি সকলেরই একটি মালাকর চাই?’

‘চাই বৈকি সখি, মালাকর নহিলে নাবীর যৌবন নিবুঞ্জে ফুল ফুটাইবে কে?’

বট্টা আর কোন কথা না বলিয়া স্নিতমুখে আকাশের পানে চাহিলেন, চক্ষুহুট তন্দ্রাচ্ছন্ন, যেন কোন্ অনাগত ভবিতব্যের স্বপ্ন দেখিতেছে। স্নগোপা কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া শেষে বিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—‘মহারাজ যে কী করিতেছেন তিনিই জানেন। হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া চষ্টন দুর্গে গিয়া বসিয়া আছেন। এদিকে বসন্তঋতু নিঃশেষ হইয়া আসিল। কি জ্ঞান গিয়াছেন তুমি কিছু জানো?’

বট্টা বলিলেন—‘চষ্টনের দুর্গাধিপ কিরাত পত্র লিখিয়াছিল, কয়েকটি চৈনিক শ্রমণ বুদ্ধের পবিত্র বিহাবভূমিদর্শন করিবার মানসে ভাবতে আসিয়া ছেন, তাঁহারা পাটলিপুত্র বাইবেন, পথে কষেকদিনেব জন্ত চষ্টন দুর্গে বিশ্রাম করিতেছেন। তাই শুনিয়া মহারাজ অহং সন্দর্শনে গিয়াছেন।’

স্নগোপা মাথা নাড়িয়া বলিল—‘বিশ্বাস হয় না, কিবাতটা মহা ধূর্ত, ছল করিয়া মহারাজকে নিজ দুর্গে লইয়া গিয়াছে—নিশ্চয় কোনও দুর্ভাগিনী আছে। হয়তো নিভূতে পাইয়া চাটুবাণ্ডে মহাবাজকে জবীভূত করিয়া তোমার পাণিপ্ৰার্থনা করিবে।’

‘তুই কিবাতকে দেখিতে পাবিস না।’

‘তা পারি না। শুনিয়াছি এহ বয়সেই সে যোব অত্যাচাৰী—  
অতিশয় দুর্জন।’

‘শিকাবে কিন্তু তার অব্যর্থ লক্ষ্য।’

‘অব্যর্থ লক্ষ্য হইলেই সজ্জন হয় না। বাওপাশী কি সজ্জন?’

‘কিরাত চমৎকার মিষ্ট কথা বলিতে পারে।’

‘যে পুরুষ মিষ্ট কথা বলে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাহ।’

‘তোমার মালাকর বুঝি তোকে কেবলই গালি দেয়?’

স্নগোপা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—‘পবিত্র নয়। কিরাত তোমার পায়ের দিকে তাকাইবার যোগ্য নয়, কিন্তু সে তোমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে! আমি জানি, তোমার জন্ত সে পাগল।’

রাত্রী অল্প হাসিলেন, তারপর গভীর হইয়া বলিলেন—‘শুধু আমার জন্ম নয় স্নগোপা, এই বিটক রাজ্যটাব জন্মও সে পাগল। কিন্তু ও কথা থাক। রাত্রি গভীর হইয়াছে, তুই এবার গৃহে যা।’

‘তাই যাই, তুমিও ক্লান্ত হইয়াছ। একে সাগাদিন বনে বনে মৃগয়া, তার উপর চোরের উৎপাত—জলসত্র হইতে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিতে হইয়াছে। মানুষ বোড়া চুরি করে এমন কথা ভুলে গুনি নাই। আর কী স্পর্ধা—রাজকন্য়ার বোড়া চুরি! দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম লোকটা ভাল নয়।’ নিজের লাঞ্চার কথা স্মরণ করিয়া স্নগোপার রাগ একটু বাড়িল—‘দুর্বৃত্ত বিদেশী তস্কর! এখন যদি তাহাকে একবার পাই—’

‘কি করিস?’

‘শুলে দিই।’

‘আমিও। এখন যা, চোরের উপর বাগ করিবা পতি-দেবতাকে আর বশ্ট দিস না। সে হয় তো হাঁ করিবা তোর পথ চাহিয়া আছে, ভাবিতেছে থেকেও চোবে চুরি কবিয়া লইয়া গিবাছে।’

‘মানাকবের সে ভব নাই, তিনি জানেন আমাকে চুরি করিতে পারে এমন চোর জন্মায় নাই। তিনি এখন কোন শৌখিনীকালয়ে পড়িয়া অপরী কিমবীর স্বপ্ন দেখিতেছেন। যাই, তাহাকে খুঁজিয়া লইয়া গৃহে ফিবিতে হইবে তো।’

‘প্রত্যহং বুঝি তাই করিতে হয়?’

‘তা।’ স্নগোপা গৃহ হাসিল—‘মানাকব লোকটি মন্দ নয়, আমাকে ভালও বাসে। কিন্তু মাদবা-স্কন্দবীর প্রতি প্রেম কিছু অধিক। যাই, সপত্রীগৃহ হইতে পতি-দেবতাকে উদ্ধাব করিবা নিজ গৃহে আনি গিয়া।’

হাসিতে হাসিতে স্নগোপা বিদায় গ্রহল। তখন মধ্য রাত্রি হইতে অধিক বিঘর নাই।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মদিরা ভবন

রাজপুত্রী হইতে বাহির হইতে গিয়া স্নগোপা দেখিল তোবণদ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন প্রায়ই ঘটে, সেজন্য স্নগোপার গতিবিধি বাধাশ্রান্ত হয় না। সে প্রতীহাবকে গুপ্তদ্বার খুলিয়া দিতে বলিল।

কোনও অজ্ঞাত কাৰণে প্রতীহাবের মনে তখন কিঞ্চিৎ বস সঞ্চাব হইয়াছিল; সে নিজের দ্বিধা-বিভক্ত চাপদাডিতে মোচড় দিয়া একটা আদি-রসাস্রিত রসিকতা কবিতা ফেলিল। স্নগোপাও বাঁঝাণে উত্তর দিল। সেকালে আদিবসটা গো-বন্ধ বন্ধবন্ধের মত অমেধ্য বিবেচিত হইত না।

তোবণের কবাটে একটি চতুর্দোণ দ্বার ছিল, বাহির হইতে গেলে পড়িত না। স্নগোপার ধমক বাইয়া প্রতীহাব তাহা খুলিয়া দিল, বলিল—  
‘ভাল কথা, দেব-হুঁহিতাব খোঁড়াটা মন্দুবায কবিতা আসিয়াছে।’

সবিস্ময়ে স্নগোপা বলিল—‘সে কি! আৰ চোব?’

মুণ্ড নাড়িয়া প্রতীহাব বলিল—‘চোব ফিবিয়া আসে নাই।’

‘তুমি নিপাত দাও।—দেবহুঁহিতাকে সংবাদ পাঠাইয়াছ?’

‘যবনীৰ মুখে দেবহুঁহিতাব নিকট সংবাদ গিয়াছে, এতক্ষণ তিনি পাঠিয়া থাকিবেন।’

স্নগোপা অনিশ্চিত মনে ক্ষণেক চিন্তা করিল, তাবপব সহপৰ্ণে ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বাহির হইবার উপক্রম কবিল। প্রতীহাব কোঁতুকসহকাৰে বলিল—‘এত রাত্রে কি চোবের সন্ধানে চলিলে?’

‘হাঁ।’

প্রতীহার নিখাস ফেলিল—‘ভাগ্যবান চোর! দেখা হইলে তাহাকে  
আমার কাছে পাঠাইয়া দিও।’

‘তাই দিব। চোরের সংসর্গে রাত্রিবাস করিলে তোমার রস কমিতে  
পারে।’ স্নগোপা দ্বার উত্তীর্ণ হইল।

প্রতীহার ছাড়িবার পাত্র নয়, সে উত্তর দিবার জন্ত দ্বার পথে মুখ  
বাড়াইল। কিন্তু স্নগোপা তাহার মুখের উপর সম্মোরে কবাট ঠেলিয়া  
দিয়া হানিতে হানিতে নগরের দিকে চলতে আরম্ভ করিল।

স্নগোপা যতক্ষণ মন্দিরা গৃহে পতি অশ্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে সেই  
অবকাশে আমরা চিত্রকের নিকট ফিরিয়া বাই।

কপোতকূটে প্রবেশ করিয়া চিত্রক উৎসাহে নত্রে চারিদিকে চাহিতে  
চাহিতে চলিল। নগরীর শোভা দেখিবার আগ্রহ তাহার বিশেষ ছিল না।  
প্রথমে স্মৃতিবৃত্তি করিতে হইবে, প্রায় এক অগোরাত্র কিছু আহার হয়  
নাই। কঠিবন্ধন দৃঢ় করিয়া জঠবাগ্নিকে দীর্ঘকাল ঠেকাইয়া বাথা যায় না,  
কেশ যান অবশ্যস্তারী তাহা সহ কবিত্তে হইয়াছে, কিন্তু দ্যুত প্রসাদাৎ  
এখন আর ক্ষুধাব জ্বালা সহ কবিবার প্রয়োজন নাই।

পথে চলিতে চলিতে শীঘ্রই একটি মোদক ভাণ্ডার তাহার চোখে  
পড়িল। থরে থরে বহুবিধ পক্কান সজ্জিত বহিয়াছে—পিষ্টক লড্ডুক ক্ষীর  
দধি কোনও বস্তুরই অভাব নাই। মেদময়ন-দেহ মোদক বসিবা দীর্ঘ  
খজুব শাখা দ্বাৰা মাফকা তাড়াইতেছে।

মোদকদ্বয়ে বসিয়া চিত্রক উদবপূর্ণ করিয়া আহার করিল। একটি  
বালক পথে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিষ্টান্ন নিবীক্ষণ করিতেছিল, চিত্রক  
তাহাকে ডাকিয়া একটি লড্ডু দিল। উৎসাহ বালক লড্ডু খাইতে  
খাইতে প্রহান করিলে পর, সে জল পান করিয়া গাত্রোখান করিল;  
ভোজ্যের মূল্যবন্ধপ শিশিণেথরের থলি হইতে একটি ক্ষুদ্র মুদ্রা লইয়া

মোদককে দিল, তারপর তৃপ্তি-মহুর পদে আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

গৃহদ্বারে তখন দুই একটি বর্গি জলিতে আরম্ভ করিয়াছে ; গৃহস্থের শুদ্ধান্তঃপুর হইতে ধূপ কালাগুরুর গন্ধ বাতাসে ভাসিতেছে, প্রদীপ-হস্তা পুরনারীগণ বন্ধাঞ্জলি হইয়া গৃহদেবতার অর্চনা করিতেছে। কর্টিং দেবমন্দির হইতে আরতির শঙ্খবন্টধ্বনি উথিত হইতেছে। দিবাবসানের বৈরাগ্য-মুহুর্তে নগরী যেন ক্ষণকালের জন্য যোগিনীমূর্তি ধারণ করিয়াছে।

অপরিচিত নগরীব পথে বিপথে চিত্রক অনায়াস চরণে সুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হাতে কোনও কাজ নাই, উদর পরিপূর্ণ—স্বতবাং মনও নিরুদ্ধেগ। যে-বাক্তি রাজপুরুষের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল তাহাকে মাত্র তিনজন দেখিয়াছে, তাহারা চিত্রককে এই জনাকীর্ণ পুরীতে দেখিতে পাইবে সে সম্ভবনা কম। দেখিতে পাইলেও তাহার নূতন বেশে টিনিতে পারিবে না। অতএব নগর পবিদর্শনে বাধা নাই।

নগর পরিভ্রমণ করিয়া চিত্রক দেখিল, উজ্জয়িনী বা পাটলিপুত্রের স্থায় বৃহদায়তন না হইলেও কপোতকূট বেশ পবিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য নগর। সে তাহার ঘাঘাবর যোদ্ধাজীবনে বহু স্থানীয় মহাহানীয় দেখিয়াছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র অসমতল পায়াণ নগরটি তাহার বড় ভাল লাগিল। সে ঈষৎ ফুঙ্ক হইয়া ভাবিল, এখানে দীর্ঘকাল থাকা চলিবে না, বেশী দিন থাকিবেট ধবা পড়িবার ভয়। এদিকে তিনজন তো আসেই, তাহা ছাড়া শিশিখের যে বন হইতে বাহির হইয়া আসিবে না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ?

ক্রমে রাত্রি হইল ; আকাশে চন্দ্র ও নিয়্যে বহু দীপের জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাজভবন শয়ে দীপাবলি মণিমুকুটের তায় শোভা পাইতে লাগিল। স্মৃতিতে স্মৃতিতে চিত্রক একটি উজ্জানের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কয়েকজন ভদ্র নাগরিক দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে। সে একজনকে •ঞ্জিঙ্গাসা করিল—‘মহাশয়, ওটা কি?’



নাগরিক বলিল—‘ওটা রাজপুরী।’

সপ্রশংস নেত্রে রাজপুরী নিরীক্ষণ করিয়া চিত্রক বলিল—‘অপূর্ব প্রাসাদ। মগধের রাজপুরীও এমন সুরক্ষিত নয়। রাজা ঐ পুরীতে থাকেন?’

নাগরিক বলিল—‘থাকেন বটে, কিন্তু বর্তমানে তিনি রাজপুরীতে নাই। তাই তো একপ অঘটন সম্ভব হইয়াছে।’

‘অঘটন?’

‘ভুনেন নাই? রাজকুমারীর অশ্ব চুরি করিয়া এক গর্তদাস তত্ত্ব পণায়ন করিয়াছে।’

‘রাজকুমারীর অশ্ব—?’ প্রশ্নটা অনবধানে চিত্রকের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

‘হাঁ। কুমারী মৃগয়ায় গিয়াছিলেন, জলসত্রে এই ব্যাপার ঘটয়াছে।—আপনি কি বিদেশী?’ বলিয়া নাগরিক সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে চিত্রকের মূল্যবান বেশভূষার পাতল চাহিল।

‘হা। আমি—ধর অধিবাসী, কর্মসূত্রে আসিয়াছি।’

চিত্রক আর সেখানে দাঁড়াইল না।

আকস্মিক সংবাদে বুদ্ধিদ্রষ্ট হইবে চিত্রকের প্রকৃতি সেকপ নয়। কিন্তু এই সংবাদ পরিগ্রহ করিবার পর প্রায় প্রহরকাল সে বিক্ষিপ্ত চিত্তে হতস্তঃ নিচরণ করিয়া বেড়াইল। সংবাদটা নগবে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। কে জানিত যে ঐ অশ্বারোহীটা রাজকন্যা! রাজকন্যা পুরুষবেশে বোড়ায় চড়িয়া মৃগয়া করিয়া বেড়ায়! আশ্চর্য্য বটে। চিত্রক রাজকন্যার মুখাবয়ব স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বিশেষ কিছু উদ্ধার করিতে পারিল না; তাহাকে দেখিয়া গর্বিত ও কিশোরবয়স্ক মনে হইয়াছিল এইটুকুই শুধু স্মরণ হইল।

রমণীর সম্পত্তি সে অপহরণ করিয়াছে, মনে হইতেই চিত্রক লজ্জা

অল্পভব করিল। সে ভাগ্যাহেষধী যোদ্ধা, পবদ্রব্য সঙ্কল্পে তাহার মনে তিলমাত্র কুণ্ঠা নাই, সে জানে, এই বসুন্ধরা এবং ইহাব যাবতীয় লোভনীয় বস্তু বীভভোগ্য। তবু, রমণী সঙ্কল্পে তাহার মনে একটু দুর্বলতা ছিল। জীবনে সে কখনও নাবীভ নিকট হইতে কোনও দ্রব্য কাড়িয়া লয় নাই, স্বেচ্ছাভ তাহার বাহা দিয়াছে তাহার হানিধুখে গ্রহণ করিয়াছে, তদতিবিক্ত নয়। ”

হয় তো ঐ পুরুষবেশীভ কপ ও ঐশ্বর্য্য তাহার মনে ঈর্ষ্যাব সঙ্কাবে কবিষাছিল, হয় তো প্রপাপালিকাভ সন্তিত নুবকেভ ঘনিষ্ঠতা তাহার পৌকষকে আঘাত কবিষাছিল,—ভুগোপাব সহিত নিজেভ ব্যবহাবে স্ববণ করিষাও তাহার মন সবিস্ময় স্ফোভে ভবিষা উঠিল। অবশু তাহার আচরণে অনেকপানি কৌতুক মিশ্রিত ছিল, তথাপি, কৌতুক কখন নিজ সীমা অতিক্রম কবিষা নিগ্রহে রূপান্তবিত হইষাছিল তাহা সে বুদ্ধিতে পাবে নাই। বুদ্ধিমিত শ্রান্তিভগ্ন দেহে আশাহত অবহাবে মাহুভ যে কম কবে, পবিপূর্ণ উদবে স্তম্ভ দেহে সে নিজেই তাহার বাবণ খুঁজিষা পায় না।

আকাশেভ পানে চািষা চিত্রক হাসিল। জীবনকে সে বহুরূপে বহু অবস্থাবে দেখিষাছে, তাই পশ্চাত্তাপ ও অন্তশোচনাকে সে নিবর্থক বলিষা জানে। নিষতির গতি অন্তশোচনাবে দাবা বেশমান ভ্যক্রিষ্ণ হয না, অদৃষ্টই নিষতা। চিত্রকেভ মনে হহল, ভাগ্যদেবী তাহার চাবিপানে স্পষ্ট ভবিষ্যভাব জ্ঞান ব্বনিতে আবশু কবিষাছেন—এহ জানে কুদ্র মনেভ মত আবদ্ধ হইষা সে কোন অদৃষ্ট গটে উৎসিষ্ট হইবে কে জানে ?

চন্দ্রেভ দিকে দৃষ্টি পড়িতে তাহার চেতনা ফিরিষা আসিল। মধ্যগগনে চন্দ্র, রাত্রি গভীভ হইতেছে। সচকিতে সে চাবিদিকে চাছিল, দেখিল বৌদ্ধ চৈত্বেভ নিকটস্থ উচ্চ ভূমিভ উপবে সে একাকী দাঁড়াইষা আছে। এখানে পথ গৃহ-বিবল, লোক চলাচলও কম। দুবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিষা

দেখিল, একটি স্থান আলোকমালায় ঝলমল করিতেছে। বহু নাগরিকের মিলিত স্বরগুঞ্জন তাহার কর্ণে আসিল।

চিত্রক কিছুকাল ধাবৎ ঈষৎ তৃষ্ণা অশুভব করিতেছিল, ঐ আলোক-দীপ্ত পথের দিকে চাহিয়া তাহার তৃষ্ণা আরও বাড়িয়া গেল। নগরে অবশ্য মন্দিরাগৃহ আছে, এ কথাটা এতক্ষণ তাহার মনে হয় নাই। রাত্রির সন্ধ্যা একটা আশ্রয়ও খুঁজিয়া লইতে হইবে। সে আলোকলিপ্সু পতঙ্গের মত জ্বত সেই দিকে চলিল।

বর্জনীর আনন্দধারা তখন অত্যন্তোত্তাপ হইয়া আসিয়াছে। পুষ্প-বিপণিতে পুষ্পসম্ভার প্রায় শূন্য, পনারিণীদের চক্ষে আলস্য; রাজপথে নাগরিকদের গভীরতা ও ব্যস্ত আগ্রহ মন্দীভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মণীনা রাত্রির নবোদয়জনিত প্রসন্নতা প্রগাঢ়গোবনার রসবন নিবিড় নাদুর্ঘে পরিণত হইয়াছে।

পুষ্পাসব গন্ধে আকৃষ্ট নৃমক্ষিকা যেমন কেবলমাত্র ভ্রাণশক্তিব দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রচলিত ফলকলিকার সন্নিধানে উপস্থিত হয়, চিত্রকও তেমনি শিপিাসা-প্রণোদিত হইয়া একটি মন্দিরাগৃহের দ্বারে উপনীত হইল। মন্দিরাগৃহের ভিতরে উচ্চ চত্বরের উপর গিয়া মুণ্ডিতশীর্ষ শৌণ্ডিক স্তম্ভপীঠের রতনমণ্ডা গণনা করিতেছিল, চিত্রক প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখে একটা স্বর্ণদীনার অবস্থান ভরে ফেলিয়া দিল, বলিল—‘পানীয় দাও।’

চমকিত শৌণ্ডিক বুদ্ধকের সম্ভাষণ করিল—‘আসুন মহাভাগ! কোন পানীয় দিয়া মধোদয়ের তৃপ্তিপান করিব? আসব সুরা বারুণী মন্দিরা—যে পানীয় ইচ্ছা আদেশ করেন।’

‘তোমার শ্রেষ্ঠ মন্দিরা আনয়ন কর।’

‘বথা আজ্ঞা!—মধুশ্রী!’

শৌণ্ডিক কিঙ্করীকে ডাক দিল। নুপুর কাঙ্ক্ষী বাজাইয়া একটি

তদ্রালসা কিঙ্করী আসিয়া দাঁড়াইল। শৌণ্ডিক বলিল—‘আর্থকে স্মৃষ্টিত কক্ষে বসাত, শ্রেষ্ঠ মন্দিবা দিয়া তাঁহার সেবা কর।’

কিঙ্করী চিত্রককে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া বসাইল। কক্ষটি সূচাকল্পে সজ্জিত, কুট্টিমের উপব শুভ্র আস্তরণ, তরুপবি স্থল উপাধান তাৎপল করঙ্গ প্রভৃতি রহিয়াছে। চাবি কোণে পিত্তলেব দীপদণ্ডে বর্হিকা জলিতেছে। ধূপশলা হইতে চন্দনগন্ধী স্তম্ব ধূম ক্ষীণ বেখায় উখিত হইতেছে। প্রাচীর গাত্রে সমুদ্র মছনের চিত্র, সূধাভাগু লইয়া স্ৰবাসুরের মধ্যে বোর হৃদ্ব বাধিয়া গিয়াছে।

চিত্রক উপবিষ্ট হইলে কিঙ্করী নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতাব সঠিত মদিরা-ভৃঙ্গাব, চবক ও সূচিক্রিত স্থালীতে মংস্রাণ্ড আনিয়া তাহার সম্মুখে বাধিল, তারপব আদেশ প্রত্যাশায় কৃতাজলিপুটে দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইল। চিত্রক এক চবক মদিরা ঢালিয়া এক নিশ্বাসে পান কবিয়া ফেলিল, তাবপব তৃপ্তিব সূদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—‘সেবিকে, তুমি যাও, আমান আব কিছু প্রয়োজন নাই।’

মধুশ্রী সাবধানে কবাট ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান কবিল। একাকী বসিয়া চিত্রক স্বাহ মংস্রাণ্ড সহযোগে আবও কয়েক পাত্র মদিবা পান কবিল। ক্রমে তাহার চক্ষু ঢুলু ঢুলু হইয়া আসিল, মস্তিষ্কেব মধ্যে স্বপ্নসুন্দরীব মঞ্জীব বাজিতে লাগিল। সে উপাধানেব উপব আলস্তভবে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া দিল।

মন্দিরাজনিত মুহু বিহ্বলতাব মধ্যে চিন্তার ধাবা আবছায়া হইয়া বায়, একটা অহেতুক স্মৃতি আলস্তেব সহিত মিলিয়া মনকে হিন্দোলাব মত দোলা দিতে থাকে। চিত্রকের অবস্থা তখন সেইরূপ। সে নিজেব অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়েব উপর দৃষ্টিপাত কবিল, তাবপব অঙ্গুরীয় চোখের কাছে আনিয়া ভাল কবিয়া নিরীক্ষণ কবিল। তখন বনের মধ্যে শশিশেখবেব সহিত আলাপের কথা তাহার নূতন কবিয়া মনে পড়িয়া গেল।

নিজ মনে মূহু মূহু হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া বসিল ; কটি হইতে খলিটি বাহির করিয়া তাহার মুখোদ্ঘাটন পূর্বক একটি একটি সামগ্রী বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। স্বর্ণপ্রসূ খলির সমস্ত বৈভব এখনও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই।

তিলক চন্দন দেখিয়া তাহার মুখের হাস্য প্রসার লাভ করিল ; কঙ্কতিকাটি তুলিয়া ধরিয়া সে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। এলা লবঙ্গ মুখে দিয়া সর্বোতুকে চিবাইল, সব শেষে জতুমুদ্রালাঙ্কিত কুণ্ডলাকৃতি লিপি খুলিয়া গম্ভীরমুখে পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। মগধের লিপি, বিটঙ্করাজের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। পাঠ করিতে করিতে চিত্রক তাহাতে নিমগ্ন হইয়া গেল।

এই সময় দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া কে একজন ঘরের মধ্যে উঁকি মারিল ; কাঁজলপরা একটি চোখ ও মুখের কিয়দংশ দেখা গেল মাত্র। চিত্রককে দেখিয়া কাঁজলপরা চোখ ক্রমশ বিস্ফারিত হইল, তারপর ধীরে ধীরে কবাট আবার বন্ধ হইয়া গেল। চিত্রক পত্রপাঠে নিবিষ্ট ছিল, কিছু দেখিল না ; দেখিলেও বোধ করি চিনিতে পারিত না।

বলা বাহুল্য যে উঁকি মারিয়াছিল সে স্নগোপা। পতি অযেবণে কয়েকটি মদিরাগৃহ ঘুরিয়া শেষে সে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাকে দেখিযাই শৌণ্ডিক হাসিমুখে বলিয়াছিল—‘প্রপাপানিকে, তোমার মানুষ্যটি তো আজ এখানে নাই।’

স্নগোপা বলিয়াছিল—‘তোমার কথায় বিশ্বাস নাই, আমি খুঁজিয়া দেখিব।’

‘ভাল, তাই দেখ।’

তখন এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিতে খুঁজিতে একটি ঘরে উঁকি মারিয়া সহসা তাহার চক্ষু বলসিয়া গিয়াছিল। বেশভূষা অল্প প্রকার, কিন্তু সেই জুবুঁত অশ্চোরই বটে।

কিছুক্ষণ স্নগোপা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপব পা টিপিয়া শৌণ্ডিকের নিকট ফিবিয়া গেল। চুপি চুপি বলিল—‘মগুক, নগবপালকে সংবাদ দাও।’

বিশ্রিত মগুক বলিল—‘সে কি। কি হইয়াছে?’

‘চোর। যে চোর আজ কুমারী বট্টাব অশ্ব চুবি করিয়াছিল সে ঐ প্রকোষ্ঠে বসিয়া মগুপান কবিতেছে।’

মগুকেব মুখে ভয়ের ছায়া পড়িল। দক্ষতর্কবীকে মন্দিরাগৃহে আশ্রয় দিলে শৌণ্ডিককে কঠিন বাজনাও ভোগ কবিতে হয়। সে বলিল—‘সর্বনাশ, আমি তো কিছু জানি না।’

‘তাই বলিতেছি, যদি নিজেব প্রাণ বাঁচাইতে চাও তবে নগবপালকে ডাকিয়া আন।’

‘নগবপালকে এত রাতে কোথা পাঠিব? তিনি নিশ্চয় গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজা বাহতেছেন, তাঁর কাঁচা ঘুব ডাড়াইয়া কি নিজের পামে দড়ি দিব?’

স্নগোপা চিন্তা কবিল।

‘তবে এক কাজ কর। দুইজন যামিক নগববন্দী ডাকিয়া আন, তাহারা আজ রাতে চোরকে বাঁচিয়া রাখুক, কাণ প্রাণে মহাপ্রতীহাবের হস্তে সমর্পণ কবিলে।’

‘সে কথা ভাল’ বলিয়া ব্যস্তমনস্ত মগুক বাহির হইয়া গেল।

অধিক দূব বাহতে হইল না। রাত্রিকালে যামিক রক্ষাবা পথে পথে বিচরণ করিয়া নগর পাগবা দিয়া থাকে। একটা তল্পুণ মিপণিব সঙ্গুখে দাঁড়াইয়া দুইজন যামিকরক্ষী বোব করি বাঁত্রতে পাথেষ সংগ্রহ করিতেছিল, মগুকেব কথাষ উত্তেজিত হইয়া তাহা নপে চলিল।

স্নগোপা অল্প কথায় ব্যাপার বুঝাইয়া দিল, তখন চারিজনে চিত্রকের প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া ভিতবে প্রবেশ কবিল। চিত্রক এখন লিপি পাঠ

শেষ করিয়া থলি কোমরে বাঁধিয়াছে, ভূঙ্গাব হইতে শেষ মদিরাটুকু চালিয়া পান কবিতেছে। অঙ্গধারী ছইজন পুরুষকে সম্মুখে দেখিয়া সে বলিল—  
‘কি চাও?’

সুগোপা পিছন হইতে বলিল—‘তোমাকে চাই।’

চিত্রক অবিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তরবাঁবি বাঁহিব করিবাব পূর্বেই বম্বীবা তাহাব ঘাডে লাফাইয, পড়িয়া তাহাকে পীড়িয়া ফেলিল।

সুগোপা তখন সম্মুখে আসিয়া বলিল—‘অথচোব, আমাকে চিন্মিতে পাব?’

চক্ষু সঙ্কটিত কবিয়া চিত্রক তাহাব পানে চাহিল। অদৃষ্টের জাল গুটাইয়া আসিতেছে। সে অধবোষ্ঠ চাপিয়া বলিল—‘প্রপাপানিকা!’

সুগোপা বম্বীদেব দিকে ফিবিয়া বলিল—‘হতাকে সাবধানে পাহাৰা দিও। অতি ধূর্ত চোব, স্তবধা পাইলেই পালাইবে।’

একজন বম্বী বলিল—‘সাবধানে কোথায় রাখিব? রাহে কারাগার তো বন্ধ আছে।’

ঠাৎ সুগোপাব মনে পড়িয়া গেল। উদ্দেশিত হাগি চাপিয়া সে বলিল—‘বাত পুরীৰ তোবণ-প্রহরীৰ কাছে লইয়া বাও। আমাব নাম কবিয়া বলিও, সে সমস্ত বাড়ি চোরকে পাহাৰা দিবে।’

সুগোপাকে নগবেব সকলেই চিন্মিত। প্রপাপানিকা হইলে কি হয়, বাজুকুমারীৰ মধ্য। বম্বীবা দ্বিভিন্ত না কবিয়া চোবকে বাঁধিয়া বাজপুরীৰ দিকে লইয়া চলিল।

ভাগ্যক্রমে চিত্রকেব থলিটি বম্বীবা কাড়িয়া লইল না। তাহাবা সাধু-চবিত্র বলিয়াই হোক, অথবা যে চোব বাজকথাব বোডা চুপি কবিয়াছে তাহাব উপর বাটুপাড় কবিলে গোলাযোগ হইতে পারে এই ভয়ই হোক, চিত্রকের থালতে তাহাবা হস্তক্ষেপ করিল না।

## যষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### বন্দিনী

তোরণ প্রতীহারের নাসিকায় বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল। স্নগোপার প্রতি রসে-ভরা প্রীতির 'ভাব আর তাহার ছিল না। তত্পরি দুইটা বিকশিতদন্ত বামিক-রক্ষা যখন একটা চোরকে তাহার স্বন্ধে চাপাইয়া দিয়া চলিয়া গেল তখন শুধু স্নগোপা নয়, সমস্ত নারী জাতির উপর তা'গার মন বিরক্ত হইয়া উঠিল। দেবদুহিতার সখী না হইয়া অল্প কোনও লোক হইলে কখনই সে চোরকে সারা রাত্রি আগুলিয়া থাকিবার ভার লইত না। শাস্তির সময়, দেশে কোনও প্রকার উপদ্রব নাই; এ সময়ে রাজপুরীর তোরণ পাহারা দিতে হইলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় না; ঘারে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিত করিলেই প্রভাত হইয়া যায়। কিন্তু এখন এই অশ্বচোরটাকে লইয়া সে চক্ষু মুদিলে কি প্রকারে? চোর যদি পালায় তবে আর রক্ষা নাই। তবে কি চতুঃপ্রহর রাত্রি জাগিয়া এই বক্ষ্যাপ্ত্র চোরকে পাহারা দিতে হইবে? অত্যন্ত অসম্ভব হইয়া প্রতীহার বলিল—‘বাপু অশ্বচোর, তোমার সাজসজ্জা দেখিয়া তোমাকে শিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি এমন কুর্কর্ম করিতে গেলে কেন? বাগ-কুমারীর ঘোড়া চুরি করিলে কি জন্ম?’

চোর উত্তর না দিয়া নির্বিকার মুখে আকাশের পানে চা'চিয়া বসিল। প্রতীহার পুনরায় বলিল—‘আর যদি করিলেই, ধরা পড়িলে কেন? ধবা যদি পড়িলে, কল্যা প্রাতে পড়িলে কি দোষ হইত?’

চোর এবারও কোনও উত্তর করিল না।

‘তুমি তো কল্যা প্রাতে নির্ধাৎ শূলে চড়িবে। তবে আজ রাতে আমাকে কষ্ট দিয়া কী লাভ হইল?’



প্রতীহারের বিরক্তি ক্রমশ হতাশায় পর্যবসিত হইতেছিল এমন সময়ে তাহার পাশে একটি কৃষ্ণ ছায়া পড়িল। চমকিয়া প্রতীহার দেখিল, পুরভূমির জীবন্ত প্রেত গুহ নিঃশব্দে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ আখ্যায়িকায় গুহের স্থান অতি অল্পই; তবু তাহার একটু পরিচয় আবশ্যক। সে হুণ, হুণ অভিযানের সময় আসিয়াছিল। রাজপুত্রীর মৃত্যু তাহার মন্তকে গুরুতর আঘাত লাগে, কপালের বাম ভাগে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ফলে, গুহের স্থিতি ও বাকশক্তি চিবতরে লুপ্ত হইয়া যায়। তদবধি সে রাজপুত্রীর প্রাকার বেষ্টনীর মধ্যে আছে, কেহ তাহাকে কিছু বলে না। দিবা ভাগে সে কোথায় থাকে কেহ দেখিতে পায় না; রাত্রে পুরভূমির উপর শীর্ণ ধ্বংস ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়ায়। রাত্রির প্রহরীরা কদাচিৎ তাহাকে দেখিতে পায়, সে তোরণ স্তম্ভের পাশে বসিয়া আপন মনে হাসিতেছে, অথবা অতৃপ্ত প্রেত-ঘোনির মত অন্ধকার প্রাকারের উপর সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। প্রহরীরা সাগ্রহে তাহার সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করে কিন্তু গুহ নীবদ থাকে; তাহার লুপ্ত স্থিতির মধ্যে কোন্ বিচিত্র রহস্য লুক্কায়িত আছে কেহ অনুমান করিতে পারে না।

গুহ আসিয়া কয়েকবার সন্তর্পণে চিত্রককে প্রদক্ষিণ করিল; মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বেন আশ্রাণ গ্রহণ করিল; পশ্চাতে গিয়া কি যেন দেখিল—হাবপর নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে প্রতীহারীকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকিল।

চিত্রকের হস্তদ্বয় পশ্চাতে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ছিল; প্রতীহার গিয়া দেখিল কোন্ অজ্ঞাত উপায়ে রজ্জুবন্ধন টিলা হইয়া গিয়াছে, টানিলেই হাত বাহির হইয়া আসিবে। প্রতীহার ত্রুদ্ব হইয়া বলিল—‘আরে শৃগালপুত্র চোর, তুই আমাকে ফাঁকি দিয়া পালাইতে চাস?’ সে দৃঢ়ভাবে রজ্জু বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল।

শুহের গলার মধ্যে অব্যক্ত হাসিব মত একটা শব্দ হইল। প্রতীহাব তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—‘গুহ, বড় বক্ষা করিয়াছ। এ চোব পালাইলে আমাকেই শূলে যাইতে হইত। এখন এই গর্ত-কুত্মাওটাকে বাঁধিয়া সারাবাত্রি বসিয়া থাকি। আব বিশ্বাস নাই। একটা কটকন্দ ও যদি থাকিত, এই নষ্টবুদ্ধি তরুবটাকে তাহাব মধ্যে বন্ধ করিয়া নিশ্চিত হইতে পারিতাম।’

শুহের চোখে যেন একটা ছায়া পড়িল, সে দাঁড়াইয়া নিজ অক্ষুদ্র দংশন করিতে লাগিল।

প্রতীহাবেব মনে বহু অশান্তি সঞ্চিত হইয়া উদ্ভিবাচিন, সে গুহকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে আবম্ভ কবিল—‘গুহ, তোমাকে বণিতোছি, ত্রীণাচিনে কদাপি বিশ্বাস কবিতো নাই। তাছাদো মত অশাসিনী রেদাধিনী দুষ্টপ্রকৃতি—’ উপবৃক্ত বেগবান বিশেষণেব অভাবে প্রতীহাব থামিয়া গেল।

হয তো নারীজাতিব সম্বন্ধে প্রতীহাবেব উদ্ভিতে কিছু ছিন্ন, গুহেব চক্ষুদ্বয় সহসা অর্থপূর্ণ উত্তেজনায বিশ্বাবিত হইয়া উঠিল। সে সবেগে মস্তক আন্দোলন করিয়া প্রতীহাবেক তাহাব অনুসরণ কবিবাব সম্ভেত করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল।

দুই তোরণ-গুপ্তে দুইটি প্রতীহাব কক্ষ আছে, পূর্ব বনা সম্মুখে এই কক্ষ দুটিব প্রবেশদ্বারে কাট নাহ, তাই প্রতীহাবেব পিঙ্গামের উপযোগী হইতোও বন্দীকে বন্ধ কবিয়া বাঁধিবাব সুবিদা না। ইহাদো মধ্যে একটি সর্বদা বন্ধ হত হইত, অচুটি প্রয়োচনেব অভাবে শূন্য পড়িয়া থাকিত। গুহ সেই অন্যতর বন্ধটিব মুখ পর্য্যাপ্তিগা অর্থাৎ হাত দিয়া প্রতীহাবেকে ডাকিল।

প্রতীহাবেব বোভুহল হইল। কিন্তু চোবেকো এবানী ফেলিয়া বাহতে পারে না। সে স্রণেক চিন্তা করিয়া চিত্রবেব হস্তজু ধবিয়া টানিতে টানিতে লইয়া চলিল।

স্বস্ত্যগৃহের মুখে উপস্থিত হইয়া প্রতীহার দেখিল, গুহ চক্ৰমকি চুকিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ জালিয়াছে। চক্ৰমকি প্রদীপ কোথা হইতে পাইল সেই জানে, হয় তো পূর্ণ হইতে সংগ্রহ কবিয়া রাখিয়াছিল। প্রতীহার বুঝিল এই পরিত্যক্ত কক্ষটিতে গৃহের বাতাসাও আছে।

দীর্ঘ অব্যবহাবে ঘরটি অপবিচ্ছন্ন, কোণে উর্গনাভেব জাল। একটা চর্মচটিকা আলোকের আবির্ভাবে ত্রস্ত হইয়া মূর্খতার উপর চক্রাকারে উড়িতে লাগিল।

প্রদীপ ধবিয়া গুহ কক্ষপ্রাচীরের কাছে গেল। অমঙ্গল পাথরের দেয়াল, পাথরের উপর বেখানে ঘোড় লাগিয়াছে সেখানে কমঠ-পৃষ্ঠের ছায়া চিহ্ন। গুহ প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে লাগিল, তাৎপর্য একটা স্থান অক্ষুণ্ণ দ্বারা টিপিয়া ধরিল। ধীবে ধীবে দেয়াল হইতে চতুর্কোণ একটা অংশ সরিয়া গেল।

মহাবিশ্বায়ে প্রতীহার দেখিল, একটি সুউচ্চ পথ। ক্ষীণালোক সূড়ঙ্গের বেশী দূর দেখা গেল না, কিন্তু সুউচ্চ মে প্রাচীরের ভিতর দিয়া বক্ষীক-বিববের তায় বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। হুগেরা পূর্বে দখল করিয়াছিল বটে কিন্তু এই গুহ সুউচ্চের কথা জানিতে পাবে নাহ।

মিটির্মিটি আসিতে হাঙ্গিতে গুহ রণ মধ্যে প্রবেশ কবিয়া প্রতীহারকে অঙ্কসবন কবিত্তে ইঙ্গিত কবিল। সুউচ্চ অপরিমিত নয়, ছুইজন লোক পাশাপাশি চলিতে পারে। প্রতীহার চিত্রককে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রায় ত্রিশ হস্ত বাইবার পদ সম্মুখে গহবরের তায় অন্ধকার একটা স্থান দেখা গেল; কসেক ধাপ সোপান এই অন্ধ-পূর্বের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে, আর কিছু দেখা যায় না।

উত্তেজিত প্রতীহার বলিল--‘এ তো দেখিতেছি একটা ফুট-কক্ষ! আশ্চর্য! কেহ ইহার সন্ধান জানিত না। গুহ, তুমি কি প্রকারে জানিলে?’

গুহ ফাটের ক্ষত চিহ্নটার উপর হাত বুলাইয়া যেন স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু স্মৃতির দ্বার খুলিল না ।

প্রতীহার বলিল—‘ভালই হইল । আজ রাতে চোরটা এইখানেই থাক, কাল প্রাতে আবার বাহির করিয়া লইয়া যাইব ।—কে ভাবিয়াছিল প্রাকারের ভিতরটা ফাঁপা ! তাহার ভিতর স্ফুট আছে, কুট কক্ষ আছে ! যাহোক, গুহ, একথা হুমি জান আর আমি জানিলাম—আর কে জানিতে না পারে—’

প্রতীহারের মন্তকে নানা প্রকার কল্পনা খেলা করিতেছিল ; কে বলিতে পারে, ভূগর্ভস্থ গুপ্ত কক্ষে হয়তো পূর্ববর্তী রাজাদের কত রত্ন—ঐশ্বর্য লুক্কায়িত আছে । ‘চোরটা জানিতে পারিল বটে কিন্তু কান ও শূলে যাইবে সূতরাং একপ্রকার নিশ্চিন্ত—’ মনে মনে এই কথা ভাবিয়া প্রতীহার চিত্রককে সেই অন্ধকার গহবরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল, তারপব কবাটে অর্গল লাগাইয়া গুহের সহিত বাহিরে ফিবিয়া আসিল । মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া সূদীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ পূর্বক প্রতীহার গুহেব দিকে ফিরিয়া দেখিল, অশরীরী ছায়ার স্থায় গুহ কখন নিঃশব্দে অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে ।

\* \* \* \*

কুট কক্ষের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গেলে চিত্রক দেখিল রক্তগীন অন্ধকারের মধ্যে সে দাঁড়াইয়া আছে । কিন্তু কুট কক্ষের বায়ু সম্পূর্ণ নিশ্চল ও বন্ধ নহে, কোনও অদৃশ্য পথে বায়ু চলাচল হইতেছে—শ্বাস বোধ হইয়া মরিবার ভয় নাই ।

চিত্রকের হস্তদ্বয় রজ্জুদ্বারা পশ্চাতে আবদ্ধ ছিল, প্রতীহার খুব দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছিল । কিছুক্ষণ চেষ্টা করিবার পর সে বন্ধনের ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া লইল । সৈনিকের বিচিত্র জীবনে এই কৌশলটি সে আয়ত্ত করিয়াছিল ।

তারপর অন্ধকারে অতি ধীরে সে সোপান অবতরণ করিতে লাগিল। পাঁচ ছয়টি ধাপ নামিবার পর পদদ্বারা অনুভব করিয়া বুঝিল সোপান শেষ হইয়া চত্বর আরম্ভ হইয়াছে।

এই চত্বর কুতখানি বিস্তৃত তাহা জানিবার কোতূহল চিত্রকের ছিল না, কুট কক্ষ হইতে পলায়নের পথ থাকি সম্ভব নয়, থাকিলেও এই অন্ধকারে তাহা আবিষ্কার করা অসাধ্য। চিত্রক শেষ সোপানের উপর বসিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনে হইল সে জীবনের শেষ সোপানে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তাহার হাসি আসিল। নিয়তির জালে সে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য! তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনকে সমাপ্তির উপকূলে পৌছাইয়া দিবার জন্ত নিয়তির এত উত্তোষ আয়োজন, এত ষড়্‌ঘন ? সে যোদ্ধা, মৃত্যুর সত্বে তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। তবে আজ মৃত্যু সিধা পথে তীরের মুখে বা অসির ফলায় না আসিয়া এমন কুটিল পথে আসিল কেন ? জ্ঞানের উন্মেষ হইতে নিজের জীবনের কাহিনী তাহার মনে পড়িল। মৃত্যু বহুবার তাহার সম্মুখে আসিয়াছে, আবার হাসিয়া অবজ্ঞাভরে ফিরিয়া গিয়াছে; কিন্তু এত আড়ম্বর করিয়া তো কখনও আসে নাই!

শৈশবের কথা তাহার ভাল করিয়া মনে পড়ে না। যখন তাহার অন্তর্মান পাঁচ বৎসর বয়স তখন কোন্ এক নগরে একটা বিকলাঙ্গ লোকের দহিত সে বাস করিত। লোকটা বোধহয় অর্ধ-উন্মাদ ছিল, কখনও তাহাকে প্রণয় কবিত, কখনও বা আদর কবিত। তাহার একটা শাণিত ছুরি ছিল, সেই ছুরি দিয়া সে চিত্রকেব দেহ কাটিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিত, আবার জঙ্গল হইতে লতাপাতা আনিয়া সম্বন্ধে বাধিয়া সেই ক্ষত আধোগ্য করিত। একদিন হঠাৎ পাগলটা কোথায় চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না।

অতঃপর কিছুদিনের ঘটনা চিত্রকের মনে নাই, কি করিয়া কোথায়

কাহার আশ্রয়ে কৈশোরের সীমান্তে উপনীত হইল তাহা তাহার স্মৃতি হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

বৌবনের প্রাবল্যে সে এক খাবাবর বণিক সম্প্রদায়ের সঞ্চিত ঘুবিয়া বেড়াইত, তাহাদের সংসর্গে কিছু কিছু লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল। সার্থবাহ বণিকেরা উষ্ট্র-পুষ্ঠে পণ্য লইয়া দেশ দেশান্তরে বিচরণ কবিয়া বেড়াইত, এক নগর হইতে অন্য নগরে যাইত। চিত্রক তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া বহু সমুদ্র নগর দেখিয়াছিল। পুষ্কমপুর মথুরা বাবাগসী পাটলিপুত্র তাম্রলিপ্ত উজ্জয়িনী কাকী—উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের বিচিত্র শোভাশালিনী নানা নগরীর সঞ্চিত চিত্রকের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটাইয়াছিল।

বণিক সম্প্রদায় ধর্মে জৈন ছিল, তাহারা আমিয় আশ্রয় কবিত না। অথচ মৎস্য মাংসের প্রতি চিত্রকের একটা প্রকৃষ্টিগত আকর্ষণ ছিল, সে সুর্যোগ পাইলেই লুকাইয়া পশু মাংস আশ্রয় কবিত। এবদিন সে ধরা পড়িয়া গেল।

বণিক সম্প্রদায় তাহাকে বিদায় কবিয়া দিল। চিত্রক দেশ নাই, আশ্রয় নাই—জগতে সে সম্পূর্ণ একাকী। এই সময় হইতে তাহার যোগ্যজীবনের আরম্ভ। তাহার দেহ স্বভাবতই বলিষ্ঠ, সে সহজে অশ্বচালনা করিতে শিখিল। জগতে যাত্রার কেহ নাই সে আশ্রয় নাই হইতে দেখে, চিত্রক বুদ্ধি ও বাহুবল সম্বন্ধে কবিসা জীবনযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া গড়িল।

আযাবতে তখন মর্ষত্রয় বিগ্রহ চলিতেছে। চিত্রক যখন বেঙ্গলে পাইল যুদ্ধ করিন, কোনও রাষ্ট্রের প্রতি তাহার মমত্ব নাই, বেঙ্গলে অর্থলাভের সম্ভাবনা দেখিল সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। এক পক্ষের পরাজয়ে দুঃখ খামিষা গেলে আযাব নতন যুদ্ধের অয়েষণে ঘুবিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এইভাবে তাহার জীবনের শেষ দশবর্ষ কাটিয়াছে। সৌভাগ্যে দেশে একটা অন্তঃকলহজাত যুদ্ধ বন্ধ মিটিয়া গেলে সে আযাব ভাগ্য অয়েষণে

বাঁহি হইয়াছিল। সৌবীর বুদ্ধে সে বিশেষ লাভবান হইতে পাবে নাই, উপবস্তু তাহাব অশ্বট মবিয়াছিল। সেখান হইতে লক্ষ্যহীনভাবে ঘূৰিতে ঘূৰিতে সে গান্ধাব অঞ্চলে সমব-সন্তাবনাব জনশ্রুতি শুনিয়া সেই পথে যাত্রা কবিয়াছিল। গান্ধাবের পথ কিন্তু সবল নয়, গিবি-সঙ্কট-কুটিল অজ্ঞাত দেশের পাকচক্রে পথ হাবাইয়া অবশেষে নিঃস্ব অবস্থায় সে বিটক্ক রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তাবপব হুগোপার জনসৈন্য হইতে আজিকার এই ঘটনাবল দিবসটি বিসর্পিল গতিতে মগ্নসব হইয়া শেষে এই অন্ধকাব কুটু কঙ্ক গবিসমাপ্তি লাভ কবিয়াছে।

মুদিও চক্ষু চিত্রক নিঃস্ব গীবন-কথা চিত্রা কবিতেছিল, চিত্তাব স্বল্প মাঝে মাঝে চির হইয়া যাইতেছিল, আবার যুক্ত হইয়া আপন পথে চলিতেছিল। ক্রান্ত দেও বতই নিদ্রাব অতলে ডুবিয়া বাহতে চাহিতেছিল, আজিকাব বস্তু ঘটনাবিদ্ধ মন ততহ সচেতন থাকিবাব চেষ্টা কবিতেছিল।

নিদ্রা ও জ্ঞাববণের মধ্যে এই উপ দ্বন্দ চলিতেছে, এমন সময় চিত্রকের চেতনা সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া উঠিল। তাহাব মনে হইল কে বেন অতি লঘু বাস্পশে তাহাব মুখে হাত বুলাইয়া দিল। নিশ্চিহ্ন অন্ধকারে সে কাগবেও দেখিতে পাবনা, প্রথমে মনে হইল ষযতো চর্মটিকার পাখাব স্পর্শ, হঠাৎ স্ৰীভেত্ত অন্ধকাবে নিঃশব্দে উডিষা বেডায়, স্পর্শেজ্জিবের দাবা বাধাবন্ধ অল্পভব কবিয়া গতি পবিবস্তন কবিত্তে পারে। ষযতো চমচটিকাই হইবে।

কিন্তু যদি চমচটিকা না হয়? যদি জীবন্ত কোনও প্রাণীই না হয়? চিত্রকের মেধাশ্রিৰ ভিতর দিয়া একটা শিহরণ বহিয়া গেল। সে অন্ধকাবে চক্ষু বিক্কাবিত কবিয়া সংক্ৰভাবে বসিয়া বহিল। আবার তাহাব মুখের উপর লঘু করাঙ্গুলির স্পর্শ হইল, বেন কেহ অঙ্গুলির দ্বারা তাহার মুখাবয়ব অল্পধাবন কবিবাব চেষ্টা কবিত্তেছে; তাহার গণ্ডে ভীক্ষু নখের আঁচড় লাগিল। চিত্রক প্রস্তুত ছিল, সে ক্ষিপ্ত হস্ত সঞ্চালনে

অদৃশ্য স্পর্শকারীকে ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই ধরিতে পারিল না। যে স্পর্শ করিয়াছিল সে সরিয়া গিয়াছে। চিত্রক তখন উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—‘কে? কে তুমি?’

কয়েক মুহূর্ত পরে তাহার সম্মুখের অন্ধকারে গভীর নিশ্বাস পতনের শব্দ হইল। চিত্রকের সর্বাঙ্গের রোম কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে কম্পিতস্বরে বলিল—‘কে তুমি? যদি মানুষ হও উত্তর দাও।’ কিছুক্ষণ নীরব। তারপর অদূরে অস্ফুট শব্দ হইতে লাগিল। চিত্রক উৎকর্ষ হইয়া গুলিল। মানুষের কণ্ঠস্বরই বটে, কিন্তু শব্দগুলির কোনও অর্থ হয় না। যেন স্বপ্নের ঘোরে কেহ অস্পষ্ট অর্থহীন আকুতি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মনুষ্য বুঝিয়া চিত্রক আবার স্বপ্ন হইল। সে বলিল—‘শব্দ শুনিয়া মনে হইতেছে তুমি মানুষ। স্পষ্ট করিয়া বল, কে তুমি।’

দীর্ঘকাল আর কোনও শব্দ নাই; চিত্রকের মনে হইল, সে বুঝি কল্পনায় শব্দ শুনিয়াছিল, সমস্তই এই কুহকময় অন্ধকারের ছলনা। তাহার স্বায়ুপেণী আবার শব্দ হইতে লাগিল। এ কিরূপ মায়া? অলৌকিক মায়া?

‘আমি বন্দিনী……বন্দিনী……’

না, মানুষের কণ্ঠস্বর—ছলনা নয়। কথাগুলি অতি দ্বিধাভরে কণ্ঠিত হইলেও স্পষ্ট। বক্তা যেন আরও নিকটে আসিয়াছে।

চিত্রক বলিল—‘বন্দিনী? তুমি নারী?’

‘হাঁ।’

‘নিশ্চিত হইলাম। ভাবিয়াছিলাম তুমি প্রেতযোনি।’

‘তুমি কে?’

চিত্রক হাসিল—‘আমিও বন্দী। তুমি কতদিন বন্দী আছ?’

‘কতদিন—জানিনা। এখানে দিন রাত্রি নাই, মাস বর্ষ নাই—’

কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গেল।



চিত্রক বলিল—‘তুমি আমার কাছে এস। ভয় নাই, আমি তোমার অনিষ্ট করিব না।’

কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন হইল—‘তুমি কি হুণ?’

‘না, আমি আৰ্য।’

তখন অদৃশ্য রমণী কাছে আসিয়া চিত্রকের জাহুর উপর হাত রাখিল, চিত্রক তাহাব হস্ত স্পর্শ করিয়া দেখিল, কঙ্কালীসার হস্ত, শীর্ণ অঙ্গুলির প্রান্তে দীর্ঘ নখ। তাহার জাহুর উপর হস্তটি খরখর করিয়া কাঁপিতেছে। চিত্রক বলিল—‘উপবিষ্ট হও। আমাকে ভয় করিও না, আমিও তোমারই মত অসহায়। মনে হয় দীর্ঘকাল বন্দিনী আছ। তুমি অন্ধকারে দেখিতে পাও?’

‘অল্প।’

‘তোমার বয়স কত?’

এতক্ষণে রমণী যেন অনেকটা সাচস পাইয়াছে, সে সোপানের উপর উপবেশন করিল। যখন কথা কহিল তখন তাহার কথা আরও স্পষ্ট ও সুসংলগ্ন শুনাইল। যেন সে দীর্ঘকাল কথা না বলিয়া কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, আবার ক্রমশঃ সুসঙ্গত বাকুশক্তি ফিরিয়া পাইতেছে।

রমণী বলিল—‘আমাব বয়স কত জানি না। যখন বন্দিনী হই তখন কুড়ি বছর বয়স ছিল।’

‘কে তোমাকে বন্দিনী করিয়াছিল?’

‘হুণ।’

‘হুণ? কোন্ হুণ?’

রমণী খামিয়া খামিয়া বলিতে লাগিল—‘একটা কদাকার খর্বকায় হুণ। রাজপুত্রী হুণেরা আক্রমণ করিয়াছিল। আমি ছিলাম রাজপুত্রের ধাত্রী……আমি রাজপুত্রকে স্তন্যপান করাইতেছিলাম এমন সময় হুণেরা রাজ-অবরোধে প্রবেশ করিল……তাহারা রাজপুত্রকে আমার কোল

হইতে কাড়িয়া লইয়া তলোয়ারের উপর লোফানুকি করিতে লাগিল.....  
একটা কদা'কার হুণ আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিল.....'

‘সর্বনাশ! এ যে পঁচিশ বছর আগের কথা! তুমি পঁচিশ বছর বন্দিনী আছ?’

‘পঁচিশ বছর?.....তা জানি না।.....কদা'কার হুণটা আমাকে টানিতে টানিতে তোরশর স্তম্ভ গৃহে লইয়া আসিল.....নির্জন স্তম্ভগৃহে আমি তাহার হাত ছাড়াইবার অনেক চেষ্টা কবিতাম, কিন্তু.....স্তম্ভগৃহের দেয়ালে একটা গুপ্তদ্বার ছিল, কেমন করিয়া খুলিয়া গিয়াছিল.....হুণটা আমাকে এই অন্ধকারে ঠেলিয়া দিয়া গুপ্তদ্বার বন্ধ কবিতা দিল—’

‘তারপর?’

‘তারপর আর জানি না.....সেই অবধি এই রক্তব মধ্যে আছি। রক্ত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু বাহির হইবার পথ নাই.....সেই হুণটা মাঝে মাঝে খাণ্ড ফেলিয়া দিয়া যায়, তাহাই খাই.....হুণটা আমাকে অন্ধকারে দেখিতে পায় না তাই ধবিবার চেষ্টা কবে না—’

চিত্রক পূর্বে মোড়ের কাহিনীর কিছু অংশ শুনিয়াছিল, এখন রমণীর বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে পঁচিশ বৎসব পূর্বে হুণ উৎপাতের চিত্র যেন অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল। রমণীর জন্ম তাহার অন্তরে সমবেদনার উদয় হইল, সে অন্ধকারে তাহার হস্তে হস্ত রাখিয়া বলিল—‘হতভাগিনী! তোমার স্বজন কি কেহ ছিল?’

রমণী স্তব্ধ নিশ্বাস ফেলিল।

‘স্বামী ছিল—একটি কন্যা ছিল—’

‘হয়তো তাহার বাচিয়া আছে। কাল প্রাতে আমি বাহির হইব। যদি প্রাণে বাঁচি তোমার উদ্ধারের চেষ্টা করিব। তোমার নাম কি?’

‘পৃথা।’

‘জাল, পৃথা, আমি এবার একটু নিজা দিব, রাজি বোধ হয় প্রভাত

হইতে চলিল। কাল প্রাতে সম্ভবত শুলেই চড়িতে হইবে; কিন্তু একটা উপায় চিন্তা করিয়াছি, হয়তো রক্ষা পাইতেও পারি।’

‘তুমি কে, তাহা তো বলিলে না।’

‘আমি চোর। তুমি কি রাত্রে ঘুমাও না?’

‘কখন্ ঘুমাই কখন্ জাগিয়া থাকি বুঝিতে পারি না। তুমি ঘুমাও, আমি জাগিয়া থাকিব।’

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### মুক্তি

চোর ধবার উদ্ভেজনার স্নগোপার রাত্রে ঘুম হয় নাই। ভোর হইতে না হইতে সে বাজপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজকুমারী রট্টা তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নাই; শয়ন মন্দিরের দ্বারে মবনী প্রতীহারীর পাহারা। স্নগোপা কিন্তু মবনীকে নিষেধ মানিল না, শয্যাপাশে উপস্থিত হইয়া ডাকিল—‘সপি ওঠ ওঠ, অশ্বেচোর ধরা পড়িয়াছে।’

রাজকুমারীর চক্ষু ছুটি খুলিয়া গেল; মনে ছটটি বজ্র একসঙ্গে নভা কবিতা উঠিল। তিনি বলিলেন—‘দ্ব হ’ প্রেতিনী! কী স্নন্দর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তুই ভাসিয়া দিলি।’

স্নগোপা পানক্তের পাশে বসিয়া বলিল—‘ওমা, কি স্বপ্ন দেখিলে? ভোরের স্বপ্ন সত্য হয়। বল বল শুন।’

রট্টা বলিলেন—‘কমল সরোবরে এক হস্তী ক্রীড়া করিতেছিল; আমি তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে হস্তী আমাকে দেখিতে পাইল; তখন সে সরোবরের মধ্যস্থল হইতে একটি বক্রকমল শুণ্ডে তুলিয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল। আমি অঞ্জলি বাঁধিয়া হাত বাড়াইলাম;

হস্তী তীরেব নিকটে আসিয়া কমলটি আমার হাতে দিতে ঘাইবে, এমন সময় তুই ঘুম ভাঙ্গিয়া দিলি।’

সুগোপা বলিল—‘ভাল স্বপ্ন। গ্রন্থাচার্য ঠাকুরেব নিকট উঠাব অর্থ জানিয়া লঠতে হইবে। এখন ওঠ, চোর দেখিবে না?’

আলস্য ত্যাগের ভঙ্গিমায দেহটি লীলাষিত কবিষা বট্টা উঠিলেন। চোর দেখিবার কোঁকুল নাচ এমন মাগুষ্য বিবণ, তা তিনি বাজকলাই হোন আব মালাকব-বধুই হোন। তবু বট্টা পবিহাসচ্ছলে বলিলেন—‘তোব চোব তুত দেখ না, আমি দেখিষা কি কবিব?’

সুগোপা বলিল—‘ধন্ত! চোব তোমাব খোড়া চুবি কবিল, তব সে আমার চোর হঠদা কিরূপে?’

বট্টা বলিলেন ‘তুত চোবের চিন্তায় রাগ্রে ঘুমাইত পাবিস নাচ, সাত সকানে আসিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গাইলি। নিশ্চয় তোব চোব।’

সহস্র যুগে রট্টা স্নানাগাবেব অভিমুখে চণিলেন। সুগোপাও ১৫ পবিহাস কাবতে করিতে, গত বাহিব চোব ধবাব কাণিনা শুনাইহে শুনাইতে তাঁহাব সন্ধিনী হটল।

স্বর্ষোদয়েব দণ্ড দুই পরে বাজকীষ সভাগৃহে কিছু জনসমাগম হইবাছিল। বাজাব অল্পপস্থিতিতে বাজসভার অবিশেশন হয় না, মন্বগ-ষ স্ব গৃহে থাকিষা বাজকাষ পবিচালনা কবেন, তাই বাজসভা শূন্যট থাকে। কিন্তু আজ কোট্টপাল মহাশয প্রাতেই আসিষা উপস্থিত হইষাছেন, ঠাঁহার সঙ্গে কবেকটি সশস্ত্র গুরুচব। তদ্যতীত পুরীব কষেকজন দোবাবিক ও প্রতীগাব আছে। অবরোধেব কল্পকীও চোবেব ধবব পারষা আসিষা জুটিষাছে। মন্ত্রীবা বোধ কবি চোব ধত হওবাব সংবাদ এখনও পান নাই, তাই আসিষা পৌছিতে পাবেন নাই।

রাজকুমারী বট্টা সভায় আসিলেন, সঙ্গে সখী সুগোপা। বট্টাব পরিধানে হরিভালবর্ণ ক্ষৌমবস্ত্র, বক্ষে দুর্বাহরিং কঙ্কলী, কেশ কুণ্ডলী

মধ্যে খেত কুরুবকের নব-মুকুল চন্দ্রকলার ছায় জাগিয়া আছে—যেন সাক্ষাৎ বসন্তের জয়শ্রী। রট্টা আসিয়া সিংহাসনের পাদপীঠে বসিলেন। স্নোগোপা তাঁর পায়ের কাছে বসিল।

অভিবাদন শেষ হইলে রট্টা চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন—‘চোর কোথায়?’

কোট্টপালের ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহার হৃদয় অল্পচর বাহিরে গেল; অল্পকাল পরে বদ্ধহস্ত চোরকে লইয়া নিঃশব্দে আসিল। তাহাদের পিছনে গুহু বাহির তোরণ-প্রতিহার ও বামিক-বন্দিত্বও আসিল।

চোরকে সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড় করানো হইল।

রট্টা তিরদৃষ্টিতে চোরকে নিরীক্ষণ করিলেন। স্নোগোপা তাঁহার কানে কানে প্রশ্ন করিল—‘চিনিতে পারিয়াছ?’

রট্টা বলিলেন—‘হা, চিনিয়াছি। বলা জলসত্ত্বে এই ব্যক্তিই ‘আমাব অশ্ব চুরি কবিয়া পনাইয়াছি। অশ্বচোর, তোমার কিছু বলিবার আছে?’

চিৎরক এতক্ষণ সংযতভাবে দাঁড়াইয়া রাজকন্ডার পানে চাহিয়া ছিল। রাজ্যে অন্ধরূপ বাসেব কলে ত’হার বস্তু দ কিছু বিশেষ ও মলিন হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহার হাবভাব দেখিয়া তা’কে তস্কর বলিয়া মনে হয় না। এবং কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অকারণে অপদস্থ হইলে যেকপ ভৎসনাপূর্ণ গাভ্রীর্ষের ভাব ধারণ করেন, তা’হার মুখভাব সেইরূপ। সে একবার শব্দ অথচ অপ্রসন্নমত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—‘এ আমি কোথায় আনীত হইয়াছি জানিতে পারি কি?’

কোট্টপাল চোরের ভাবভঙ্গী দেখিয়া উষ হইয়া উঠিলেন, কঠোরকণ্ঠে বলিলেন—‘রাজসভায় আনীত হইয়াছ। তুমি রাজকন্ডার অশ্ব চুরি করিয়াছিলে সেজন্ত তোমাব দণ্ড হইবে। এখন কুমারীর কথার উত্তর দাও; তোমার কিছু বলিবার আছে?’

চিত্রক তেমনই ধীরস্বরে বলিল—‘আছে। ইহা কি দণ্ডাধিকরণ ?  
বিচার-গৃহ ?’

কোট্টপাল বলিলেন—‘না। তোমার বিচার যথাসময় হইবে। এখন  
প্রশ্নের উত্তর দাও—কী জন্ত অশ্ব চুরি করিয়াছিলে ?’

চিত্রক কিছুক্ষণ স্থিবদৃষ্টিতে রট্টার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর  
গম্ভীর স্বরে বলিল—‘আমি অশ্ব চুরি কবি নাই, বাজকার্বেষণ গ্রহণ  
করিয়াছিলাম মাত্র।’

সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। চোর বদে কি ? কোট্টপাল  
মহাশয়ের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; চোরের এমন ধৃষ্টতা ? বট্টাব  
চোখেও সবিস্ময় রোষের নিদ্রাৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল; তিনি ঈষৎ  
তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন—‘তুমি বিদেশী মনে হইতেছে। তোমার পবিচয় কি ?’

চিত্রক রাজকুমারীর বোব দৃষ্টির সম্মুখে কিছুমাত্র অবনমিত না হইয়া  
অকম্পিতস্বরে বলিল—‘আমি মগধের দূত, পবন ভট্টাবক পনমেষধ  
মন্ত্রসারাজ স্বক্ৰান্ত্রের সন্দেশবহ।’

সভাস্থ কাহারও মুখে আব কথা রহিল না; সকলে ফ্যান ফ্যান  
করিয়া ইতি-উতি চাহিতে লাগিল। মগধের দূত ! স্বন্দগুপ্তের বার্তাবাহক !  
স্বন্দগুপ্তের নামে স্বকম্প উপস্থিত হইত না এমন মানুষ্য তখন আয়াবর্তে  
অল্পই ছিল। সেই স্বন্দগুপ্তের দূতকে চোর বলিয়া বাঁধিয়া বাঁধা  
হইয়াছে।

কোট্টপাল মহাশয় হতভয়। রাজকুমারী বট্টার চোখে চকিত জিজ্ঞাসা।  
স্বগোপার মুখ শুষ্ক। সকলে চিত্রাপিতবৎ নিশ্চয়।

এই চিত্রাপিত অবস্থা কতক্ষণ চলিত বলা যায় না; কিন্তু ভাগ্যক্রমে  
এই সময় রাজ্যের মহাসচিব চতুরানন ভট্ট দেখা দিলেন। চতুবানন বর্ণে  
ব্রাহ্মণ; চতুর স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি। তৎকালে ভাবতভূমিতে বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে  
বহু জাতীয় এবং বহু ধর্মীয় রাজা রাজত্ব করিতেন; উত্তরে শক হুণ ছিল,

দক্ষিণে দ্রাবিড় গুর্জর ছিল। কিন্তু মন্দির করার বেলায় দেখা যাইত একটি ক্ষীণকায় উপবীতধারী ব্রাহ্মণ মণ্ডিব আসনটি অধিকার করিয়া আছেন।

সচিব চতুবানন সভায় প্রবেশ করিয়া কঙ্করী মহাশয়কে সংক্ষেপে তঁর চারি প্রশ্ন কবিয়া ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন। তারপর সভার মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রথমে হস্ত তুলিয়া বাঙ্কুমাঝীকে আশীর্বাদপূর্বক তিনি বন্দীর দিকে ফিরলেন। চতুবানন ভট্টের চোখেব দৃষ্টি ক্ষিপ্ত এবং মঙ্গণ, কোথাও বাধা পাষ না। চিবকের আপাদমস্তক নিমেষ মধ্যে দেখিয়া গইয়া তিনি আদেশ দিলেন, ‘হস্তবন্ধন গুলিয়া দাও।’

এতক্ষণ কে কি কবিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না, এখন যেন ঈশ ছাড়িয়া বাঁচিল। কোট্টপাল মহাশয় স্বয়ং চিত্রকেব বন্ধন গুলিয়া দিলেন।

চতুবানন ভট্ট তখন শ্বিতমুখে স্তম্ভিত স্ববে চিত্রকেকে সোধোধন করিলেন—  
‘আপনি মগধেব বাঙ্কদূত?’

চিত্রক এই মঙ্গণ-চক্ষু মুচবাকু প্রোচকে দেখিয়া মনে মনে সতর্ক হইয়াছিল, বলিল—‘হাঁ। আপনি?’

চতুবানন বলিলেন—‘আমি এ বাঙোব সচিব। মহাশয়ের নাম? মহাশয়ের অভিজ্ঞান?’

মুদ্রাক্রিত অক্ষুবী তর্জনী হইতে উমানন্দ সঙ্গীত করিতে চিত্রক তড়িতং চিন্তা কবিল, বাঙ্কলিপিতে : আছে কি? বতদুব স্ববণ হয়—নাই। সে বলিল—  
‘হাঁ।’

চতুবানন একটু হ্র তুলিলেন—  
‘সাধাবণত ব্রাহ্মণ নিয়োগই বিধি।

চিত্রক বলিল—‘হাঁ। এই দেখুন?’

অভিজ্ঞান দেখিয়া চতুরাননের চক্ষে সন্ত্রম ফুটিয়া উঠিল। তিনি হস্তদ্বয় পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন—‘দূত মহাশয়, আপনি স্বাগত। দেখিতেছি উভয় পক্ষেই একটু ভুল হইয়া গিয়াছে। আপনি না বলিয়া অশ্বটি গ্রহণ না করিলেই পারিতেন—রাজকুমারীর অশ্ব—’

চিত্রক শ্মিত হাস্ত করিয়া রট্টার পানে আয়ত নয়ন ফিরাইল, বলিল—  
‘রাজকুমারীর অশ্ব তাঁহা আমি অচ্যুত করিতে পারি নাই।’

এই বাক্যে মধ্য কতখানি প্রগল্ভতা এবং কতখানি আত্মসমর্থন ছিল তাগ ঠিক ধরা গেল না, কিন্তু রট্টা চিত্রকেব চক্ষু হইতে চক্ষু সরাস্রিয়া লইয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই দূতের বাক্যটিমা আছে বটে, অল্প কথা বলিয়া অনেক কথাই ইঙ্গিত করিতে পারে!

চতুরানন বলিলেন—‘অবশ্য অবশ্য। তারপর গত বাত্রেও যিহ আপনি নিজ পরিচয় দিতেন—’

চিত্রক বলিল—‘কাতার কাছে পরিচয় দিব? যামিক রক্ষীর কাছে? তোারণ প্রতীহারের কাছে?’

চতুরানন চিত্রকের মুখের উপর পিচ্ছিল দৃষ্টি বুলাইয়া একটি নিশ্বাস ফেলিলেন—‘বাক, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে—নিবাণ দীপে কিম্ব তৈলদানম্। এখন আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। কিম্ব তৎপূর্বে, আপনি যে রাজবার্তার বাহক তাহা কোথায়?’

চিত্রক বলিল—‘সম্ভবত আমার থলিতে আছে, যদি না আপনার বায়মিক-রক্ষীরা ইতিপূর্বে উহা আত্মসাৎ করিয়া থাকে—’

বায়মিক-রক্ষীরা সভার পশ্চাৎভাগে উপস্থিত ছিল, তাহারা সবেগে সমস্ত আন্দোলন করিয়া একপ অবৈধ তন্ত্রবৃত্তির অভিযোগ অস্বীকার করিল। চিত্রক তখন থলি খুলিয়া দেখিল, লিপি আছে। সে সযত্নে লিপি-কুণ্ডলী বাহির করিয়া একটু ইতস্তত করিল—‘রাজলিপি কিন্তু রাজার হস্তে দেওয়াই বিধি।’



মন্ত্রী বলিলেন—‘সে কথা যথার্থ। কিন্তু মহারাজ এখন বাজধানাতে উপস্থিত নাই—রাজকন্যাই তাঁহার প্রতিভা। আপনি দেবদুহিতার হস্তে পত্র দিতে পাবেন।’

চিত্রক তখন দুই পদ অগ্রসর হইয়া যুদ্ধহস্তে লিপি বাজকুমারীর হস্তে অর্পণ করিল।

— পত্র লেখা বট্টা স্নানকাল দ্বিধাভাবে বহিলেন, তাবপব ঈষৎ হানিয়া লিপি-কুণ্ডলী মন্ত্রীর হাতে দিলেন। তাহার অর্থ—বাজনারী হইব বিধিতো পালিত হইয়াছে, এখন বাণ্য কমে কক্ষক।

‘লিপি হস্তে গ্রহণা মন্ত্রীর চতুর্ভুজ কিস্তি চমকিয়া উঠিলেন, ‘ওঁক। লিপির জুহুদা ভয় দোষতো’। তিনি তাঁক্ষ সন্দেহে চিত্রকেব গানে চাটিলেন।

চিত্রক এখন দোতুকেব কণ্ঠে বলিল—‘কাল রায়ে আপনাব বামিক মন্ত্রী আমাব সহিত কিংকিং মল্লযুদ্ধ কবিয়াছিল, হযতো দেহ সময তুমুল ভাতিয়া থাকবে।’

বথাটা অস্বস্তা নয়, কিন্তু মন্ত্রীর সশয দুই হইল না। তিনি বামিক পদাদেব গানে চাটিলেন, বামিক মন্ত্রী আমাব মন্ত্রক অননত কবিয়া স্বীকার বাবল, মল্লযুদ্ধ একটা হইয়াছিল বটে।

চিত্রক মুখ টিপিয়া হানিল, বলিল—‘আমাব দোষ হইয়াছে। এবাব অচমাত কবন আমি বিদায় হই।’

চতুর্ভুজ বলিলেন—‘স কি কথা। আপনি মগধের বাওদুত, এতদূর আনিয়াছেন, এখন ফিরিয়া যাইবেন? ভাল বথা, আপনার সঙ্গী-সানী কি কেহই নাই?’

চিত্রক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—‘যখন যাত্রা কবিয়াছিলাম তখন তিনজন সঙ্গী ছিল, পথে নানা দুর্ঘটনায় তাহাদের হাবাইয়াছি—অশ্বও গিয়াছে। এদিকে পথ বড় জটিল ও বিপদসঙ্কুল।—বাক, এবাব অজ্ঞা দিন।’ বলিয়া বট্টাব দিকে চক্ষু ফিরাইল।

রট্টা কিছু বলিবার পূর্বেই মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন—‘কিন্তু এখনি আপনার দৌত্য শেষ হয় নাই, আপনি বাইবেন কি প্রকাবে? পত্রের উত্তর—’

চিত্রক দৃঢ়স্বরে বলিল—‘পত্রের উত্তর সম্বন্ধে আমার কোনও কর্তব্য নাই। আমি শ্রীমম্বহারাজের পত্র আপনাদের অর্পণ করিয়াছি, আমার দায়িত্ব শেষ হইয়াছে।’ বলিয়া অমৃতের অপেক্ষায় আবার বট্টার পানে চাহিল।

এবার রট্টা কথা বলিলেন, ধীর প্রশান্ত স্বরে কহিলেন—‘দূত মহাশয়, বিটঙ্করাজ্যে আসিয়া আপনার কিছু নিগ্রহ ভোগ হইয়াছে। ‘নিগ্রহ অনিচ্ছাকৃত স্কুলেও আপনি ক্রেশ পাইয়াছেন। কিন্তু অশিখি-নিগ্রহ বিটঙ্ক দেশের স্বভাব নয়। আপনি কিছুদিন বাজ-আতিথ্য স্বীকার করিলে আমরা তৃপ্ত হইব।’

চিত্রক এতক্ষণ পলায়নের একটা ছিদ্র খুঁজিতেছিল। ‘বিটঙ্করাজ্য তাহাব পক্ষে নিরাপদ নয়। সে বুদ্ধিয়াছিল, কূটবুদ্ধি মন্ত্রী তাহার দৌত্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নাই। উপরন্তু শশিশেখর যে-কোনও মুহূর্তে আসিয়া হাজির হইতে পারে। এক্ষণ অবস্থায় যত শীঘ্র এ রাজ্য ত্যাগ করা যায় ততই মঙ্গল। এতক্ষণ চিত্রক সেই চেষ্টাই করিতেছিল। কিন্তু এখন রাজকুমারী বট্টার কথা শুনিয়া সহসা তাহার মনের পরিবর্তন হইল। কুমারী রট্টাব দিক-আলোকেরা রূপেব ছটায়, তাঁহাব প্রশান্ত গম্ভীর বাচন-ভঙ্গিমায় এমন কিছু ছিল যে চিত্রকের মন হইতে পলায়ন-স্পৃহা তিরোহিত হইয়া পৌরুষপূর্ণ হঠকারিতা জাগিয়া উঠিল। সে ভাবিল, বিপদের মুখে পলাইব কেন? দেখাই যাক না, চপলা ভাগ্যদূতী কোন পথে লইয়া যায়। জীবনের সকল পথেব শেষেই তো মৃত্যু, তবে ভীকর মতো পলাইব কেন?’

সে যুক্তকরে শির নমিত করিয়া বলিল—‘দেবদুহিতার ধেরূপ আদেশ।’

রট্টাব মুখেব প্রসন্নতা আবও পরিস্ফুট হইল, তিনি মন্ত্রীকে সখোখন কবিয়া বলিলেন—‘সার্থ চতুর ভট্ট, দূত মহাশয়ের স্থান ব্যবস্থা করুন।’

চতুব ভট্ট এবার একটু বিপন্ন হইলেন। গত পঁচিশ বৎসবে বিটঙ্ক-বাজ্যে পববাহুর্ষের কোনও দত্ত আসে নাই, তাই বাজ্যে দূতাবাসের কোনও পাকা ব্যবস্থা নাই। কদাচিৎ মিত্রবাজ্য হইতে বাজ্যকীয় অতিথি আসিলে বাজ্যপুত্রী মধ্য কোনও এক ভবনে তাঁতাব স্থান হইয়াছে। কিন্তু এই দত্তটিকে কোথায় রাখা যায়। মগধের দূতকে ভালভাবেই রাখিতে হয়, নগুবের পাঠশালায় স্থান নিদেশ করা চলে না। কঙ্কগুপ্তের পাত্রের কী আছে তাহা এখনও দেখা হয় নাহ, এতদিন পবে মগধ কি বিটঙ্কবাজ্যের উপর একবাট অধিকার দাবী করিতে চায় নাকি? সে যাতোক পরে দেখা যাইবে, এখন দূতটাকে কোথায় রাখা যায়? দূতের দূতীষালিতে কোথায় যেন একটা গলদ বহিষ্যাহে—বিদায় লহবার জন্য এত ব্যগ্র কেন? উতাকে সহজে দষ্টবহির্ভূত করা হইবে না—

কঙ্ক অর্ধ মূদিত কবিয়া চতুর ভট্ট চিন্তা কবিলেন, তারপর নিম্নস্ববে কঙ্ককীর সহিত আলাপ কবিলেন। তাঁতাব কঙ্কগলেব বক্রতা অপনীত হইল। তিনি বলিলেন—‘মগধের রাজদূতের তত্ত্ব যথোচিত সম্মানের স্থান নির্দিষ্ট হইবে, বাজ্যপুত্রী মধ্যই তিনি অবস্থান কবিলেন। স্ববিধা হইয়াছে, মগ্যবাজ্যেব সম্মিতা হর্ষ মগ্যবাজ্যেব সঙ্গে চষ্টনজুর্গে গিয়াছে, তর্ষব স্থান শূণ্য আছে। দূত মহোদয় সহ স্থানেই থাকিবেন।’

এও ব্যবস্থায় সকলেহ সন্তুষ্ট হইলেন। বাজ্যপুত্রীতে স্থান দিয়া মগধ-দূতকে সম্মান দেখানো হইল, অপিত সম্মিতার অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পথ্যে স্থান দিয়া অধিক সম্মান দেখানো হইল না। চতুব ভট্ট স্তব্ধ হইলেন, দত্ত বাজ্যপুত্রী প্রাকার মধ্যে বহিল, হচ্ছ কবিলেও পলাহতে পারিলে না।

কঙ্ককীর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন—‘লক্ষণ, তোমাব উপব

দুঃখবরের সেবার ভার রহিল। এখন তাঁহাকে বিশ্রাম মন্দিরে লইয়া যাও।’ বলিয়া অর্থপূর্ণ ভাবে কঞ্চুকীর পানে চাহিলেন।

লক্ষণ কঞ্চুকী চতুর ভট্টের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়াছিল। সে চিত্রকের নিকটে আসিয়া বহু সমাদর সহকারে তাহাকে বিশ্রাম মন্দিরে আহ্বান করিল।

চিত্রক রাজকুমারীকে বৃত্তকরে অভিবাদন করিয়া কঞ্চুকীর অল্পবর্তন করিতে উত্তত হইয়াছিল, সহসা একটা কথা স্মরণ হওয়ায় সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—‘দেবদুষ্টিতাকে একটি সংবাদ জানাইতে ইচ্ছা করি। গত রাত্রে আমি যে অক্ষকূপে বন্দী তিলাম সেখানে একটি স্ত্রীলোক বন্দিনী আছে।’

রট্টা নেত্র বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন—‘স্ত্রীলোক !’

‘হঁ। বন্দিনীর নাম পৃথা।’

সুগোপা রট্টার পদমূলে বসিয়া শুনিত্তেছিল, সে চমকিয়া উঠিল—  
—পৃথা !

চিত্রক বলিল—‘গতভাগিনী পঁচিশ বৎসর ঐ কারাকূপে বন্দিনী আছে। যখন প্রথম হুণ অভিযান হয় তখন পৃথা পূবতন রাজপুত্রের বাধা ছিল—এক হুণ যোদ্ধা তাহাকে বলাৎকার পূর্বক ঐ স্থানে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল—’

সুগোপা ছিন্নজ্যা ধ্বজর ছায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—  
‘আমার মা ! আমার মা—!’

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### বাজপুরীতে

বাজপুরীর প্রাকার-বেষ্টনীর মধ্যে অনেকগুলি প্রাসাদ আছে ; কোনটি সভাগৃহ, কোনটি কোষাগার, কোনটি মন্ত্রণালয় ; একথা পূর্বে বলা হইয়াছে । বাজকন্যা যে প্রাসাদে বাস করেন তাহা অবরোধ ; তাহার পশ্চিমে বাজার ভাঙ্গা পৃথক ভবন । উভয় প্রাসাদের মধ্যে অগ্নিদেব সংযোগ : উভয় প্রাসাদ ত্রিভূমক ।

বাজপ্রাসাদের নিম্নতলে এক পাশের কয়েকটি কক্ষ লইয়া সম্মিতা হার্ষব বাসস্থান । রাজ বৈভবের তুলনায় ইহা অপকৃষ্ট হইলেও সাধারণ মানুষ্যের পক্ষে প্রশংসনীয় চড়াই । কক্ষকী লক্ষণ চিত্রককে এইখানে আনিয়া অধিষ্ঠিত করিল ।

চিত্রক কৃষ্ণ মনে আসন পরিগ্রহ করিতে না করিতে কক্ষকীর ইন্দ্রিতে কয়েকটা অস্তবাক্যে সন্দেহক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া সমাদ্রে সবেগে তৈল মদন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল । ইহা বাজকীয় সমাদ্রের প্রথম প্রবন্ধ ।

অতঃপর চিত্রক শীতল জলে স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিল ; অঙ্গে চন্দন প্রলেপ দিয়া আল্লাবে বসিল । প্রচুব পিষ্টক পৌলিক মোদক পবনারের আয়োজন, তছপরি কক্ষকীর সর্বনয় নিবন্ধ । চিত্রক আকর্ষণ ভবিষ্য ভোজন করিল ।

তারপর শরতের মেঘশুভ্র শব্দ শ্রবণ । দুইজন নহাশিত আসিয়া অতি আরামদায়ক ভাবে হস্তপদ টিপিয়া দিতে লাগিল । এই আলস্রুত মুদ্ভিতক্ষে উপভোগ করিতে করিতে, পুরুষ ভাগ্যের বিচিত্র ভূজঙ্গ-গতির কথা চিন্তা করিতে করিতে চিত্রক ঘুমাইয়া পড়িল ।

ওদিকে সচিব চতুরানন ভট্ট মগধের লিপি পাঠ করিযাছিলেন। তাঁহার আশঙ্কা মিথ্যা হয় নাই, রাষ্ট্রনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন না করিয়া বতখানি রূঢ়তা প্রকাশ করা যাইতে পারে ততখানি রূঢ়তার সহিত লিপিতে বিটকরাজ্যের উপব নির্দেশ প্রেরিত হইয়াছে—বিটকরাজ অচিরাতঃ মগধের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া বক্রী রাজস্ব অর্পণ করুন, নচেৎ হুগহরিণকেশবী সম্রাট বন্দগুপ্ত স্বয়ং সসৈন্যে গান্ধারে অভিযুগে যাইতেছেন, ইত্যাদি।

পত্র পাঠ করিয়া চতুর ভট্ট দীর্ঘকাল গভীর চিন্তায় মগ্ন বহিলেন তারপব অত্র সচিবদের ডাকিয়া মন্ত্রণায় বসিলেন। শ্রোনপক্ষীর সহিত চটকের প্রতিস্পর্ধিতা সম্ভব নয়, চটকেব পক্ষে হিতকরও নয়। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে বাহুবলই সর্ব্ব নয়, কূটনীতিও আছে। বন্দগুপ্ত নূতন হুগ অভিযান প্রতিবোধ কবিবার জগ্ন গান্ধারে আসিতেছেন, ঘোর বৃদ্ধ বাধিবে, দীর্ঘকাল ধরিয়া বৃদ্ধ চণিবে, শেষ পর্যন্ত ফনাফল কিরূপ দাঁড়াইবে কিছুই বলা যায় না। সুতরাং অবিলম্বে মগধেব বগতা স্বীকার না করিয়া ছলছুতা দাণ যদি কালচরণ করা যায়, হয়তো অনেক সুফল ফলিতে পারে। একদিকে হুগ, অত্র দিকে বন্দগুপ্ত, এ অবস্থায় যথাসাধ্য নিবপেক্ষতা অবলম্বনই যুক্তি।

সচিবগণ একমত হইয়া মনস্থ কবিলেন, পত্রের উত্তব দানে যথাসম্ভব বিলম্ব করা হোক, দূতটাকে বলা যাক, মহারাজ কপোতকুটে যতদিন না কিরেন ততদিন পত্রের উত্তব দান সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে মহারাজ রোট্টকে সব কথা জানাইয়া বার্তা প্রেবণ করা আবশ্যক। তিনি এখন চট্টনভূর্গেই থাকুন, বাজধানীতে ফিরিবার কোনও তাড়া নাই। কিন্তু এত বড গুরুতর সংবাদ তাঁহার গোচর করা সর্বাগ্রে কর্তব্য।

এইরূপ মনোনীত হইলে পর স্বরিতগতি তুরঙ্গপৃষ্ঠে চট্টনভূর্গে বার্তাবহ প্রেরিত হইল।

মন্ত্রগৃহে যখন এই সকল রাজকার্য চলিতেছিল, কুমারী রট্টা তখন নিজ ভবনে ছিলেন। আজ নানা কারণে তাঁহার মন কিছু উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিল। প্রথমেই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগরণ; তারপর চোর ঘটিত ব্যাপারের অদ্ভুত পরিস্ফুটন। মগধের দূত...মগধ.....বিশ্ববিশ্রুত পাটলিপুত্র নগর..... দ্বিগ্বিজয়ী বীর স্কন্দগুপ্ত.....দূত নিজের কী নাম বলিয়াছিল? চিত্রক. বর্মা! চিত্রক... চিত্র ব্যাঘ্র... ব্যাঘ্রের সহিত কোথাও যেন সাদৃশ্য আছে... চোখের দৃষ্টি বড় নিভীক...

সর্বশেষে সুরগোপার মাতার উদ্ধাব। সুরগোপার মাতা প্রাকৃতন রাজপুত্রের ধাত্রী ছিল, কুমারী রট্টা তাহা জানিতেন। অভাগিনীর এই দুর্দশা হইয়াছিল? সকলের অজ্ঞাতে পঁচিশ বৎসর বন্দিনী ছিল! কেমন করিয়া বাঁচিয়া ছিল; কে তাহাকে আহার দিত? পৃথার ছুরদ্বয়ের কণা ভাবিয়া রট্টার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িল। উঃ, পঁচিশ বৎসর পূবে হুণেবা কি বর্বরতাই না করিয়াছিল। রট্টা হুণ-হুহিতা, তবু—

সুরগোপা মাতাকে উদ্ধার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে লইয়া গিয়াছিল। সুরগোপা বড় কান্না কাঁদিয়াছিল, স্মরণ করিয়া রট্টার চোখেও জল আসিল। তাহার ইচ্ছা হইল সুরগোপার গৃহে গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসেন। সুরগোপার গৃহে তিনি বতবার গিয়াছেন, এখন ইচ্ছা গিয়াছেন। কিন্তু আজ বাইতে তাঁহার সন্কোচ বোধ হইল। প্রিয়সখি সুরগোপা মৃতকল্পা মাতাকে পাইয়া তুমুল হৃদয়বেগের আঘাতে নিমজ্জিত হইয়াছে, এখন রট্টা তাহার কাছে ধাইলে সে বিলাপ হইবে, বিব্রত হইবে—

মধ্যাহ্ন অতীত হইবার পর রট্টা গ্রহাচার্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গ্রহাচার্য আসিলেন; স্বপ্ন-কথা শুনিয়া তিনি প্রশ্নগণনার আঁক কবিলেন, দিকনির্দেশ করিলেন, লগ্ন নির্ধারণ করিলেন। তারপর ফলাদেশ করিলেন—  
‘কল্যাণ, তোমার জীবনেব এক মহা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। কিন্তু শঙ্কিত

হইও না ; অস্ত্রে ফল শুভ হইবে। এক দিওনাগ-সদৃশ মহা-তেজস্বী পুরুষের সচিৎ তোমার পরিচয় ঘটবে ; এই পুরুষসিংহ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। তোমার বিবাহের কালও আসন্ন। শুভমস্ত্র ।’ গ্রহবিপ্রেসর ভাব গতিক দেখিয়া মনে হইল তিনি সব কথা খুলিয়া বলিলেন না, কিছু চাপিয়া গেলেন।

তিনি বিদায় হইলে রট্টা দাঁঘকাল করলয় কপোলে বসিয়া রহিলেন, শেষে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিলেন—নিয়তির বিধান বখন অখণ্ডনীয় তখন চিন্তা করিয়া লাভ কি ?

ক্রমে অপরাহ্ন হইল।

ওদিকে চিত্রক দীর্ঘ দিবানিদ্রার পর জাগিয়া উঠিয়াছে। শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ ; গত কয়েকদিনের নানা ক্লেশজনিত প্লানি আব নাহি। তাহাব মনেও শরীরের অল্পপাতে প্রফুল্ল হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু চিত্রক অন্তর্ভব করিল, তাহাব মন প্রফুল্ল না হইয়া বরং ক্রমশ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে।

রাজপুরীর আদর আপ্যানে সে অভ্যস্ত নয় ; উপবস্ত্র কক্ষকী গঙ্গণ যেন একটু অধিক পরিচর্যা করিতেছে। সে দণ্ডে দণ্ডে আসিয়া চিত্রকেব স্নখ স্বাচ্ছন্দ্যের সন্দেশ লইতেছে ; হুতুপরি তাহাব কয়েকটা অন্তর সর্বদাই চিত্রকেকে বেষ্টন করিয়া আছে। কেহ ব্যজন করিতেছে, কেহ লীতল তক্র বা ফলাস্বরস আনিয়া সম্মুখে ধরিতেছে, কেহ বা তাগুল দিতেছে। মুহূর্তের জ্ঞও সে একাকী থাকিতে পাইতেছে না। তাহাব সন্দেশ হইল, এই সাডঘর আপ্যায়নের অন্তরালে অদৃশ জাল তাহাকে ঘিরিয়া বহিয়াছে। সে মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। হঠতাবেশে রাজকুমারী রট্টার নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে চিত্রক মনে মনে একটি সঙ্কল্প স্থির করিয়া গাজোথান করিল। উত্তরীর স্বন্ধে লইতেই এক কিঙ্কর ঘোড়হস্তে আসিয়া সম্মুখে পাড়াইল—‘কি প্রয়োজন আদেশ করুন আৰ্য—আগবেহ ।’



চিত্রক বলিল—‘বহিভাগে পবিত্রমণ কবিবার ইচ্ছা করিয়াছি।  
বাঘু সেবনের প্রয়োজন।’

কি সব পশ্চাত্তপদ হহবা অতর্কিত হইল।

চিত্রক বা ভবনের বাহিরে পদার্পণ কবিযাছে, কোথা হইতে কঞ্চকী  
আসিয়া হাসিমুখে তাহার সহিত যোগ দিল। ‘সায়ংকালে বাঘু সেবনের  
ইচ্ছা হইয়াছে? ভাল ভাল, চলুন আপনাকে বাগ্গুপুত্রী দেখাচ।’ বলিয়া  
লক্ষণ কঞ্চকী লক্ষণ দ্রাতার মতই তাহার সহগামী হইল।

ঔইছান পুত্রভূমিব যত্রতত্র বিচরণ কবিত্তে লাগিল। চিত্রক ঐখিল  
পুত্রী বাহিরে যাহাব চেষ্টা বুখা, সে পুত্রপ্রাকারব বাহিরে যাহাব  
ইচ্ছা পকাশ কবিলে কঞ্চকী ছবতো সাধা দিবে না, কিন্তু নিজে সঙ্গে  
থাকিব। স্তববা বাহিরে যাইবাব আশ্রয় প্রকাশ না কবাই ভাল।

বিশ্বত পুত্রভূমিব স্থানে স্থানে বৃক্ষ-বাটিকা, লতা-মণ্ডপ। মাল্লব বেষণ  
নাহ তাহা আশ্রয় তাহাব অধিকাংশই সশস্ত্র প্রতীহার বিশ্বা বক্ষী, ছহ  
চাপিহন উত্তাযা।ও আছে। তাহাব সক্ষম নিজে নিজ কাণে নিমুক্ত।

সংস্কৃত পদ্য কবিত্তে কবিত্তে চিত্রক অশ্রুভা কবিল, কঞ্চকী ছাড়াও  
অন্য বস তাহাব উপব লক্ষ্য বাখিয়াছে, নিজে অলক্ষ্য থাকিয়া তাহাকে  
অনুসরণ কবিতেছে। চিত্রক চকিত্তে কষেকণাব বাউ ফিবাইয়া দেখিয়া,  
কিন্তু ক্র্যাব মন্যাতোকে ‘বসেব এছু ঠাঠব কাব ও পাবিল না।

শাপব এক বৃক্ষ বাটিকাব নিকটে চিত্রক তাহার অদৃশ্য অনুসরণ-  
কাৰীকে মুখোমুখি দেখিত্তে পাইল। এক বৃক্ষব অন্তবাল হহতে  
একবাউ ভবক্ষব চক্ষু তাহাব দিকে চাতিয়া আছে, সিংসাবিকৃত মুখে  
অলস্ত দুটা চক্ষু। চিত্রক চমকিয়া বলিয়া উঠিল—‘ও কে?’ সঙ্গে সঙ্গে  
মুত্তি ছাবাব শ্রায় মিলাইয়া গেল।

কঞ্চকী বলিল—‘ও গুহ। আপনাকে নতন মাল্লব দেখিয়া বোধ হয়  
কৌতুহলী হইয়াছে।’

চিত্রকের গত রাত্রের কথা মনে পড়িল : হাঁ, সেই বটে। কিন্তু গত রাত্রে গুহর চোখে এমন তীব্র দৃষ্টি ছিল না। চিত্রক কঙ্ককীকে প্রণয় করিলে কঙ্ককী সংক্ষেপে পাগল গুহর বৃত্তান্ত বলিল। তখন চিত্রক, অন্ধকূপে পৃথার নিকট যে কাহিনী শুনিয়াছিল তাহার সহিত মিলাইয়া প্রকৃত ঘটনা অনেকটা অনুমান কবিয়া লইল। গুহই পৃথাকে হরণ করিয়া কূটরঞ্জে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, ইচ্ছা ছিল বৃদ্ধ শেষ হইলে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে দখল করিবে, কিন্তু মস্তকে আঘাত পাইয়া তাহার স্মৃতি ভ্রংশ হয়। তবু সে সব কথা ভোলে নাট; কোন অর্ধ-বিত্রাস্ত বৃত্তিব দ্বারা পরিচালিত হইয়া গোপনে পৃথাকে খাণ্ড দিয়া বাহ্যত। শতাব্দীর একপাদ ধরিয়া সে এই কাজ কবিয়াছে। আশ্চর্য মস্তিষ্কের ক্রিয়া, আশ্চর্য জীবনের সহজাত সংস্কার!

ক্রমে দিবালোক মুচিয়া গিয়া চাদেব আলো ফুটিয়া উঠিল। বাজপুর্বীৰ ভবনে ভবনে দীপমালা জ্বলিল।

প্রদোষের এই সন্ধিক্ষণে চাৰিদিকে চাতিয়া চিত্রকের মনে হইল সে এই নির্বাক্তব পুর্বীতে একান্ত একাকী, নিঃশব্দ অসহায়। কাণ বন্দী হইবাব পর অন্ধকার কাবাকূপেব মধ্যে ত্রাহার সে অত্যা হইয়াছিল, আজ রাজপুর্বীর দীপোদ্ভাসিত প্রাক্ষণে সে অবস্থার কিছুমান পৰি উন্নত হয় নাই।

সহসা তাহার অন্তর অসহ্য অধীবতায় ছটফট করিয়া উঠিল, সে যেন জল হইতে তীরে নির্ক্ষিপ্ত মীন। কিন্তু সে তাহার মনেব অবস্থা সংগে গোপন করিয়া কঙ্ককী সমভিব্যাহারে নিজ বাসভবনেব দিকে ফিরিয়া চালনা।

\* \* \* \*

রাত্রির মধ্য যামে রাজপুর্বীর আলোকমালা নিবাপিত হইয়াছিল; শুক্লা চতুর্দশীর চন্দ্র পশ্চিমদিকে চলিয়া পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে লঘু মেঘখণ্ড আসিয়া স্বচ্ছ আবরণে চন্দ্রকে ঢাকিয়া দিতেছিল।

বাল্লভবন সুপ্ত; কোথাও শব্দ নাই। চিত্রক আপন শব্দকক্ষে শয্যাব লক্ষমান ছিল, ধীবে ধীবে উঠিয়া বসিল। সে ঘুমায় নাই, কেবল চক্ষু মুদিত করিয়া শয্যায় পড়িয়া ছিল।

ঘবেব এককোণে স্তিমিত বতিকা অস্পষ্ট আলোক বিকীর্ণ করিতেছে, মুক্ত বাতায়ন পথে মুহু বায়ব সহিত জ্যোৎস্নাব প্রতিভাস কক্ষে প্রবেশ করিতেছে। চিত্রক নিঃশব্দে পালঙ্ক হইতে নামিয়া বাতায়নের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কোনও জনমানব নষ্ট, চন্দ্রিকালিঙ্গ পুৰী নিথর দাঁড়াইয়া আছে।

চন্দ্রবিশ্ব স্বচ্ছ মেঘে ঢাকা পড়িয়া, বহিদৃশ্য আবছায়া হইয়া গেল। শুষ্ক তখন বাতায়ন হইতে সবিধা আসিয়া দ্বাব পথে উঁকি মারিল। দাবের গিঁটে একটা কিঙ্কব বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে, অন্য কেহ নাই। চিত্রক নিঃশব্দে ফিৰিয়া আসিয়া। প্রাচীন গায়ে তাহার একোষ অসি মুদিত হইল, সে তাহা কোমবে বাঁধিল।

প্রাপন লঘু পদে বাতায়ন লঙ্ঘন করিয়া সে পূর্ব ভূমিতে উত্তীর্ণ হইল। দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া ভাবিল, একটা বাধা উত্তীর্ণ হইয়াছে, আর একটা বাধা—পূর্বপ্রাচীর। ইহা পাব হইলেই মুক্তি।

অন্য একটা লশ মণ্ডপের অন্তরাল হইতে দুইটি তীক্ষ্ণ চক্ষু বে তাগকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা সে জানিতে পারিল না।

চন্দ্রের মুখে আঁচল মেঘের আচ্ছাদন পড়িল। এই সুর্যোগে চিত্রক ভবিত পদে প্রাকাবেব দিকে চলিল। প্রাকাবেব শিতব দিকে স্থানে স্থানে প্রাকাবশীর্ষে উঠিবার সঙ্কীর্ণ সোপান আছে, তাহা সে সাবংকালে লক্ষ্য করিয়াছিল।

প্রাকাবশীর্ষে উঠিয়া চিত্রক বাহিরের দিকে উঁকি মারিল। প্রাকার বহির্ভূমি হইতে প্রায় পঞ্চদশ হস্ত উচ্চ, তাহার মন্ডল পাষণ-গাত্র বাহিয়া নামিবার বা উঠিবার উপায় নাই। এক উপায়, বজ্রাঙ্গ-বলী পবনপুত্রকে

স্মরণ করিয়া নিম্নে লাকাইয়া পড়া ; কিন্তু তাহাতে যদি বা প্রাণ বাঁচে, হস্ত পদ রক্ষা পাইবে না ; অস্থি ভাঙ্গিবে । তখন পলায়নের চেষ্টা হাশ্বকর প্রহসনে পরিণত হইবে ।

তবে এখন কী কর্তব্য ? আবার চুপি চুপি গিয়া শয্যা শুইয়া থাকি ? না, আরও চেষ্টা করিতে হইবে । বাহির হইবার একমাত্র পথ তোরণ দ্বার । তোরণ দ্বারে প্রতীহার আছে—তাহার চোখে খুলা দিয়া বাহির হওয়া কি অসম্ভব ? কে বলিতে পারে, প্রতীহার হস্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ।—

চিত্রক প্রাকারের উপর দিয়া তোরণ দ্বারের অভিমুখে চলিলাম । সাবধানে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল পশ্চাতে কেহ আসিতেছে । সে চকিতে ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না ।

তোরণ স্তম্ভের কাছে পৌছিয়া চিত্রক সম্ভরণে নিম্নে দৃষ্টি প্রেবণ করিল ; দেখিল প্রতীহার দ্বারের লৌহ কবাটে পৃষ্ঠ রাখিয়া পদদ্বয় প্রসাৰণ পুনক ভূমিতে বসিয়া আছে । তাহার চিত্রক বক্ষের উপর নত হইয়া পড়িয়াছে, ভঙ্গট জাগ্রত উপর স্থাপিত । প্রতীহার যে নিদ্রাস্থ উপভোগ করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই ।

তাহাকে দেখিতে দেখিতে চিত্রকের নাসাপুট ফরিত হইতে লাগিল, ললাটের টীকা ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ ধারণ করিল । দেহের স্নায়ুশ্রেণী কঠিন করিয়া সে ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তারপর নিঃশব্দে কোথ হইতে তরবারি বাহির করিল । ইহাই এখন একমাত্র উপায় । তোরণ দ্বারের গাত্রে যে ক্ষুদ্র কবাট আছে তাহা খুলিয়া সে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে । প্রতীহারকে না জাগাইয়া যদি বাহির হইতে পারে ভাল, আর যদি প্রতীহার জাগিয়া ওঠে, তখন—

নিকটেই শীর্ণ সোপানশ্রেণী ; চিত্রক নীচে নামিল । তোরণস্তম্ভের গাথে থিয়া অতি সতর্ক পদসঞ্চারে নিদ্রিত প্রতীহারের দিকে অগ্রসর

হইল। এতক্ষণে সে প্রতীহারের মুখ দেখিতে পাইল; দেখিল গত রাজ্রির সেই প্রতীহার।

ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া চিত্রক আৰ এক পদ অগ্রসর হইল। কিন্তু আর তাহাকে লগ্নসর হইতে হইল না। এই সময় পশ্চাতে একটা গভীর গর্জনধ্বনি হইল; সঙ্গে সঙ্গে ভল্লুকেব মতো একটা জীব তাহার স্বন্ধে নাকাইয়া পড়িয়া দুই বজ্রবাছ দিয়া তাহাব কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

অতর্কিত আক্রমণে চিত্রক সম্মুখ দিকে পড়িয়া গেল। আক্রমকও সঙ্গে সঙ্গে পড়িল, কিন্তু তাহার বাহুবন্ধন শ্লথ হইল না। চিত্রকের শ্বাস বোধ হইবাব উপক্রম হইল। শক্রে পৃষ্ঠের উপর—চিত্রক তাহাকে দেখিতে পাইল না। অন্ধভাবে মাটিতে পড়িয়া সে অদৃশ আততায়ীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; তাহাব মুষ্টি হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। দুই হাতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবাও কিন্তু সে আততায়ীব নাগপাশ হইতে নিজ কণ্ঠ মুক্ত করিতে পারিল না।

এদিকে প্রতীহাব আচম্বিতে ঘূন ভাঙ্গিয়া দেখিল তাহার সম্মুখে গজ-কচ্ছপেব বৃদ্ধ বাধিবা গিযাছে। কিছু না বুঝিয়াই সে লাকাইয়া উঠিল এবং কট হইতে একটা তুরী বাহুব কাঁবয়া তাহাতে ফুৎকার দিতে লাগিল। তুরের তাবধ্বনিতে চাবিদিক সচকিত হইয়া উঠিল।

চিত্রকের অবস্থা ততক্ষণে শোচনীয় হইবা উঠিযাছে; তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কণ্ঠ মুক্ত করিবা চেষ্টা বুধা। অন্ধভাবে চিত্রক মাটিতে হাত বাধিল, তববাবিটা তাহাব হাতে ঠেকিল। মোহগ্রস্তভাবে তরবারি মুষ্টিতে লইয়া চি এক কোনও ক্রমে জাহুর উপর উঠিল, তারপর তরবারি পিছন দিকে ফিরাইল; আততায়ী যেখানে তাহার পৃষ্ঠের উপর জড়াইয়া ধরিযাছে সেটখানে তরবারির অগ্রভাগ রাখিয়া দুই হাতে আকর্ষণ করিল। তববাবি ধীবে ধীরে আততায়ীর পঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ আততায়ী তদবস্থ বহিল; তারপব তাহার বাহুবন্ধন সহসা শিথিল হইল। সে চিত্রকের পৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ফুসফুস ভরিয়া শ্বাসগ্রহণপূর্বক চিত্রক টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে ভূবীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া কণেকজন পুরবাসী ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়াছিল এবং দণ্ডাদিব দ্বাৰা চিত্রককে প্রহার কবিত্তে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু চিত্রক উঠিয়া দাঁড়াইলে তাহাব মুখ দেখিয়া তাহাৰা নিরস্ত হইল।

তোবণ প্রতীহাব ভঙ্গ অগ্রবর্তী কবিয়া বাছে আসিয়া মগ্ন বিষয়ে বলিয়া উঠিল—‘আরে এ কি! এ যে কাল বাহিব চোব—না না - মগধের দূত মহাশয়! এত বাহে এখানে কি কাবংছেন? ওটা কে?’

চিত্রক ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল—‘জানি না। আমাকে পিছন হহতে আচাখতে আক্রমণ করিয়াছিল—’

আততায়ীৰ অসাবন্ধ দেহটা অধোমুখ হহয়া পাত্ৰা ছিল, একজন শিবা তাহাকে উন্টাহয়া দিল। ও ন চন্দ্রালোকে তাহাব মুখ দেখিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল—শুভ।

শুভ মরিয়াছে, তাহাব দেহটা শিথিল জর্জপিতে পারগত হহয়াছে।

প্রতীহার বিষময়-সংহত কণ্ঠে বাণ—‘কি আশ্চর্য—শুভ! শুভ আপনাকে আক্রমণ করিয়াছিল! কিন্তু সে বড় নিরীহ—কখনও কাহাকেও আক্রমণ করে নাহ। আজ সহসা আপনাকে আক্রমণ করিল কেন?’

চিত্রক উত্তর দিল না, একদৃষ্টে শুভৰ মৃত-মুখের পানে চাহিয়া বহিল। শুভর মুখ শান্ত; যেন দীর্ঘ জাগরণের পর সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এই শাস্ত্রটাই ক্ষণেক পূর্বে হিংস্র ঋকের গ্রায় তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া শাস্ত্রিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহা বুঝিবাব উপায় নাই। এই ধৰ্ব ক্ষুদ্র-দেহে এমন পাশবিক শক্তি ছিল তাহাও অসম্ভব কৰা যায় না।

প্রতীহার ওদিকে প্রণ কবিতা চলিয়াছে—‘কিন্তু গুহ আপনার প্রতি এমন মারাত্মক আক্রমণ কবিল কেন? সে অবশ্য পাগল ছিল, কিন্তু কাঁচাকেও অকারণে আক্রমণ করা—’

চিত্রক বলিল—‘অকারণ নয়। আমার প্রতি তাহার বিদ্বেষের কাণ্ড কবিতা। পৃথার মুক্তি। গুহ ভাবিয়াছিল, আমিই তাহার গুপ্তধন চুরি কবিতা।’

গুহ পাশে নতঙ্গালু হইয়া চিত্রক ধীরে ধীরে তাহার পঞ্জর হইতে তরবারি বাহির করিয়া লইল। মৃত্যুব পথপাবে গুহ আবার তাহার নুপু স্বতি ফিরিয়া পাইয়াছে কিনা কে জানে!

## নবম পরিচ্ছেদ

### তিলক বর্মা

পরদিন প্রাতঃকালে সচিব চতুব ভট্ট রাজভবনে চিত্রকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। স্বস্তিবাচন কবিতা বলিলেন—‘কাল রাত্রে আপনি পূবভূমিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আপনার দেখিতেছি মন্দ দশা চলিয়াছে; পদে পদে বিপন্ন হইতেছেন। গভীর বাত্রে অবশ্বিত অবস্থায় বাহিব হওয়া নিরাপদ নয়; রাজপুরীর মধ্যেও বিপদ ঘটিতে পারে।’

কঙ্কুকী উপস্থিত ছিল; সে বলিল—‘সেই কথাই তো আমিও বলিতেছি। কিন্তু দূত প্রবেশের বয়স অল্প, মন চঞ্চল—’ বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

চতুব ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—‘রাত্রে কি নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল?’

প্রশ্নের অন্তর্নিহিত প্রকৃত প্রশ্নটি চিত্রক বুঝিতে পারিল; সচিব জানিতে চান কী জন্ত রাজির মধ্যবর্তীতে সে একাকী বাহিরে গিয়াছিল। এই প্রশ্নের জন্ত চিত্রক প্রস্তুত ছিল, সে মনে মনে একটি কাহিনী বচনা করিয়া রাখিয়াছিল, এখন তাগাই সচিবকে শুনাইল।

—গভীর রাতে চিত্রকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। ঘুম ভাঙ্গিয়া সে দেখে, একটা লোক বাতায়ন পথে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তখন চিত্রক তববারি লইয়া দ্বুভীষ্ট ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হয়। চোব তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া পলায়ন কবে, চিত্রকও বাতায়ন উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহাব পশ্চাদ্ধাবন করে। কিছুদূর পশ্চাদ্ধাবন করিবার পর সে আব চোবকে দেখিতে পায়না। তখন ইতস্তত অন্বেষণ করিতে তোরণ সন্নিকটে উপস্থিত হইলে গুহ তাগাকে অর্কিতে আক্রমণ করে—ইত্যাদি।

কাহিনী অবিখ্যাস্ত নব। চতুর ভট্ট মন দিখা শুনিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, ইহা যদি মিথ্যা গল্প হয় তবে দূত মহাশয়ের উদ্ভাবনী শক্তি আছে বটে। মুখে বলিলেন—‘যা হোক, আপনি যে উম্মাদেব আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন ইহাই ভাগ্য। আপনি মগধের মহামাঞ্জ দূত, আপনার কোনও অনিষ্ট হইলে আমাদের আব সাস্তনা থাকিত না।’ কক্ষকীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—‘লক্ষণ, দিবাবাত্র দূত মহাশয়ের রক্ষাব ব্যবস্থা কর। তিনি এখন কিছুদিন রাজ-অতিথিকপে থাকিবেন, তাঁহাব অনিষ্ট হইলে দ্বাষিক্ত তোর্মাব, স্রবণ বাধিও।’

চিত্রক উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—‘কিহু আমি শীঘ্রই চলিখা যাইতে চাই। আতিথ্য রক্ষা তো হইয়াছে, এবাব আমাকে বিদায় দিন।’

সচিব দৃঢ়ভাবে বলিলেন—‘এত শীঘ্র যাওয়া অসম্ভব। চষ্টন দুর্গে মহারাজের নিকট মগধের লিপি প্রেবিত হইয়াছে, মহারাজ সম্ভবত আপনার সঙ্কিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিবেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার না করিয়া



আপনি চলিয়া যাইতে পারেন না।’—গাজোথান করিয়া চতুর ভট্ট নরম সুরে বলিলেন—‘আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন? রাজকাৰ্য একদিনে হয়না। কিছুদিন বিশ্রাম করুন, আরাম উপভোগ করুন; তারপর বিটক বাজ্যেব দূত যখন পত্রের উত্তর লইয়া পাটলিপুত্রে যাইবে তখন আপনিও সঙ্গে ফিরিতে পারিবেন। সকল দিক দিয়া সুবিধা হইবে।’

সচিব প্রস্থান করিলেন। চিত্রক হতাশা-পূর্ণ হৃদয়ে বসিয়া রহিল। তাহার মনশক্ষে কেবলই শিশিখবেব সগুন্দ মুখ ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। দিনটা প্রায় নিষ্কিঞ্চ ভাবেই কাটিল। কঙ্ককী লক্ষণ যদি বা এ পর্যন্ত চিত্রকে কদাচিত্ চক্ষেব অন্তরাল করিতেছিল, এখন একেবারে জলৌকার জাঘ তাহার অঙ্গে জুড়িয়া গেল; স্বানে আহাবে নিদ্রাঘ পলকের তবে তাহার সঙ্গ ছাড়িল না।

অপরাত্নের দিকে উভয়ে অক্ষক্রীড়ায় কাল ধরণ করিতেছি। বিনা পণেব খেলা, তাই চিত্রকের বিশেষ মন লাগিতেছিল না; এমন সময় অববোধ হইতে বাজকুমারীর স্বকীয়া এক দাসী আসিল। দাসী রুতাঞ্জলি পুটে দাড়াহতেই কঙ্ককী ঈবৎ বিস্ময়ে বলিল—‘বিপাশা, তুমি এখানে কি চাও?’

বিপাশা বলিল—‘আৰ্য, দেবহুহিতার আদেশে আসিয়াছি।’

কঙ্ককী দ্ববিত্তে উত্তিবা দাঁড়াইয়া বলিল—‘দেবহুহিতার কী আদেশ?’

বিপাশা বলিল—‘দেবহুহিতা উশীর-গৃহে অবস্থান করিতেছেন, সঙ্গে সখী সুগোপা আছেন। দেবহুহিতা ইচ্ছা করিয়াছেন মগধের দূত মহোদয়ের সহিত কিছু বাক্যালাপ করিবেন। অল্পমতি হইলে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারি।’

কঙ্ককী বিপদে পড়িল। কোনও রাজদূতের সহিত অবরোধের মধ্যে সাক্ষাৎ করা রাজকন্টার পক্ষে শোভন নয়, নিয়মাহুগও নয়। কিন্তু রাজকুমারী একে জীজাতি, তাই হুণকন্টা; অবরোধের শাসন তিনি কোন

কালেই যানেন না। উপরন্তু, গণ্ডের উপর পিণ্ড, ঐ স্নগোপা সখীটা আছে। স্নগোপাকে কঙ্কী স্নেহের চক্ষে দেখে না। স্নগোপার সহিত মিশিয়াই রাজকন্ডার মর্বাদাজ্ঞান শিখিল হইরাছে। কিন্তু উপায় কি? এদিকে অবরোধের শালীনতা বক্ষা করিতে হইবে; নহিলে কঙ্কী ব কর্তব্যে ক্রটি হয়। আবার দূত-প্রবরকেও একাকী ছাড়িয়া দেওয়া যায় না—

লক্ষণ কঙ্কী চট্ করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল; বিংশাশাকে বলিল—‘তুমি অগ্রবর্তিনী হও, আমি দূত মহাশয়কে লইয়া স্বয়ং যাইতেছি।’

কঙ্কী সঙ্গে থাকিলে অবরোধে পুরুষ প্রবেশের দোষ অনেকটা ক্ষালন হইবে, অধিকন্তু দূত মহাশয়ও চোখে চোখে থাকিবেন।

অবরোধের পশ্চিম প্রান্তে উশী বৃহৎ। সারি সারি কয়েকটি কক্ষ; দ্বারে পবাক্কে সিন্ধু উশীরের জাল। গ্রীষ্মের তাপ বর্ধিত হইলে পুস্ত্রীরা এই লক্ষণ শীতল কক্ষে আশ্রয় লইয়া থাকেন।

একটি কক্ষে গুত্র মর্মব পদেব উপর কুমারী রত্না উপবিষ্টা ছিলেন, স্নগোপা তাঁহার কাছে কুট্টিমের উপর তালবৃন্ত হাতে লইয়া বসিয়াছিল। কঙ্কী ও চিত্রক দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে স্নগোপা তাভাতাডি উঠিয়া একটি গোড়দেশীয় মন্ডন পাটিক পাতিয়া দিল।

উভয়ে উপবিষ্ট হইলে রত্না মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। কঙ্কীকে চিত্রকের সঙ্গে দেখিয়া তিনি ব্যাপার বুঝিয়াছিলেন, কোতুক-তবল কণ্ঠে বলিলেন—‘এই অববোধের প্রতি আর্থ লক্ষণের যেমন সতর্ক স্নেহ-মমতা, শিশু সন্তানের প্রতি মাতারও এমন দেখা যায় না।’

লক্ষণ অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। চিত্রক রাজকুমারীর বাক্যে ফোটান দিয়া বলিল—‘কঙ্কী মহাশয় আমাব প্রতিও বড় স্নেহশীল, তিলার্ধের জন্তও চোখের আড়াল করেন না।’

বিদ্বস্ত কক্ষকী নতমুখে হেঁ হেঁ করিয়া ছাদিবার চেষ্টা করিল। তাহার উভয় সন্ধট ; কর্তব্য করিলে বাফা বহুনা, না করিলে মুণ্ড লইয়া টানাটানি।

যাহোক, অতঃপর কুমাবী রট্টা চিত্রককে বলিলেন—‘দূত মহাশয়, আমার সদী আপনাকে কিছু কথা বলিতে চায়, তাই আপনাকে কষ্ট দিয়াছি। স্বীগোপা, এবার তোব কথা ভুই বন্।’

স্বীগোপা কোলের উপর ছুই নৃত্ত হস্ত রাখিয়া নতক্কে বসিয়া ছিল, এখন ধীরে ধীরে বলিল—‘আর্থ, আমি আপনার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, প্রতিদানে আপনি আমার ইষ্ট করিয়াছেন। আপনার প্রসাদে আমার মাতাকে ফিরিয়া পাইয়াছি।’

চিত্রক অবহেলা ভরে হস্ত সঞ্চালন করিয়া এমন ভাব প্রকাশ করিল যে মনে হয় এই সব ইষ্টানিষ্ট চেষ্টা তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর। স্বীগোপা তখন বলিল—‘আপনি উদ্ধার চরিত্র। তাই সাহস করিয়া আপনার নিকট একটি অল্পগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি। আমার অভাগিনী জননী—’ স্বীগোপার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল—‘উদ্ধার পাইবার পর শয্যা লইয়াছেন। তাঁহার শবীব অতি দুর্বল, যে-কোনও মুহূর্তে প্রাণবায়ু বাহির হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ স্তম্ভ আছে। তাঁহার বড় সাধ আপনাকে একবার দেখিবেন, নিজমুখে কৃতজ্ঞতা জানাইবেন—’

চিত্রক বলিল—‘কৃতজ্ঞতা জানাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি যদি আমাকে দেখিলে স্মৃথী হন আমি নিশ্চয় দেখা করিব। কোথায় আছেন তিনি?’

স্বীগোপা বলিল—‘আমার গৃহে। আমার কুটীর রাজপুরীর বাহিরে কিছু দূরে। যদি অল্পগ্রহ করেন, এখন লইয়া যাহতে পারি।’

চিত্রক উঠিয়া দাঁড়াইল—‘চলুন। আমি প্রস্তুত।’

কক্ষকী ব্রতভাবে লাফাইয়া উঠিল—‘আ—রাজপুরীর বাহিরে! তা—তা—আমি সঙ্গে দুইজন রক্ষী দিতেছি—’

চিত্রক বলিল—‘নিশ্চয়োজ্ঞন । আমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ ।’

বিত্রত কঞ্চুকী বলিল—‘কিন্তু তাহা কি করিয়া হইতে পারে ! অর্থাৎ  
চতুর ভট্ট—অর্থাৎ—আপনার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার উপর—’

চিত্রক রট্টার দিকে চাহিয়া করুণ হাসিল—‘আমার উপর কঞ্চুকী  
মহাশয়ের বিশ্বাস নাই । তিনি বোধহয় এখনও আমাকে চোর বলিয়াই  
মনে করেন । তাঁহার সন্দেহ, ছাড়া পাইলেই আমি আবার ঘোড়া  
চুরি করিব ।’

রট্টা ঈষৎ ক্রকুঞ্চন কবিলেন—‘অর্থাৎ লক্ষণ, বক্ষী ব প্রযোজন নাহ ।  
সুগোপা দূত মহাশয়কে লইয়া গাইবে, আবার পৌছাইয়া দিবে ।’

দিগু গলাধঃকরণ করিয়া কঞ্চুকী বলিল—‘তা—তা—দেবজুতিতাব  
যদি তাহাই অভিকৃতি—’

চিত্রক মনে মনে ভাবিল—এই সুযোগ ! সে আব বাজকুমারী ব সঙ্গে  
দৃষ্টি বিনিময় করিল না, রট্টার চোখে কি জানি কী সম্মোহন আছে,  
চোখাচোখি হইলে আবার হয়তো তাহার মনের গতি পবিবর্তিত হইবে ।  
সে সুগোপাব অনুসরণ করিয়া উশীব-গৃহ হইতে বাহির হইল ।

রাজপুরীর তোরণ দ্বাবেব সম্মুখ দিয়া যে পথ গিয়াছে তাহা দক্ষিণ  
দিকে কিছুদূর গিয়া নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিয়াছে, তাবপব আবও  
খানিকদূর গিয়া একটি বাঁকের মুখে আসিয়া আবার নীচে নামিয়াছে ।  
এই বাঁকের উপর সুগোপাব কুটী ব ; ইহার পব হইতে বাজপুরুষ ও  
নাগরিক ল্লাধাবেব গুংগাদি আরম্ভ হইয়াছে ।

সুগোপাব কুটীর ক্ষুদ্র হইলেও সুদৃশ্য, পবিস্কার পবিচ্ছন্ন ; চারিদিকে  
ফুলের বাগান । সুগোপাব মালাকর স্বামী গৃহেই ছিল ; সুগোপাকে  
আসিতে দেখিয়া সে কুল-মালাদি লইয়া বাহির হইল । বাজাবে  
কুল-মালা বিক্রয় করিয়া যাহা পাইবে তাহা লইয়া সে মন্দিরালয়ে প্রবেশ  
করিলে । লোকটি অতিশয় নীরব প্রকৃতির ; আপন মনে উচ্চানের

পরিচর্যা করে, মালা গাঁথে, বিক্রয় করে, আর মন্দিরা সেবা করে। কাহারও মাতে পাচে নাই।

সুগোপা চিত্রককে মাতার নিকট লইয়া গেল। একটি ঈষদন্ধকার কক্ষে বট্টার উপর সমস্তবিন্যস্ত শয্যায় পৃথা শুইয়া আছে। তাহার দেহ যথাসম্ভব পবিত্র হইয়াছে, নখ কাটিয়া মাথায় তৈল সেক করা হইয়াছে। কিন্তু কেশের গ্রস্থিযুক্ত তাম্রাভ বর্ণ দূর হয় নাই। মুখের ও দেহের অন্ধ দীর্ঘকাল আলোকেব স্পর্শাভাবে চবিদাভ বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

পৃথা শয্যাব সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছিল; কোটরগত চক্ষু উর্ধ্বে নিবদ্ধ ছিল, চিত্রক নিঃশব্দে তাহার শয্যা-পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলে সে ধীরে ধীরে চক্ষু নামাইল। অনেকক্ষণ চিত্রকের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—‘তুমিই সেই?’

সুগোপা শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া মাতাব কপালে হস্ত রাখিল, ম্লিন্ধকণ্ঠে বলিল—‘হঁ মা, ইনিই সেই।’

আবও কিছুক্ষণ চিত্রককে দেখিয়া পৃথা বলিল—‘তুমি হুণ নও—‘আর্য।’

চিত্রক হাসিয়া বলিল—‘হা আমি আর্য। যে হুণ তোমাকে বন্দী করিয়া বাধিবাড়ি সে মবিয়াছে।’ বলিয়া সংক্ষেপে গুহের মুহূর্ত্ত বিবরণ বলিল।

শুনিয়া পৃথা বলিল—‘এখন আর কী আসে যায়। আমার জীবন শেষ হইয়াছে।’

চিত্রক শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সাস্তনার কণ্ঠে বলিল—‘একপ কেন মনে করিতেছ? তোমার শরীর আবার সুস্থ হইবে। তোমার কষ্ট আছে; তাহাকে লইয়া আবার তুমি সুখী হইবে। যাহা অতীত তাহা ভুলিয়া যাও।’

পৃথার মুখে আশা বা আনন্দের রেখাপাত হইল না। সে অনেকক্ষণ

চূপ করিয়া থাকিয়া বলিল—‘আমাব কথা থাক। তোমার কথা বল। তুমি আমাকে উদ্ধার কবিয়াছ, তোমার কথা শুনিতে চাই।—তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি অপরিচিত নও—পূর্বে যেন দেখিয়াছি।’

চিত্রক লঘু হাশ্বে বলিল—‘তুমি তো অন্ধকারে দেখিতে পাও। সে-রাত্রে কুট-কক্ষে দেখিয়াছিলে—হয়তো সেট স্মৃতি মনে জাগিতেছে।’

‘তালাই হইবে। তোমার নাম কি?’

‘চিত্রক বর্মা।’

পৃথা নীরবে তাহার ক্ষতরেখা চিহ্নিত অঙ্গে চক্ষু বুলাইল।

‘মাতা পিতা জীবিত আছেন?’

মাতা পিতা! চিত্রক মনে মনে হাসিল, তাহার মাতা পিতা থাকিতে পারে ইহাই যেন অসম্ভব মনে হয়। বলিল—‘না, জীবিত নাই।’

‘তোমার বয়স অল্প মনে হয়—’

‘নিতান্ত অল্প নয়, পঁচিশ ছাঈশ বছর।’

পৃথা কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিত করিয়া রছিল, শেষে ধীরে ধীরে বলিল—  
‘আমার তিলক বাঁচিয়া থাকিলে তোমার সমবয়স হইত।’

‘তিলক কে?’

‘কুমার তিলক বর্মা। আমি তাহাব দাজী ছিলাম। সে আবে স্নগোপা এক দিনে জন্মিয়াছিল; আমার তঞ্চ ঢ’জনকে ভাগ কবিয়া দিতাম।’

স্নগোপা নিম্নস্বরে বলিল—‘মা, ও কথা আর মনে আনিও না।’

পৃথা চক্ষু নিম্নীলিত করিয়া বলিল—‘তাহার কথা ভুলিতে পারি না। নবনীতের স্নায় স্নকুমার শিশু—সেই শিশুকে হুণেরা আমার বুক হইতে ছিঁড়িয়া লইল—তারপর—তারপর—’

অকালযুকা পৃথার পাণ্ডুর গণ্ড বহিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ক্ষরিত হইতে লাগিল। স্নগোপা চিত্রকের সহিত বিষয় দৃষ্টি বিনিময় করিল।

চিত্রক বলিল—‘ক্ষত্রিয় শিশু যদি তরবারির আঘাতে মরিয়া থাকে তাহাতে আক্ষেপ করিবার কী আছে? ক্রীতদাস হইয়া বাঁচিয়া থাকার অপেক্ষা সে ভাল।’

পৃথা নিস্তেজ স্বরে বলিল—‘বাজার ছেলে ক্রীতদাস হয় নাই সে ভাল। কিন্তু রাজজ্যোতিষী বলিষাছিলেন, এ শিশু রাজতীকা লইয়া জন্মিয়াছে, বাজচক্রবর্তী হইবে। কষ্ট, তাপ তো হইল না! ● রাজজ্যোতিষীর কথা মিথ্যা হইল—’

চিত্রক মুহূর্ত্তে বলিল—‘বাজজ্যোতিষীর কথা অমন মিথ্যা হয়। কিন্তু রাজতীকা লইয়া জন্মিয়াছে ইহাও অর্থ কি?’

পৃথা বীরে বীরে বলিল—‘আমি যেন চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি। তাহার জ্বর মধ্যস্থলে জটুল ছিদ্র; অল্প সময় দেখা যাইত না, কিন্তু সে কাঁদিলে বা ক্রুদ্ধ হইলে ঐ জটুল বক্রবর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিত। এমন হস্ত যেন বক্র চন্দনেব ত্রিগুণক। তাই তাহার নামকরণ হইয়াছিল—‘ত্রিগুণক বমা।’

বাতাসেব দুঃকাবে ভ্রমাবৃত অঙ্গার যেমন স্কুরিত হইয়া উঠে, চিত্রকের দমধ্যে তেমনি রক্তটীকা জ্বলিয়া উঠিল। সে ব্যায়ত চক্ষে চাহিয়া অর্ধবিকল্প কণ্ঠে বলিল—‘কা বলিলে?’

পৃথা চক্ষু বেলিল। সম্মুখে চিত্রকের মুখ তাহার মুখের উপর বুঁকিয়া আছে; সেই মুখে জয়গুণেব মধ্যে প্রবাসেব ছায় তিলক অলিতেছে। পৃথার চক্ষু ক্রমে বিক্ষারিত হইতে লাগিল; তায়পর সে চীৎকার করিয়া উঠিল—‘তিলক! আমার তিলক বমা! পুত্র! পুত্র!’

পৃথা ছুই কদালসার হস্তে চিত্রককে টানিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিতে চাছিল; কিন্তু এই প্রবল উদ্ভেজনায় তাহার দেহের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল; সহসা তাহার হস্ত শিথিল হইয়া চিত্রকের স্বন্ধ হইতে খসিয়া পড়িল। সে চক্ষু মুদিত করিয়া মৃতব্য হির হইয়া রছিল।

সুগোপা কানিয়া উঠিল। চিত্রক পৃথিব বন্ধের উপব করতল রাখিয়া মেঝিল অতি ক্রীণ ক্রুপিণ্ডেব স্পন্দন অল্পকৃত হইতেছে। সে সুগোপাকে বলিল—‘এখনও বাঁচিয়া আছেন। যদি সম্ভব হব শীঘ্র চিকিৎসক ডাকো।’

সুগোপা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাজবৈজ্ঞ রট্টাব আদেশে পৃথার চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন। রাজবৈজ্ঞেব বাসভবন নিকটেই; অন্নক্ষণের মধ্যে সুগোপা বৈজ্ঞকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞরাজ ছেবং মুখ বিরুত কবিলেন, তাবপব সুচিকান্তরণ প্রয়োগ করিলেন।

সে রাত্রে চিত্রক রাজপুরীতে ফিবিয়া গেল না।

সন্ধিদ্ধ কঞ্চুকী অলক্ষিতে দুইটি গুপ্ত-রক্ষী পাঠাইয়াছিল, তাহাবা সারা রাত্রি সুগোপার কুটারের বাহিরে পাগবা দিল।

গভীর রাত্রে পৃথা মোহাচ্ছন্ন ভাবে পাড়িয়া ছিল। চিত্রক তাগাব শযাপাশে দাঁড়াইয়া সুগোপাব স্কন্ধের উপর হাত বাথিল—‘সুগোপা, তুমি আমার ভগিনী, আমরা একই স্তনহৃদ্য পান করিবাছি।’

সুগোপা শুধু সজল নেত্রে চাহিয়া রছিল।

চিত্রক বলিল—‘সে কথা আজ শুনিয়াছ তাগ কাগাকেও বলিও না। বলিলে আমার জীবন সংশয় হইতে পারে।’

সুগোপা ভয়বরে জিজ্ঞাসা কবিল—‘এখন তুমি কী করিবে?’

চিত্রকের অথরে ত্রিয়মাণ হাঙ্গি দেখা দিল—‘ভাবিয়াছিলাম পলায়ন করিব। কিন্তু এখন—কি করিব জানি না। তুমি একথা কাগাকেও বলিও না। হয়তো তোমার মাতা ভুল করিয়াছেন; কল্প দেহে এক্রপ ভ্রান্তি অসম্ভব নয়—।’

সুগোপা বলিল—‘ভ্রান্তি নয়। আমার অন্তর্ধামী বলিতেছেন, তুমি উদ্ধক বর্মা।’



‘তিলক বর্মা। শুনিতে বড় অদ্ভুত লাগে। কিন্তু সত্য হোক মিথ্যা  
তোক, তুমি শপথ কব এ কথা গোপন রাখিবে।’

‘ভাল, গোপন রাখিব।’

‘কাহাকেও বলিবে না?’

‘না।’

পৃথিবীর জ্ঞান হইল না। বাত্মি শব্দে তাহার প্রাণবায়ু নির্গত  
হইল।

## দশম পরিচ্ছেদ

### নূতন পথে

সত্য যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে শ্মশানের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত  
হয়, তখন তাহার রূপ যতই অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় হোক, তাহাকে সত্য  
বলিয়া চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। পাবিপাশ্বিক পরিবেশের মধ্যে  
নিজে সজ্ঞে স্বাভাবিক রূপে প্রতিষ্ঠিত কবিবাব এমন একটি অসম্ভব  
ভঙ্গী সন্ধ্যা আছে যে তাহাকে অবীকার কবা একেবারেই অসম্ভব।

পৃথিবীর মুখে চিত্রক যখন নিজের পবিচয় শুনিল তখন ক্ষণেকের ভবেও  
তাহার মনে সন্দেহ বা অবিশ্বাস জন্মিল না। বরং তাহার অতীত জীবনের  
সমস্ত পূর্বসংযোগ, তাহার সর্বদা অসি-বেথাক, সমস্তই যেন এই নূতন  
পরিচয়ের সমর্থন করিল। কিন্তু তথাপি, চিরাভ্যস্ত দর্পণে নিজের মুখ  
দেখিতে গিয়া কেহ যদি একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখ দেখিতে পায় তাহা  
হইলে সে যেমন চমকিয়া উঠে, চিত্রকও আদৌ নিজের প্রকৃত পরিচয়  
জ্ঞানিতে পারিয়া বিশ্বয়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা ক্ষণেকের

জন্ম ; পরক্ষণেই সে দৃঢ়বলে নিজেকে সম্বরণ কবিতা লইয়াছিল। তাহাব মস্তিষ্ক রন্ধে অযুত উন্নত চিন্তা ঝাঁক বাঁধিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি বোদ্ধার সংল সতর্কতাব দ্বারা সে তাহার প্রতিবোধ করিয়াছিল। সঙ্কটকালে বুদ্ধিদ্রব্ধ হইলে সর্বনাশ।”

উপরক্ত এই বাহু সংঘর্ষের তলে তলে তাহার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ কবিয়াছিল। শৈশব হইতে যে বিচিত্র বাতাবরণের মধ্যে সে বর্ষিত হইয়াছে, বাঁচিয়া থাকার জৈব চেষ্টায় যে নিরূপ ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা তাহাকে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র দান করিয়াছিল; এই চরিত্র কঠিন, স্বাধিপত্যবশ, নীতি-বিশুদ্ব ও সুরোধোগসঙ্কী—ইহা আমবা পূর্বে দেখিয়াছি। এখন নিজে প্রকৃত পরিচয় জানিবার পব তাহার নিগূঢ় অন্তর্লোকে ধীবে ধীবে একটি পরিণতনের স্বত্রপাত হইল; সে নিজেও জানিল না যে তাহার বক্তব্য প্রত্যয়—এই এতদিন আত্মপরিচয়ের অভাবে স্তম্ভ ছিল—তাহা তাহার অর্জিত চরিত্রকে অলক্ষিতে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ কবিয়াছে।

পৃথার মুহূর্ত্তর পবদিন প্রাতঃকালে চিত্রক যখন রাজপুত্রীতে কবিয়া আসিল তখন তাহার মুখের ভাব ক্রান্ত, ঈষৎ গম্ভীর, তাগাব অন্তরে যে শীতলপ্রাচ্ছন্ন বুদ্ধকু নাগ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা কেহ জানিতে পারিল না। চারিদিকে স্বর্ধকরোচ্ছল পূবভূমি, চূর্ণবিলোপিত ভবনগুলি হতভুত স্তম্ভ বৃন্দবৃন্দ-বিষের স্তায় শোভা পাহতেছে। ইহাদেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিয়া চিত্রক ভাবিতে লাগিল—আমার! আমার! এ সকলই আমার!

কিন্তু—একথা কাহাকেও বলিবার নয়। বলিলে লোকে হাসিবে, উদ্ভাস বলিয়া ব্যঙ্গ করিবে। একজন সাক্ষী ছিদ্র, সে মবিয়া গিয়াছে। সে যদি বাঁচিয়া থাকিত তাহাতেই বা কি হইত? তাহার কথাও কেহ বিশ্বাস করিত না, অসম্বন্ধ প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কিন্তু যদি বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে পরিস্থিতি আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত;

চিত্রককে বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে হইত না। বরং এই ভাল। শুধু স্নগোপা জানিল, তাহাতে ক্ষতি নাই; স্নগোপা-ভগিনী শপথ করিয়াছে কাহাকেও বলিবে না। কিছুদিন নিভুতে চিন্তা করিবার অবসর পাওয়া যাইবে। তারপর—

এদিকে লক্ষণ কঙ্কী গত রাত্রে দুশ্চিন্তায় নিজা বায় নাই। কিন্তু আজ প্রভাতে চিত্রক যখন পলায়নের কোনও চেষ্টা না করিয়া স্বেচ্ছায় বাজপুরীতে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার মন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল; তাহার মনে হইল চতুর ভট্ট বৃথাই চিত্রককে সন্দেহ করিয়াছিলেন। সে দ্বিগুণ সমাদরের সহিত চিত্রকের সেবা কবিত্তে লাগিল।

দ্বিপ্রহবে আহালাদিব পর চিত্রক বিশ্রামের গুণ শব্যশ্রয় করিলে কঙ্কী লক্ষণ বলিল—‘আজ আপনাকে কিছু অধিক বিমনা দেখিতেছি। চিন্তার কোনও কারণ ঘটয়াছে কি?’

চিত্রক বলিল—‘জীবন-মৃত্যুর অচিন্তনীয় সম্ভাব্যতার কথা ভাবিতেছি। পৃথা পঁচিশ বৎসর অক্ষকূপে বান্দনী থাকিয়াও মরিল না, যেমনি মুক্তি পাইল, সেবা-যত্ন পাইল, অমনি মরিয়া গেল। বিচিত্র নয়?’

লক্ষণ বলিল—‘সত্যই বিচিত্র। মাহুষের ভাগ্যে কখন কী আছে কেহই বলিতে পারে না, আজ যে বাজা, কাল সে ভিক্ষুক। এই পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে কতহ যে দেখিলাম!’ বলিয়া সে দীর্ঘশ্বাস মোচন কবিল।

চিত্রক কঙ্কীকে কিয়ৎকাল নিবাক্ষণ করিয়া বলিল—‘কঙ্কী মহাশয়, আপনি কতকাল এই কার্য করিতেছেন?’

‘কঙ্কীর কার্য? তা প্রায় বিশ বছর হইল। আমার পিতা আমার পূর্বে কঙ্কী ছিলেন—’ লক্ষণের স্বর নিম্ন হইল—‘রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি হত হন। তারপর নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে কয়েক বছর গেল। ক্রমে বর্তমান মহারাজ আর্ধভাবাপন্ন হইলেন। তদবধি আমি আছি।’

‘পূর্বতন বাজার কী হইল?’

‘জানিবাছি বর্তমান মহারাজ তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন।’

‘আর রাণী?’

‘রাণী বিষ ভক্ষণে দেহত্যাগ করেন। তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই।’

উদ্বৃত্ত নিশ্বাস চাপিয়া চিত্রক অবহেলাভরে প্রশ্ন কবিল—‘রাজপুত্রটাও নিশ্চয় মরিয়াছিল?’

‘সম্ভবত মরিয়াছিল। কিন্তু তাহার মৃতদেহ পাওয়া বাধ নাই।’

চিত্রক আন অধিক প্রশ্ন করিতে সাহস কবিল না, তন্দ্রাব চলে জ্ব্বন্ত ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুদিত করিল।

দিনটা বিরস শূন্যতা বন্য দিয়া কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে চিত্রক উত্তরীয় স্বন্ধে ফেলিবা ভবন হঠতে বাহির হইল। কঞ্চকী আজ আর তাহার সঙ্গ লইবার চেষ্টা কবিল না। শুধু জিজ্ঞাসা কবিল—‘পুর্বী বাহিরে যাইবেন নাকি?’

চিত্রক বলিল—‘না, ভিতরেই একটু ঘুবিয়া বেড়াইব।’

সূর্য অস্ত গিয়াছে। প্রাসাদের বনভিতে কপোতগণ কলহ-কুড়ন কবিয়া রাজি জঙ্গ নিজ নিজ বিশ্রামস্থল সংগ্রহ করিতেছে। ক্রমে পূর্বদিগধ জ্যোতির্মণ্ডিত করিয়া চন্দ্রোদয় হইল।

পূর্বভূমি প্রায় জনশূন্য, কদাচিত্‌ দুই এক ন কিঙ্কব-কিঙ্করী এক ভবন হইতে অল্প ভবনে যাতায়াত করিতেছে। চিত্রক অনায়াস-পদে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে কবিতে অবশেষে একটি শীর্ণ সোপান অতিবাহিত করিয়া প্রাকারে উঠিল।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রাকারচক্রে রৌপ্য নির্মিত অংগুলিভ স্তায় শোভা পাইতেছে। তাহার উপব উদ্ব্রান্ত চিত্তে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে আসিয়া চিত্রক সহসা থামিয়া গেল।

অদূবে প্রাণকার কুড়োব উপর একটি নারী বসিয়া আছে। জ্যাংলা-কুহেলির মধ্যে শুভ্রবসনা রমণীকে তুষাবোভূত জ্যাংলার মতই দেখাইতেছে। চিত্রকের চিন্তিতে বিলম্ব হইল না--কুমারী বট্টা বশোধবা।

বট্টা অল্প মনে চলেব পানে চাহিয়া আনেন। কোন্ বহিমুখী বৃত্তির আকর্ষণে তিনি আজ প্রাসাদ-শীর্ষেব ছাদে না গিয়া একাকিনী এই প্রাঙ্গণে, আসিয়া বসিয়াছেন তাহা তিনি জানেন, কিম্বা হয়তো তিনিও জানেন না। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া তিনি কী ভাবিতেছেন তাহাও বোধকরি তাঁহার সচেতন মনের অগোচর।

নিশ্বাস রোধ কবিয়া চিত্রক ক্ষণেক দাঁড়াইয়া ব'হল। তাহার ললাটে ধীরে ধীরে ত্রিভুজ কুটিয়া উঠিল, তপ্ত সূচী পায় জ্বালাময় অশ্রুবা হৃদয় বিদ্ধ করিল। তন বাজনন্দিনী বট্টা—এ-নিস্তার্ণ বায়ে যব অধিষ্ঠবী। আর আমি—এক ভাগ্যঘেষী অসি-স্ত্রী নৈনিক—

অথবঃ দংশন কবিয়া চিত্রক শব্দে কবি'বষা বা'তেছিল, পিছন হইতে শব্দ কণ্ঠের গাহবান আসিল—‘আব চিত্রক বমা।’

‘চিত্রক কবি'বল। ব কুমারী'ব কাছে শিষা বৃদ্ধ করে অভিবাদন কবিল, গঙ্গীর মুখে বহল—‘দেবদেহি এখানে আছেন আমি জানিতাম না। জানিলে আসিতাম না।’

বট্টা ঠেং হাঙ্গিলেন, বলিলেন—‘কোনও জানি হয় নাই, ববং ভালই হইবাতে। অবতোধে একাকিনী অ'ব' হইয়া হলাম, তাই এখানে আসিয়া বসিয়াছি। আপনিও বসুন।’

চিত্রক বলিল না, কুড়ো বসিলে দাণ্ডব'ব স'হিত সমান আসনে বসা হয়, ভূমিতে বসিলে অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করা হয়। সে কুড়োব উপর বাহু রাখিয়া দাঁড়াইল; বলিল—‘আপনার স্নগোপা সখী বোধ করি আজ আসিতে পাবেন নাই।’

‘স্নগোপা আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না—প্রভাতে একবার

মুহুর্তের জন্ত আসিয়াছিল। আপনার কত কথা বলিল। সারারাত্রি আগিয়া আপনি তাকে সাহায্য ও সাহচর্য দান করিয়াছিলেন। এমন কেহ করে না।’

‘সুগোপা আর কিছু বলে নাই?’

বট্টা ভীষণ বিষ্ময়ে চক্ষু ফিরাইলেন—‘আর কী বলিবে?’

‘না, কিছু না—’ প্রসঙ্গান্তর উত্থাপনের জন্ত চিত্রক চক্রে পানে চাহিয়া বলিল—‘আজ বোধ হয় পৌর্ণমাসী।’

‘হাঁ।’ রট্টাও কিয়ৎকাল চাঁদেব পানে চক্ষু তুলিয়া বহিলেন—‘সুনিয়াছি আধাবর্তের অন্ত্র আজিকাব দিনে উৎসব হয়—বসন্ত ঋতুর পূজা হয়। এখানে কিছু হয় না।’

‘হয় না কেন?’

‘ঠিক জানি না। পূর্বে বোধহয় হইত, এখন হুণ অধিকারের পব বন্ধ হইয়াছে। হুণদের মধ্যে বসন্ত উৎসবের প্রথা নাই। তবে বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন উৎসবের প্রথা মহাবাজ পুনঃপ্রবর্তিত কবিয়াছেন।’

এই সকল অলস কথাবার্তার মধ্যে চিত্রক দেখিল, রট্টা প্রাকারে কুড়োর উপর এমন ভাবে বসিয়া আছেন যে তাঁহাকে একটু তেলিয়া দিলে কিম্বা আপনি হইতে ভারকেন্দ্র বিচলিত হইলে তিনি প্রাকারের বাহিবে বিশ হাত নীচে পড়িবেন, মৃত্যু অনিবার্য। চিত্রকের বুকের ভিতর ত্রুট বাস্পের মতো একটা অশান্ত উদ্বেগ পাক খাইতে লাগিল। তৃতীয় ব্যক্তি এখানে নাই, রট্টা যদি পড়িয়া যান কেহ কিছু সন্দেহ কবিতো পাবিবে না। যে বর্ষ হুণ তাহার সর্বস্ব অপচরণ করিয়াছে, যাহার হস্তে তাহার পিতা নৃশংসভাবে হত হইয়াছিলেন, এই যুবতী তাহাবট কস্তা—

চিত্রকের চোখে জ্যোৎস্নার শুভ্রতা লোকিতাভ হইয়া উঠিল।

বট্টার কিন্তু নিজের সঙ্কটময় অবস্থিতির প্রতি লক্ষ্য নাই; তিনি স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে কুড়োর উপর বসিয়া আছেন। চিত্রক সহসা যেন নিজেকে

ব্যঙ্গ করিয়াই হাসিয়া উঠিল। বলিল—‘রাজকুমারি, আপনি কুড়া হইতে নামিয়া বসুন। ওখান হইতে নিম্নে পড়িলে প্রাণহানির সম্ভাবনা।’

রট্টা একবার অবহেলা ভরে নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন—‘ভয় নাই, আমি পড়িব না। কিন্তু আপনি হাসিলেন কেন?’

ক্ষোভে অধর দংশন করিয়া চিবক বলিল—‘ক্ষমা করুন, আমি কোঁতুকবশে হাসি নাই। আপনার শিল্পিক অপরিণামদর্শিতা—কিন্তু থাক। বাজনন্দিনি, যদি ধুঁটতা না হয়, একটি প্রশ্ন করিতে পারি?’

‘কি প্রশ্ন?’

‘আপনি হুণ-হুহিতা। আর্য জাতি অপেক্ষা হুণ জাতির প্রতি আপনার মূনে নিশ্চয় পক্ষপাত আছে?’

কিছুক্ষণ নীববে মনন করিয়া রট্টা ধীরে ধীরে বলিলেন—‘আর্য—! হুণ—! আমার মাতা আর্য ছিলেন, পিতা হুণ। আমি তবে কোন্ জাতি? জানি না। সম্ভবত মল্লয় জাতি।’ রট্টা একটু হাসিলেন—‘আব পক্ষপাত? দূত মহাশয়, এই আর্যভূমিতে যাহারা বাস করে তাহাদের সকলের প্রতি আমার পক্ষপাত আছে। কারণ তাহাদের ছাড়া অন্য মানব আমি দেখি নাই।’

‘সকলকে আপনি সমান বিশ্বাস করিতে পারেন?’

‘পারি। যে বিশ্বাসের যোগ্য সে আর্যই হোক আর হুণই হোক, বিশ্বাস করিতে পারি।’ রট্টা লঘুপদে কুড়া হইতে অবতরণ করিলেন—‘এবাব আমি অন্তঃপুরে ফিরিব; নহিলে আর্য লক্ষণ রূপে হইবেন।’

চিবক বলিল—‘চলুন আমি আপনার রক্ষী হইয়া বাইতেছি।’

‘আস্থন—’ বলিয়া বট্টা যেন কোন্ গোপন কোঁতুকে স্থল্লর মুখ উদ্ভাসিত করিয়া হাসিলেন; চন্দ্রালোকে সেই হাসি তরঙ্গের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

চিবক ঈষৎ সন্দেহভাবে বলিল—‘হাসিলেন কেন?’

রট্টা এবার বন্ধিম দৃষ্টিতে চটুলতা ভরিয় তাহার পানে চাহিলেন ; মুখ টিপিয়া বলিলেন—‘ও কিছু নয়। স্ত্রীলোকের হাসি-কান্নার কি কোনও অর্থ আছে ?—চলুন ।’

\* \* \* \*

পতীর রাতে রট্টা শয্যা হইতে উঠিলেন। তাঁহার শয্যার শিয়রে প্রাচীরগায়ে একটি কুটঙ্গক ছিল, তন্মধ্যে একটি মণিময় ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি থাকিত। সিংহল দ্বীপে বচিত নীলকান্তমণির অল্পপ্রমাণ এই বুদ্ধমূর্তি মহারাজ রোট্ট ধর্মানিত্য কন্ডাকে উপহার ‘দেয়া’ছিলেন।

শয্যা হইতে উঠিয়া রট্টা একটি দীপ জ্বালিলেন। ধ্যানাসীন বুদ্ধমূর্তিব সম্মুখে দীপ রাখিয়া তিনি ব্রহ্মকরে তদগতচিত্তে দীর্ঘকাল ত্র দিব্যমূর্তিব পানে চাহিয়া রহিলেন ; তাঁহার বান্ধুলি পুষ্পতুল্য অধর অঙ্গ অঙ্গ নজিতে লাগিল। তাঁহার কুমারী হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রার্থনা তথাগতের চরণে নিবেদিত হইল তাহা কেবল তথাগত জানিলেন।

তারপর দীপ নিভাইয়া রট্টা আবার শয়ন করিলেন।

\* \* \* \*

পরদিন অপরাহ্নে চষ্টন দুর্গ হইতে বার্তাবহ ফিরিয়া আসিল। মগবাজ রোট্ট ধর্মানিত্য পত্র দিয়াছেন। পত্র পাঠ করিয়া মন্ত্রী চতুরানন ভট্ট চিন্তিত মনে রট্টার কাঁছে গেলেন।

‘মহারাজের শরীর ভাল নয়, তিনি আরও কিছুকাল চষ্টন ভ্রগে থাকিবেন। কিন্তু কন্ডাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন বড় উত্তলা হইয়াছে।’

রট্টা বলিলেন—‘আমি পিতার কাছে যাইব।’

চতুরানন বলিলেন—‘কিন্তু—যাওয়া উচিত কিনা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।’



‘বাওয়া অল্পচিত কেন?’

ইতস্তত করিয়া চতুবানন বলিলেন—‘কিবাৎ লোক ভাল নয়। সে চষ্টন দুর্গের সর্বময় কর্তা, তাহাব যদি কোনও কুবুদ্ধি থাকে—’

রষ্টার মুখ বক্তবর্ণ হইল—‘কিকপ কুবুদ্ধি? আপনি কি সন্দেহ করেন, কিবাৎ পিতাকে নিজের কলে পাইবা এখন চলনা ছাবা আমাকেও কবলে আনিতে চাষ?’

‘কে বদিতে পাবে? সাবধানেব নাশ নাই।’

বষ্টা সদর্পে বলিলেন—‘আমি বিশ্বাস কবি না। মহাবাজের সহিত একপ ধষ্টতা ববিবে কিবাতের এত সাহস নাহ। আপনি ববস্থা ককন, কাল প্রাতেই আমি চষ্টন দুর্গে যাইব। পিতৃদেবকে দেখিবাব জন্মানাবও মন অস্থির হইযাছে।’

‘উত্তম।—মহাবাজ মগধেব দূতকেও চষ্টন দুর্গে আছবান কবিয়াছেন।’

বষ্টাব জোখে উপব অদৃশ্য আবরণ নামিয়া আসিল। তিনি ক্ষণেক দীর্ঘ থা কয়া গিলিলেন—‘ভাল। তিনিও আমাব সঙ্গে যাইবেন। তাহাবে সংবাদ দিন।’

চতুব বষ্টা বলিলেন—‘সঙ্গে একদল শবীর-বক্ষীও থাকিবে।—ভাষ কখা, চষ্টন দুর্গেব পথ দীর্ঘ ও ক্লেশদায়ক, পৌছিতে দুই দিন লাগিবে। ম পা ৫ চাত্রি পাঠশালায কাটাইতে হইবে। দেবতত্ত্বাব জন্ম দোলাব ববস্থা কবি?’

‘না, আমি অশ্বপুত্রে যাইব।’

‘দাদী কিঙ্গবী কেহ সঙ্গে যাইবে না?’

‘না।’

বষ্টাব নিকট হতে চতুবানন চিত্রকের কাছে গেলেন। চিত্রক সমস্ত কখা শুনিযা কিছুক্ষণ অধোমুখে বসিয়া রতিল। তাহার বক্ষে যে অদৃশ্য কুবানন জলিতেছিল তাহা সহসা গেলিহ শিখায় আলোড়িত হইয়া উঠিল

কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া উদাস নিস্পৃহ স্বরে বলিল—‘আমি এখন আপনাদের অধীন ; যাহা বলিবেন তাহাই করিব।’

পর দিবস প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রট্টা এবং চিত্রক অখারোহণে রাজপুরী হইতে বাহির হইল। এক সেনানী পাঁচজন সশস্ত্র আরোহী লইয়া সঙ্গে চলিল।

কপোতকুট নগর তখন জাগিয়া উঠিয়াছে। পথে পথে গৃহ ‘ও রিপণির দ্বার খুলিয়াছে, নাগরিকগণ ইতস্তত যাতায়াত করিতেছে ; নাগরিকারা কলসী কক্ষে জল ভরিতে যাইতেছে ; কেহবা পূজার অর্ঘ্য লইয়া দেবায়তন অভিমুখে চলিয়াছে। পথের উপর বালকবৃন্দ দল বাধিয়া ক্রীড়া করিতেছে। বৈদেহক স্বক্ষে পণ্য লইয়া ইঁকিতেছে—  
‘আয়ে লাজা—!

পুরুষবেশা রট্টা যখন অশুকুর ধ্বনিতে চারিদিক সচকিত করিয়া রক্ষীসহ রাজপথ দিয়া চলিলেন, তখন জনগণ সকলে পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সগর্বে উৎফুল্ল নেত্রে দেখিল।

পণ্য পাটকের ভিতর দিয়া যাইবার সময় রট্টা দেখিলেন, চতুপথের উপর একটা কিস্তুত-কিমাকার মানুষকে ঘিরিয়া ভিড় জমিয়াছে। লোকটা রোমশ রুক্ষকেশ তুলকায় ; অঙ্গে বস্ত্রাদি আছে কিনা ভিড়ের মধ্যে বুঝা যায় না। সে উচ্চকণ্ঠে সকলকে কী একটা কথা বলিতেছে , শুনিয়া সকলে হাসিতেছে ও রঙ্গ তামাসা করিতেছে।

রট্টা অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,  
‘ও কে ? কী বলিতেছে ?’

পথচারী রাজকন্ঠার সঙ্ঘোধনে কৃতার্থ হইয়া হাস্তমুখে বলিল—‘ও একটা গড্ডল্—বলিতেছে ও নাকি কোথাকার রাজদূত !’

চিত্রক একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই চিনিয়াছিল—শশিশেখর ! সে আর সেদিকে মুখ ফিরাইল না।

রট্টা আবার অশ্চালনা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা নগরের উত্তর ঘাটে উপস্থিত হইলেন।

এইখানে শশিশেখরের কথা শেষ করা যাক। সেইদিন সন্ধ্যাকালে নগরের কোটপাল মহী চতুৰ ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বলিলেন—  
‘একটা বিকৃতবুদ্ধি বিদেশী নগরে প্রবেশ করিয়াছে। সে বলে সে মগধের বাজদুত, কোনও এক তরুণ নাকি তাহার সৈন্য কাড়িয়া তাহাকে দিগম্বর কবিয়া মৃগয়া কাননে ছাড়িয়া দিয়াছিল।—লোকটা লতাপাতা দিয়া কোনও ক্রমে লজ্জা নিবারণ কবিয়াছে।’

চতুবানন ভ্রু কুঞ্চিত কবিয়া শুনিলেন।

‘তাবপব?’

‘নগরবক্ষীবা তাহাকে আমার কাছে ধবিয়া আনিয়াছিল। দেখিলাম, লোকটার বুদ্ধিব্রংশ হইয়াছে। কখনও এক কথা বলে, কখনও অল্প কথা বলে, কখনও বুদ্ধবুদ্ধ হইয়া ক্রন্দন করে। তাহাকে লইয়া কি কবির বৃত্তিতে না পাবিয়া কোং ঘবে বন্ধ কবিয়া রাখিয়াছি।’

চতুব ভট্ট বলিলেন—‘বেশ করিয়াছ। গর্তদাসটা একদিন আগে আসিতে পাবিল না! এখন আর উপায় নাই। আপাতত কিছুদিন লক্ষ্যকা ভ্রুণ বন্ধ, তাবপব দেখা যাইবে।’

অঃপব এ কাহিনীর সহিত শশিশেখরের আব কোনও সম্বন্ধ নাই। শুধু এইটুকু বলিবেই যথেষ্ট হইবে যে এই আখ্যায়িকা শেষ হইবার পূর্বেই সে মুক্তি পাইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে আব কখনও দেশ পর্যাটনে বাতির হইবে না প্রতিজ্ঞা কবিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিল।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### বন্ধনহীন গ্রন্থি

উত্তরাস্ত্র নগরদ্বার<sup>১</sup> অতিক্রম কবিয়া রট্টা মলবলসচ বাহিরে আসিলেন। এখানে হইতে রাজপথ মৃগয়া-কানন বেষ্টন করিয়া ভূজঙ্গ-প্রয়াত চন্দে আঁকিয়া ঝাঁকিয়া, কখনও উচে উঠিয়া কখনও নিম্নে নামিয়া য়েন নিকদেশের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। প্রভাতেব নবীন সূর্যালোকে এই দৃশ্য চিত্রাঙ্কিতব্য মনোরম দেখাইতেছে।

এই নৈসর্গিক দৃশ্যের উপর কণেক দৃষ্টি ব্লাইয়া বট্টা অশ্ব সৃষ্টি করিলেন ; সেনানীকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—‘নকুল, তুমি রক্ষীদেব লইয়া আগে যাও ; আমরা মন্বব গমনে তোমাদের পশ্চাতে বাহব।’

নকুল ঐযৎ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—‘কিন্তু—’ বট্টা বলিলেন—‘সঙ্গ আর্থ চিত্রক বর্মা থাকিবেন, আমার অস্ত্র রক্ষীর প্রয়োজন নাই। তোমরা যাও, দ্রুত অশ্ব চালাইলে দ্বিপ্রহরের মধ্যে পাণ্ডুশালায় পৌছিতে পারিবেন। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন কবিয়া চষ্টনদূর্গেব পথে বাত্রা করিও।’

এখানে নকুল আবার বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বট্টা বাধা অগ্রাহ করিয়া বলিয়া চলিলেন—‘বাত্রি এক প্রহরের মধ্যে চষ্টনদূর্গে পৌছিবেন। মহারাজকে বলিও আমি কাল আসিব। মহাবাজ্ঞ অসুস্থ, আমি আসিতেছি জানিলে সুখী হইবেন।’

ইহার পরও নকুল আপত্তি করিতে বাইতেছিল কিন্তু বট্টা তাহার মুখের পানে চাহিয়া এমন মধুর হাস্ত করিলেন যে নকুলের জ্ঞান বুদ্ধ স্তম্ভিত হইল। সে সম্বোধিতের স্তায় ‘দেবভূক্তির য়ে রূপ অস্জা’ বলিয়া সজ্জদের লইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া দিল। মন্ত্রী চতুর ভট্টের আদেশ

যদি বা উপেক্ষা করা যায়, বাঙ্গালন্দিনীসহ সহস্র নিবন্ধের প্রতিবাদ অসম্ভব।

রক্ষীস্ব দল ও তাহাদেব অশুকুরধ্বনি ক্রমশ দুব হইতে আরও দুবে মিলিয়া গেল। রট্টাও আবাসধীন মন্দগতিতে অশু চালনা কবিলেন। চিত্রক স্তাভাব পাশে বহিল।

বট্টাব মুখ উৎকুল, চক্ষু চঞ্চল। তিনি কখনও উজ্জ্বল নিম্নলুপ আকাশের পানে চক্ষু উৎসিষ্ট কবিতেন, কখনও মৃগয়া-কাননের অভ্যন্তরে কোতুলী দৃষ্টি প্রেরণ কাবিতেন, অশ্বের কঠকিঙ্কণী পদস্বপেব তালে তালে শিজনধ্বনি কবিতা স্তাভাব কর্ণে অমৃত-বৃষ্টি কবিতেনে।

চিত্রকেব মুখ কিম্ব গষ্ঠাব, দ্র কুদিত। সে তাহার অশ্বের নিভৃতোর্ধ্ব কর্ণের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। ভাবিতেনে, নিযতি বাবাব গ্রাহকে প্রতিসিংসাব স্তবোগ দহেনে। অদৃষ্টের এ কোন্ তন্ত্রি? প্রতিশোধেব স্তবোগ হাতে পায়বা সে ছাডিয়া দিবে? সিংসাব উত্তবে প্রতিসিংসা লওয়া স্তবোগেব স্বধম। তবে কেন সে লইবে না?

চার্বাদক নির্জন, কোথাও জনমানব নাহ। কদাচিত্ং চুট একটা শব্দক পথপার্শ্ব হহতে সন্দর্পণে উঠিয়া আসিতেনে, আবাব অশুকুব শব্দে জীত হহবা প্লুত গতিতে পলায়ন কাবিতেনে। পথেব উপব দীর্ঘ প্রলম্বিত তবছায়া ক্রমে হ্রস্ব হইবা আসিতেনে।

চুহটি অশ্ব পাশাপাশি চলিয়াছে। স্তবোগাব জলসত্র পিছনে পড়িয়া বহিল। স্তবোগা আজ আসে নাই। প্রপা শূন্য।

রট্টা এতক্ষণ চিত্রকেব পানে পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত কবেন নাই, মনেব মধ্যে ঈষৎ সঙ্কোচ অস্থভব কবিতেনে। আশা কবিতেনে চিত্রক নিজেই বাক্যলাপ আরম্ভ করিবে। কিন্তু চিত্রক যখন কথা কহিল না

তখন তিনি সযত্নে মনকে সম্বৃত্ত করিয়া চিত্রকের পানে স্থিতমুখ ফিরাইলেন। বলিলেন—‘আর্থ চিত্রক, আপনি নীরব কেন? স্নন্দরী প্রকৃতির এই নবীন শোভা কি আপনাকে আনন্দ দ্বিতে পারিতেছে না?’

চিত্রক রত্নার পানে চক্ষু ফিরাইল। ক্ষণেকের জন্য ‘তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। কী অপূর্ব রূপবতী এই রাজকন্যা! একটি দেহের মধ্যে কাঠিন্ত ও কোমলতা, দৃঢ়তা ও সরসতা কি অপরূপ সমাবেশ! চিত্রক পূর্বেও একবার রাজকন্যাকে পুরুষবেশে দেখিয়াছে, কিন্তু আজিকার পুরুষবেশ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেশভূষার পৌরুষ দেহের অনবদ্য নারীস্বকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, আবৃত্ত করিতে পানে নাই। পুষ্পবৃন্তের স্তায় কটিদেশ উর্ধ্ব ক্রমশ পবিসব হইয়া যেন কেশর কুসুমের শোভায় বিকশিত হইয়াছে, আপীন বক্ষের উপর দৃঢ়পিনক স্তবর্ণ জালিক যোবনের উন্মাদনাকে স্বর্ণ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সর্বোপরি তীক্ষ্ণ-মধুর মুখ-খানি। এ মুখ কেবল বক্তৃতা-মাংসের সমাবেশে স্তম্ভন নয়, শুধুই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্তম্ভ সমর্পণ নয়, মনে হয মুখের অন্তর্ভালে মাছঘটিও বড় স্নন্দর, তাই তাহার সৌন্দর্যের নিরুদ্ভূত ছটা মুখেও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

চিত্রকের অশান্ত মন কিন্তু শান্ত হইল না, বরং আবও বিগ্নুত হইয়া উঠিল। কেন এই রাজকন্যা তাহার সহিত এত মিষ্ট এত সদয় ব্যবহার করিতেছে? ইহা অপেক্ষা যদি নিজ পদগোরবে গর্ভিত হইয়া তাহাকে কুঞ্জজান করিত সেও ভাল হইত। রাজকন্যা তাহার সত্য পরিচয় জানে না বলিয়াই এমন প্রিয় ব্যবহার করিতেছে। যদি জানিত তাহা হইলে কী করিত?

চিত্রক যখন কথা কহিল তখন তাহার কণ্ঠে এই প্রশ্নেরই প্রশ্নের প্রতিধ্বনি হইল, সে রত্নার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া ধাবমান অশ্বের নিরুদ্ভূত চামর শিখার উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া গভীর মুখে বলিল— ‘রক্ষীদের আগে যাইতে দিয়া আপনি ভাল কবেন নাই।’

জ বঙ্কিম করিয়া রট্টা বলিলেন—‘তাহাতে কী দোষ হইয়াছে?’

চিত্রক বলিয়া উঠিল—‘আপনি আমার কতটুকু জানেন? আমি যদি তস্কর ছুবৃত্ত হই, আপনার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করি, কে আপনাকে রক্ষা করিবে? জানি, দেবদুহিতা বীর্ষবতী, আত্মরক্ষায় সমর্থ; তবু তিনি নারী।\* অজ্ঞাতকুলশীলকে অধিক বিশ্বাস করিতে নাই।’

অধরোষ্ঠ সঙ্কচিত করিয়া রট্টা সম্মুখ দিকে চাহিলেন; তাঁহার মুকুলিত মুখের হাসিটি ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিল না।\* ক্ষণেক পরে চিত্রকের পানে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই তিনি মৃদু-কণ্ঠে বলিলেন—‘আপনি কি অজ্ঞাতকুলশীল?’

চিত্রক চকিতে তাঁহার পানে চাহিল।

রট্টা বলিয়া চলিলেন—‘আসমুদ্র আর্গভূমির একচ্ছত্র অধীশ্বর স্বন্দগুপ্তের দৃতকে অজ্ঞাতকুলশীল বলিলে কি স্বন্দগুপ্তের অবমাননা করা হয় না? কিন্তু এ সকল বৃথা তর্ক। আপনি যদি তস্কর ছুবৃত্ত হইতেন তাহা হইলে এখন যে কথা বলিলেন তাহা বলিতে পারিতেন কি? তস্কর কি নিজের বিরুদ্ধে অস্ত্রকে সাবধান করিয়া দেয়?’

বদিয়া রট্টা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। চিত্রকের ইচ্ছা হইল, সে রট্টাকে নিজের পূর্ব পরিচয় জানাইয়া দিয়া তাহার মুখভাব নিরীক্ষণ করে। ঐ হাসিটি তখন কি অগ্নিদগ্ধ ফুলের মতই শুকাইয়া যাইবে না? অকুণ্ঠ বিশ্বাস-ভরা চোখে ত্রাস ফুটিয়া উঠিবে না?

কিন্তু চিত্রকের মনের ইচ্ছা বাক্যে পরিণত হইল না। তৎপরিবর্তে অধর প্রান্তে একটি ক্ষীণ নিপীড়িত হাসি ফুটিয়া উঠিল।

রট্টা বাললেন—‘ও কথা থাক।—আর্থ চিত্রক, আপনি নিশ্চয় অনেক দেশ দেখিয়াছেন? অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন?’

চিত্রক সতর্কভাবে বলিল—‘হাঁ। দূতীয়ালি আমার জীবনে এই প্রথম।’

বট্টা বলিলেন—‘আপনি গল্প বলুন, আমার বড় শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে।’

‘কী গল্প বলিব?’

‘আপনার বাহা ইচ্ছা। যুদ্ধেব গল্প, দেশবিদেশের গল্প। পাটলিপুত্র কি খুব সুন্দর নগর?’

‘অতি সুন্দর নগর। এমন নগর আর্থাবর্তে নাই।’

‘কপোতকূট অপেক্ষাও সুন্দর?’

চিত্রক হাসিল, বট্টাব এই বালিকা-সুন্দর সঙ্গলতা তাহার বড় মিষ্ট লাগিল। সে একটু ঘুবাইবা বলিল—‘কপোতকূটও সুন্দর নগর। কিন্তু কপোতকূট আকাবে ক্ষুদ্র, পাটলিপুত্র রহৎ, ময়ূরের সঙ্গে কি পারাবতের তুলনা হয়?’

‘আর সুন্দরগুপ্ত? তিনি কিরূপ মাহুষ?’

‘আমি সামান্য দূত, সুন্দরগুপ্তের নিকটে কখনও যাই নাই। দূর হইতে দেখিয়াছি, অতি সুন্দর পুরুষ। আব শুনিয়াছি, তিনি ভাবক—অদৃষ্টবাদী—’

বট্টা বমণীস্বলভ প্রশ্ন কবিলেন—‘তাঁহার কষটি মহিষী?’

চিত্রক বলিল—‘সুন্দর কুমাবরতধাবী, বিবাহ কবেন নাই।’

বট্টা বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন—‘আশ্চর্য!’

চিত্রক নিজের কথা ভাবিতে ভাবিত বলিল—‘আশ্চর্য বটে। কিরূপ একরূপ আশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটয়া থাকে। আমার যোদ্ধ-জীবনে আমি অনেক দেখিয়াছি।’

‘তবে সেই সব কাহিনী বলুন। আমি শুনিব।’

বট্টার আগ্রহ দেখিয়া চিত্রক একটু হাসিল। অজানিত ভাবে তাহার মনের তিক্ততা দূর হইতেছিল। মনের মধ্যে অনেক বিরুদ্ধ ভাবনা জমা হইলে মাহুষ হৃদয়-ভার লাঘব করিতে চাহে, আত্মকথা



বলিবার সুরোগ পাইলে সুর্যী হয়। চিত্রক ধীরে ধীরে নিজ জীবনে অনেক কাহিনী বলিতে লাগিল। কেবল আশ্র-পরিচয়টি গোপন করিয় আর সব সত্য কথা বলিল। বৃদ্ধেব বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নানা দেশে নানা মাহুবেবু অদ্ভুত আচার ব্যবহাব, তাগাদের বেষবাস কথাবার্তা—

এদিকে বোজা দুইটি চলিয়াছে, পথেবও বিরাম নাই। উপত্যকা ছায়ানীতল হইয়া, অধিত্যকায় ববিতপ্ত হইয়া কল্লাচিং গিবি নির্ঝরিণীঃ জলে অঙ্গ ডুবাইয়া পথ চলিবাছে। শিক্ত পথের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। বট্টা তন্নয় হইয়া গল্প শুনিতেছেন।

এ গল্প বলে এবং যে গল্প শোনে তাগাদের মধ্যে ক্রমশ মনোগত ঠেকা স্থাপিত হয়, দুইটি মন এক সুরে বাঁধা হইয়া যায়। চিত্রক গল্প বলিতে বলিতে কদাচিং সচেতন হইয়া ভাবিতেছিল—কী আশ্চর্য মনে করিতেছে আমি একান্ত আপনাব জনকে আমার জীবন কথ শুনারেওঁ! আব বট্টা—তিনি বোধঃ কিছুই ভাবিতেছিলেন না শুধু এত তাপকেব সম্ভাব মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিবাছিলেন।

দীর্ঘকাল নানা কাহিনী বলিবার পর চিত্রক বেন চমকিয়া সজাগ হইবা উঠিল, অপ্রতিভ ভাবে বলিল—‘আব না, নিজের কথা অনেক বলাচি।’

বট্টা বর্ণনেন—‘আবও বলুন।’

চিত্রক হাসিল, একটু পবিত্রাস কবিয়া বলিল—‘ব্রাহ্মকর্তাদের কি ক্ষুধা তক্ষার বালাই নাই? ওদিকে বেলা ঐত হইয়াছে তাহার সংবাদ বাথেন কি?’

বট্টা চকিতে উর্ধ্ব চাছিলেন। স্বথ মধ্য গগনে। কখন কোন দিক দিয়া সময় কাটিয়া গিয়াছে তিনি জানিতে পাবেন নাই।

বট্টা বলিলেন—‘ছি ছি, এত গল্প বলিয়া নিশ্চয় আপনাব ক্ষুধাব উদ্ভেক হইয়াছে।’

চিত্রক বলিল—‘তা হইয়াছে। আপনার?’

রট্টা সলজ্জে হাসিলেন—‘আমারও। এতক্ষণ জানিতে পারি নাই।

কিন্তু উপায় কি? সঙ্গে তো খাওয়ানো নাই।’

‘উপায় আছে। ঐ দেখুন—’ বলিয়া চিত্রক পার্শ্বের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া দেখাইল।

পাশাপাশি দুই শ্রেণী পাহাড়ের মাঝখানে অপরিসর উপত্যকা, পথটি তাহার উপর দিয়া গিয়াছে। বাম পার্শ্বের পাহাড়ে কিছু উচ্চ পাষাণগাত্রে সারি সারি কয়েকটি চতুর্কোণ রজ্জ দেখা যায়; পাথর কাটিয়া মালুকের বাসস্থান রচিত হইয়াছে। চিত্রকের অঙ্গুলি নিদেশ অনুসরণ করিয়া রট্টা দেখিলেন—একটি দেবায়তন; সম্ভবতঃ বুদ্ধের সংঘ। এখানে যে মন্দির বাস কবে তাহার প্রমাণ, একটি গবাক্ষ হইতে পীতবর্ণ বস্ত্র লঙ্ঘিত হইয়া অলস বাতাসে ছলিতেছে।

চিত্রক বলিল—‘যখন বস্ত্র আছে তখন মালুস অবশ্য আছে; মালুস থাকিলেই খাওয়া থাকিবে। স্মরণ্য আর বিলম্ব না করিয়া ঐ দিকে যাওয়াই কর্তব্য।’

রট্টা হাসিয়া সম্মতি দিলেন। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে ওখানে ওঠা যাইবে না। ঘোড়া দুটিকে একটি শম্পাকীর্ণ স্থানে ছাড়িয়া দিয়া উভয়ে পাহাড়ের চড়াই ধরিলেন।

স্থানটি উচ্চ হইলেও দুর্ভাগ্য নয়; উপরন্তু মনুষ্যপদচিহ্নিত একটি ক্ষীণ পথেরথা আছে। শিলাবন্ধুর অসমতল পর্বতগাত্র বাহিয়া চিত্রক অগ্রে চলিল; রট্টা তাহার পশ্চাতে রহিলেন।

অর্ধদণ্ড পরে উপরে উঠিয়া রট্টা দেখিলেন, সংঘই বটে; পাষাণে উৎকীর্ণ কয়েকটি কক্ষ, সম্মুখে সমতল চত্বর। চত্বরের মধ্যস্থলে ত্র্যমুখের শিলামূর্তি। উপত্যকা হইতে যে গবাক্ষগুলি দেখা গিয়াছিল তাহা সংঘের পশ্চাত্তাগ।

বট্টা প্রথমে বুদ্ধেব ধ্যানাসীন মূর্তিব সম্মুখে গিবা দাঁড়াইলেন। চিত্রকণ্ড পাশে দাঁড়াইল।

বট্টা যোড়হস্তে ভক্তিনম্র কণ্ঠে বলিলেন—‘নমো তস্ম ভগবতো অবহতো সম্মা সঙ্কস্ম।’ যুক্তকর ললাটে স্পর্শ কবিষা বট্টা চিত্রককে গিলিলেন—‘আপনিও ভগবানকে প্রণাম ককন। বলুন, নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মা সঙ্কস্ম—।’

বট্টাব অমুসবণ করিষা চিত্রক ভগবান তথাগতকে প্রণাত জানাইল, তেপব ঙ্গেৎ বিস্ময়ে বট্টাব দিকে ফিবিষা প্রশ্ন কবিল—‘আপনি এ মন্ত্র কোথায় শিখিলেন?’

বট্টা বলিলেন—‘আমাব পিতাব কাছে।’

প্রাঙ্গণে এতক্ষণ অগ্ন কেহ ছিল না, এখন প্রকোষ্ঠেব ভিতব হহতে একটি পীতবেশধারী শ্রমণ বাহির হহযা আদিলেন। মুণ্ডিত মস্তক, শীর্ণ বলেবব, মুখে প্রসন্ন বৈবাগ্যা। সহাস্ত্রে দুই হস্ত তুলিষা বলিলেন—‘আবোগ্যা।’

বট্টা বন্ধান্বল হহযা বলিলেন—‘আব, আমা দুইজন কুমার্ত পাঙ্ক, এব প্রসাদ ভিক্ষা কবি।’

ভিক্ষু বলিলেন—‘বট্টা যশোধবা, বুদ্ধ তোমাব প্রতি প্রসন্ন। এস, তোমাবা ভিতবে এস।’

ভিক্ষু তাহাকে চিনিবাছেন দোখবা বট্টাব মুখ আনন্দে উদ্দীপ্ত হহযা উঠিল। তিনি বলিলেন—‘আয় আমাকে চানিলেন কি কবিষা? পূবে কু দোখিষাছেন?’

ভিক্ষু বলিলেন—‘দেখি নাহ, তোমাব বেশভূষা হহতে অল্পমন কবিষাছি। মহাবাজ ধমাদিত্যের কাছে যাইতেছ?’

‘আজ্ঞা। এনি আমাব সহচর, মগধেব রাজদূত।’

ভিক্ষু একবাব চিত্রকের প্রতি স্মিতদৃষ্টি নিষ্কোপ কবিলেন, কিছু বলিলেন না।

অতঃপর সংস্কার প্রবেশ করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন পূর্বক পথিক দুইজন একট প্রকোশ্বে বসিলেন। ভিক্ষু তাহাদের স্নান খাণ্ড আনিয়া দিলেন, কিছু দ্বিধা সিন্ধ, কিছু সিন্ধ চিপটিক, কয়েকটি শুষ্ক ব্রাহ্মাফল ও ধর্জুর। ক্ষুধার সময়, উভয়ে পরম তৃপ্তিব সহিত তাগাই অমৃতজ্ঞানে আহার করিতে লাগিলেন।

আহারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কথোপকথন হইতে লাগিল।

বট্টা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘দেব, এখানে আপনাবা কয়জন আছেন ? আর কাহাকেও দেখিতেছি না।’

ভিক্ষু বলিলেন—‘আমরা চারিজন আছি। দুইজন বন্ধে স্নান ভবিত্তে গিয়াছেন। একজন পীড়িত।’

বট্টা মুখ তুলিলেন—‘পীড়িত ? বী পীড়া ?’

ভিক্ষু ঈষৎ হাসিলেন—‘সংসার—পীড়া। সংঘে থাকিলেও মাবেব হস্ত হইতে নিস্তার নাই।’

চিত্রক প্রশ্ন করিল—‘আপনাবা এখানে নিঃসঙ্গ থাকেন ? দিবাংগ কি করেন ?’

ভিক্ষু বলিলেন—‘সংসার তুলিবাব চেষ্টা করি।’

আচারান্তে আসন্ন করিয়া বট্টা আবার আসিয়া বসিলেন, বলিলেন—‘আর্থ, কিছু উপদেশ দিন।’

ভিক্ষু হাসিলেন—‘আমি আর কী উপদেশ দিন ?’ সহস্র বৎসর পরে শাক্যমূর্ধনির শ্রীমুখ হইতে যে বাণী নিঃসৃত হইয়াছিল তাগাই শুনি।—‘মন হইতে প্রবৃত্তিব উৎপত্তি, মন যদি প্রসন্ন নিকলুব থাকে, স্তম্ভ চাযাব মত্তো তোমাব পিছনে থাকিবে।’

বট্টা প্রশ্নাম করিয়া বলিলেন—‘আমি ধন্য।’—ভিক্ষুব পদপ্রান্তে এবটি স্বর্ণ দীনার বাখিয়া বলিলেন—‘সংঘেব অর্থ্য।’

ভিক্ষু বলিলেন—‘স্বর্থে প্রয়োজন নাই। কল্যাণি, যদি সংঘকে দান

করিত্রে ইচ্ছা কব, এক আড়ক গোবুঁম দিও। দীর্ঘকাল আমরা গোবুঁম দেখি নাই। যে শ্রমণটি অল্পস্থ তিনি গোবুঁমের জন্ত কিছু কাতব হইয়াছেন।’ বলিয়া মূহু হাসিলেন।

‘সজ্জর পাঠাইব’—বলিয়া বট্টা গাত্ৰোত্থান করিলেন।

চিত্রক দণ্ডায়মান ছিল; সে শুষ্কভাবে বলিল—‘মহাশয়, আমাকেও কিছু উপদেশ করুন।’

ভিক্ষু প্রশান্ত চক্ষু তাহার পানে তুলিয়া গস্তীরকণ্ঠে বলিলেন—‘শাক্য-মূনির উপদেশ শ্রবণ কর : “সে আমাকে গালি দিয়াছে, আমাকে প্রেহার করিয়াছে, নিঃস্ব করিয়াছে”—এই কথা যে চিন্তা করে তাহার ক্রোধ কখনও শান্ত হয় না। বৈরভাব কেবল অবৈরভাব দ্বারা শান্ত হয়, ইহাই চিরন্তন ধর্ম।’

\* \* \* \*

দুই অধারোগী আবার চলিয়াছেন। সূর্য তাহাদের বামে চলিয়া পড়িয়াছে। তির্যক অংশু তেমন তীক্ষ্ণ নয়।

উভয়ে নিঃশব্দ নিজ অন্তরে নিমগ্ন, বাক্যালাপ অধিক হইতেছে না। চন্দক গল্প বর্ণিবার কালে বট্টাব প্রতি যে ধনিষ্ঠ অন্তবক্তা অগুভব করিয়াছিল, তাহা আবার মংশয়ের কুজ্বলিকায আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভিক্ষু যে-কথা বলিলেন তাহার অর্থ কি? বৈরভাবের পরিবর্তে বৈবভাব পোষণ করাই স্বাভাবিক, অবৈবভাব কি করিয়া পোষণ করা যায়? ইহা ভিক্ষুর ধর্ম হইতে পারে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কদাচ নয়। প্রতি-হিংসা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। শুবু তাহাই নয়, ইহা চিত্রকের প্রকৃতিগত স্বধর্ম। ইহা তাহার ধাতু।

অথচ—এত স্বেযোগ পাইয়াও সে রট্টার উপর প্রতিহিংসা সাধন করিতে পারিতেছে না কেন? রট্টা সূন্দরী যৌবনবতী নারী—এই জন্ত ?

সুন্দরী নারীর মোহে সে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বিস্মৃত হইবে? পিতৃহত্যার প্রতি-  
শোধ লইবে না?

সুন্দরী মেঘাঙ্কুর আঁকাশে বিদ্যুচ্চমকের স্থায় একটি চিন্তা চিত্রকেব মনে  
খেলিয়া গেল। সে উচ্চকিত হইয়া বিস্ফাবিত নেত্রে আঁকাশের পানে  
চাহিল। কোন্ মূঢ়তার জালে তাহাব মন এতক্ষণ জড়াইয়া ছিল? এ  
কথা তাহাব মনে উদয় হইল কেন?

সে মনে মনে বলিল—আমি ক্ষত্রিয়, বৈবর্ত্য আমাব স্বধর্ম, কিন্তু বট্টাব  
সহিত বৈবর্ত্য করিব কেন? সে কামাব অনিষ্ট করে নাই। তাশাব  
পিতার অপরাধে তাণ্ডাকে দণ্ড দেওবা ক্ষত্রিয়ধর্ম নয়! যদি প্রতিশোধ  
লইতে হয় তাহার পিতাব উপল লইব।

দারুণ সমস্ভাব সমাধান হইলে হৃদয় লগ্ন হইল। মুহূর্তে চিত্রকেব অন্তবেব  
কুঞ্জবাটিকা কাটিয়া গিয়া আনন্দেব দিব্য হোতি দ্বটিয়া উঠিল। সে  
উৎফুল্ল নেত্রে বট্টাব পানে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

চকিতে স্থিত নেত্র তুলিয়া বট্টা বলিলেন— ‘কি হইয়া?’

‘চিত্রকেব বলিল—‘ভিক্ষু বলিয়াহিলেন, স্তম্ভ ছায়াব মতো আপনাব সঙ্গে  
সঙ্গে থাকিবে। ঐ দেখুন সেই ছায়া!’

বট্টা ঘাট কিরাইয়া দেখিলেন, সফাবমান চক্ষাচ ছায়া নারী ২৩  
নাচিতে স্তম্ভাব সঙ্গে চলিয়াছে।

উভয়ে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।

চাবিদিকে বিস্তীর্ণ তরঙ্গায়িত উপত্যকা। পাশাড দূবে দাঁবিয়া গিয়াছে।  
দূব হইতে স্তম্ভাদেব স্থানির গদগদ প্রতিধ্বনি ফিবিয়া আসিল। বেন মিলন  
মুহূর্তের সলজ্জ চুপিচুপি হাসি। কানে কানে হাসি।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### পাথুরশালা

চিত্রকু ও রাজকুমারী বট্টা যখন পাথুরশালায় উপনীত হইলেন তখন সন্ধ্যা হইতে আর দণ্ড দুই বাকি আছে।

দুইটি পথের সন্ধিস্থলে পাথুরশালাটি অবস্থিত। যে পথ চষ্টেন হুর্গের সাঁচত কপোতকূটের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে, এই স্থানে সেই পথ হইতে একটি শাখা বাহির হইয়া অধি-কোণে আষাঢ়ের দিকে চলিয়া গিয়াছে, দ্বিবা-ভিন্ন পথের মধ্যস্থলে প্রস্তব প্রাকারযোঁট এই পাথুরশালা।

স্থানটি মনোরম। উত্তর ও পূর্বদিকে ঘন পর্বতের শ্রেণী; পশ্চিমদিকে বহুদূর পর্যন্ত উন্মুক্ত উপত্যকা। এই উপত্যকার মধ্য দিয়া একটি উপল-কুটীলা ক্ষুদ্র নদী বহিয়া গিয়াছে; মনে হয় পূর্বদিকের পর্বতকন্দর হইতে নির্গত এক বহুস্তবর্ণ নাগ স্রবণগতিতে অস্ত্রাচনের পানে কোন নূতন বিবরের সন্ধান চৰিয়াছে।

পাথুরশালাটি আশ্রয়নে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও হুর্গের আকাঁবে নিম্নত, উচ্চ পাবাণ-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। তনালয় হইতে দূরে অবস্থিত পথপার্শ্বে পাথুরশালা নিমান কবিত্তে হইলে বেশ দৃঢ় করিয়া নিমাণ কবিত্তে হয়। একে হো এ অঞ্চলে খণ্ড বৃদ্ধাদি লাগিয়াই আছে, ন্দুপবি উত্তর-পশ্চিমের গিরিসঙ্কট মধ্যে যে সকল বন্য জাতি বাস কবে তাহারা বড়ই তদম প্রকৃতি। তাহারা মেঘ পালনের অবকাশকালে দল গিয়া, দস্যতা করে। পথে অরক্ষিত বাত্রিদল পাইলে লুটপাট করে; হ্রোণ পাইলে পাথুরশালাকেও অব্যাচতি দেয় না। তাই দ্বিবাভাগে পাথুরশালার লৌহ-কণ্টকযুক্ত দ্বার খোলা থাকিলেও সূর্যাস্তের সঙ্গে উঠা

বন্ধ হইয়া যায়। তখন আর কাহারও প্রবেশাধিকার থাকে না ; চিরাগত যাত্রীরা দ্বারের বাহিরে রাত্রি যাপন করে।

চিত্রক ও রট্টা পাছশালার তোরণমুখে উপস্থিত হইলে পাছপাল ছুটিয়া আসিয়া বোড়হস্তে অভ্যর্থনা কবিল—‘আম্বন, কুমার ভট্টাবিকা, আপনার পদার্পণে আমার স্থান পবিত্র হইল। —দূত মহাশয়, আপনিও স্বাগত। আমি ভাগ্যবান, তুমি আজ—’ বলা বাহুল্য, পাছপাল পূরেই নকুল প্রসুখাৎ সংবাদ পাঠিয়াছিল যে তাঁহা আসিতেছেন।

চিত্রক ও রট্টা অস্থ হইতে অবরোধন কবিলেন। পাছপাল ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—‘ওবে কে আছিস—কঙ্ক ডুডুভ—নীত্র কাশোজ দুটিকে মন্দুরার লইয়া যা, যব-শক্তু শালি-প্রিয়সু দিয়া সেবা কব।’

দুইজন কিঙ্কর আসিয়া অস্থ দুটির বসনা ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল। রট্টা জিজ্ঞাসা কবিলেন—‘আমার বন্ধীবা কি চলিয়া গিয়াছে?’

পাছপাল বলিল—‘আজ্ঞা হাঁ। নকুল মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল না কিন্তু কুমার ভট্টাবিকার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তাঁহা দ্বিপ্রহবেই চলিয়া গিয়াছেন।’

পাছপাল মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, স্থলভাষ্য কিন্তু নিবেট। বচনবিহ্বানে বেশ পটু। চিত্রক তাহাকে উদ্ভমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল ‘এখানে দেবদুহিতা রাত্রিযাপন কবিলে ভয়েব কোনও কারণ নাহ?’

‘ভয়! আমার পাছশালার দ্বার বন্ধ হইলে সূনিকেনবও সাব্য নাহ ভিতরে প্রবেশ করে।’ পাছপাল ঝগুঁষব হ্রস্ব কবিয়া বলিল—‘তবে ভিতরে কয়েকটি পাছ আছে। তাহা বিদেশী বণিক, পাবস্ত্রদেশ হইতে আসিতেছে; মগধে বাইবে--’

‘তাহা কি বিশ্বাসযোগ্য নব?’

‘বিশ্বাসের অযোগ্য বলিতে পারি না। ইহার বহু বৎসর ধরিয়া এত পথে গত্যাত কবিতোছে। মেনবোমের আন্তরণ গাত্রাবরণ প্রভৃতি লইয়া



আর্থাবর্তেব বিভিন্ন প্রান্তে বাণিজ্য কবিয়া বেড়ায়। তবে উহার অগ্নি-  
উপাসক, স্নেহ। সাবধানের নাশ নাই।’

‘কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন কর্তব্য?’

পাণ্ডপাল বলিল—‘তিনি দেনজুতি একথা প্রকাশ না কবিলেই চলিবে।  
ইনি আগিতেছেন তাহা আমি ভিন্ন আর কেহ জানেনা।’

‘চিত্রক দেখিল পাণ্ডপাল লোকটি চতুৰ ও প্রত্যাৎপন্নমতি, সে বলিল—  
‘ভাল।—পাণ্ডপাল, তোমার নাম কি?’

পাণ্ডপাল সবিনয়ে বলিল—‘দেবদ্বিজের রূপায় এ দাসের নাম  
জঙ্কমু। কিম্ব আঘতায়া সকলের মুখে উচ্চারণ হয় না, কেহ কেহ জঙ্ক  
বলিয়া ডাকে।’

চিত্রক হাসিয়া বলিল—‘ভাল। জঙ্ক, আমাদের ভিতরে বইয়া চণ।  
আমরা প্রান্ত হইয়াছি।’

‘জঙ্ক বলিল—‘আস্থন মহাভাগ, আস্থন দেব—। আপনাদের জঙ্ক  
শ্রেষ্ঠ দুটি বক্ষ সাজিত কবিয়া বাঁধিয়া। এদিকে কিম্ব অন্নসীধু প্রস্তুত  
হায়ে, অন্নমাংস হইবে—’

চিত্রক ও বটী প্রাকাবেব হতাসবে প্রশ্নে কবিলেন। সর্ব তখনও  
অস্থান। স্পন্দ বসে নাও, কিম্ব ভঙ্গকের আদেশে দুইজন ধাবী দ্বাব বন্ধ  
ক’বদ্য চক্রবীক আঁটিয়া দিল। কাল সর্ঘোদয় পক্ষ আব বেহ প্রবেশ  
ক’বত সাবিনে না।

বটী পূর্বে বৎনও পাণ্ডপালা দেখেন নাট, তিনি পবম কোভূলের  
‘টিও টাবিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দোখিতে দেখিতে চলিলেন। প্রাতীর  
দ্বাব পবিবৃত স্থানটি চতুষ্কোণ, তিনটি প্রাতীবের গায়ে সাবি সাবি  
প্রকোঠ, প্রকোঠগুলির সম্মুখে একটানা অপ্রশস্ত অলিন্দ। মধ্যস্থলে  
শিলাপট্টাবৃত সুপবিসর উগ্ৰকৃত অঙ্গন। অঙ্গনের কেন্দ্রেস্থলে চক্রাকতি  
বৃহৎ জলকুণ্ড।

অঙ্গনের এক কোণে কয়েকটি উঁচু ও গর্দভ রহিষাছে, তাহারা পারসিক বণিকদের পণ্যবাহক। পাবসিকেবা নিকটেই আশ্রয় বিছাইয়া বসিয়া আছে এবং নিজেদের মধ্যে বহুশ্রালাপ করিতেছে। তাহাদের মুখমণ্ডল ক্ষুধা-মগ্নিত, বর্ণ পক দাড়িঘের ছায়া, চক্ষু ও কেশ ঘনকৃষ্ণ।

বট্টা যখন চিত্রক ও জম্বুকেব সন্নিহিত তাহাদের নিকট দিয়া চাফিয়া গেলেন তখন তাহারা একবার চক্ষু তুলিয়া দেখিল, তাবপব আবার পবস্পব বাক্যালাপ কবিতে লাগিল। ইহারা নিত্যমহ নিবীচ বণিক, ছদ্মবেশী দস্যু তব্বব নয়, কিন্তু চিত্রকেব মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। নারী লইয়া পথ চলা যে বিন্দুপ উদ্বেগজনক কাজ এ অভিজ্ঞতা পূর্বে তাহাব ছিল না।

চিত্রক নিয়মবে জম্বুকেকে প্রশ্ন কবিল—‘ইহাবা বৎসন?’

জম্বুক বলিল—‘পাঁচজন।’

‘সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে?’

‘আছে। অস্ত্র না লইয়া এদেশে কেহ পথ চলা না।’

‘তোমাব ভৃত্য অল্পচব কয়জন?’

‘আমরা পুরুষ আট জন আছি।’

‘স্ত্রীদোকও আছে নাকি?’

জম্বুক হৃদয়বেব বিপবীত প্রাণে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ কবিল বিন—

‘আমাদের চাবিজন অন্তঃপূর্বিকা আছে।’

চিত্রক অনেকটা আশ্চর্য হইল।

অঙ্গনেব অগ্ন প্রাণে চাবিজন নারী বসিয়া গৃহকর্ম কবিত্তেছিল। বট্টা সেখানে গিয়া স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। চত্ববেব কিয়দংশ পার্বকৃত কবিয়া নারীগণ নৈশ ভোজনেব আযোজন কবিতেছে। একজন ঘবট ঘুরাইয়া গোখুম চর্ণ কবিতেছে, নবচূর্ণিত গোখুম হইতে

রোটিকা প্রস্তুত হইবে। দ্বিতীয়া শাক বাছিতেছে, তৃতীয়া প্রস্তুত উদ্বৃথলে স্নগন্ধি বেশাব কুট্টন কবিতেছে, চতুর্থী মেঘমাংস ছুবিকা দিয়া কাটিয়া কাটিয়া পৃথক কবিয়া রাখিতেছে। তাহাৰা মাঝে মাঝে সখম কোড়ুলপূৰ্ণ চক্ষু তুলিয়া এহ পুৰুষবেশিনী সন্দরীকে দেখিল, কিঞ্চ তাহাদেব ক্ষিপ্ৰ নিপুণ হস্তেব কাৰ্ষ শিথিল হইল না।

• বট্টা কছুক্ষণ হাঁদের মঙ্গল কমদঙ্গতা নিবিক্ষণ কবিলেন। তাবপব একটি স্তন নিঃশাস ফেলিয়া জম্বাকন দিকে 'কাবলেন--'জম্বুক, তোমাকে এবটি কাণ কবিত্তে হহবে।'

• 'সব তৎক্ষণাত বক্তৃপাণ হহল--'আজ্ঞা ববন।'

'বপোত কৃটেব পথে পবতবে উপব একটি বোদ্ধ বিহাব আহে জান কি?'

'আজ্ঞা জানি। চিনকুচ বিবাব।'

'সেখানে ভিক্ষুবে ডল ডল আতক উত্তম পোশম পাঠাহতে হহবে।'

'আতা পাঠাব। কন প্রাণেই পমতপ্যে গোখুম পাঠাইয়া দিব।'

'হুয়া বাবেব পুনেই পাঠবেন।'

'না। আশিন না দা।'

\* \* \* \*

একে ও বট্টা কছুক্ষণে কছুক্ষণে নিদিষ্ট স্থানতল তাহা আকাব ও আশনে অহাণ বক্ষ্যেব মতত, কিঞ্চ কোনেব বুট্টিমে উষ্ট্বেবোমব অক্ষয়ণ বিস্তৃ হহবাচি, তদুপবি কোমা শ্বা। কোনে পিত্তলেব দীপদণ্ডে বতি জলিত হহে। বাজকুমাৰীব পথে হুণা ডুচ্ছ আযোজন, কিঞ্চ দেখিয়া বট্টা সীত হইবেন।

অননীব সহযোগে কিছু দাঁবেব মণ্ড ভক্ষণ কবিয়া উভয়ে আপাত্ত ক্ষুৎপিপাসাৰ নিবৃত্তি কবিলেন। বাণিব আশাব বাকি বহিল।

আশাবাস্তে চিত্রক গাত্রোথান কবিয়া বট্টাকে বলিল--'আপন

এখন কিয়ৎকাল বিশ্রাম করুন।' বলিয়া রত্নার কক্ষের দ্বার ভেজাইয়া দিয়া বাহিরে আসিল।

আকাশে তখন নক্ষত্র ফুটিয়াছে, বাত্রি অন্ধকার, এখনও চল্লোদয় হয় নাই। পাছশালাব প্রাঙ্গণেব স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে। ওদিকে পারসিকেরা অঙ্গার কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া শূন্য মাংস করিতেছে, দধি মাংসের বেশাব-মিশ্র স্মৃগন্ধ ভ্রাণেশ্লিষকে লুকু কবিয়া তুলিতেছে।

চিত্রক বলিল—‘হিন্দু-পলাণ্ড-ভোজী স্নেচ্ছগুলা বাঁধে ভাল। জম্বুক, বাত্রে আমাদের ভোজনের কি ব্যবস্থা?’

জম্বুক ভোজ্য বস্তুর দীর্ঘ তালিকা দিল। প্রথমেই মিষ্টান্ন : মধু পিষ্টক লড্ডুক ও ক্ষীৰ, এরপব শাক স্নত-তড়ুল মদগ-স্বপ, ম্যব-ডিষ, সর্বশেষে রোটিকা পুবোডাশ ও তিন প্রকাব অবদংশ সত উখ্য মাংস শূন্য মাংস ও দধি।

চিত্রক সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—‘উত্তম। দেবতৃষ্ণাব বষ্ট না হয়। আর গুন, শূন্য মাংস আমি রক্ষন করিব।’

জম্বুক চক্ষু বিস্ফারিত কবিল, কিন্তু তৎক্ষণাত সায দিয়া বলিল—‘যেকপ আপনার অভিকচি।’

চিত্রক কক্ষের সম্মুখে অঙ্গনের উপব একটা স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল—‘এইখানে অঙ্গার চুল্লী বচনা কর।’

জম্বুকের আদেশে ভৃত্য আসিয়া অঙ্গাবচুল্লী বচনায প্রবৃত্ত হল। এই অবকাশে ইতস্তত পাদচাৰ্ণণা করিতে কবিত্তে চিত্রক লক্ষ্য করল, কক্ষশ্রেণী যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে একটি বংশনির্মিত নিঃশ্রেণী বক্রভাবে ছাদসংলগ্ন হইয়া বহিয়াছে। তাহার মন আবার সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। ছাদে উঠিবাব সিঁড়ি কেন? উপবে যদি কেহ লুকাইয়া থাকে? চিত্রক জম্বুককে সিঁড়ি দেখাইয়া বলিল—‘ছাদে কী আছে?’

জম্বুক বলিল—‘গুফ জালানি কাষ্ট আছে। আব কিছু নাই।’

চিত্রকের সন্দেহ ঘুচিল না; সে স্বচক্ষে দেখিবাব জন্ম নিঃশ্রেণি বাহিয়া ছাদে উঠিয়া গেল। জন্মুককে বলিল—‘তুমিও এস।’

ছাদের উপর সতাই জ্বালানি কাঠ ভিন্ন আব কিছু নাই। চিত্রক নক্ষত্রালোকে ত্রিভুজ ছাদের সর্বত্র পবিনমণ কবিত্তা নিশ্চিত হইল। ছাদের উপর মন্দ মন্দ শীতল বায়ু বহিতে আরম্ভ কবিষাছিল; চাবিনিক শব্দহীন, অন্ধকাব; কেবল গিবিনদীর্ঘ বৃকে নক্ষত্র খচিত আকাশেব প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

চিত্রক নামিবাব উপক্রম করিতেছে এমন সময় বাহিবের অন্ধকাব হইতে এক উৎকট অট্ট-কোলাহল উখিত হইয়া চিত্রককে চমকিত কবিয়া দিল। একদল গৃগাল নিকটেই কোথাও বসিয়া যাম বোষণা কবিতেছে।

গৃগালদের সম্মিলিত ক্রোশন ক্রমে শাব হইলে চিত্রক হাসিয়া উঠিল, বলিল—‘এখানে জন্মুকেব অভাব নাই দেখিতেছি।’

জন্মুক গাংসিল, বলিল—‘পৃথিবীতে জন্মুকেব অভাব কোথাষ? তবে ঋকষ বড অধিক নাই মহাশয়।’

চিত্রক বলিল—‘সেকথা সত্য। তুমি উত্তম পাছুপাল।’

এই সময় পশ্চিম দিগন্তেব পানে দৃষ্টি পড়িতে চিত্রক দেখিল, বহুদূবে চক্রবাল বেথাব নিকট যেন গাংগাডে আংগুন লাগিষাছে; আংগুন দেখা যাঠিতেছে না, কেবল তাংগাব উৎসারিত শ্রাণ দিগন্তকে বঞ্জিত কবিষাছে।

অঙ্গুতি নিদেশ কবিয়া চিত্রক তিঞ্জালা কবিল—‘উংগ কি? পাংগাডেব ঞ্দলে কি আংগুন লাগিষাছে?’

জন্মুক বলিল—‘বোংগয় না। কয়েকদিন ধরিয়া দেখিতেছি, একই ঞানে আছে। পাংগাডেব আংগুন হইলে দক্ষিণে বামে ব্যাপ্ত হইত।’

‘তবে কী? ওদিকে কি কোনও নগব আছে? কিন্তু নগব

ধাকিলেও রাতে এত আলো জলিবে কেন? ইহা তো দীপোৎসবের সময় নয়।’

‘ওদিকে নগর নাই। তবে—’

‘তবে?’

জম্বুক বলিল—‘পাশ্চাত্যদের অনেক লোক আসে যাব, অনেক কথা শুনিতো পাই। শুনিয়েছি, হুণ আবার আসিতেছে। যদি কথা সত্য হয়, আবার দেশ লণ্ডন হইবে।’ বলিয়া জম্বুক নিশ্বাস ফেলিল।

চিত্রক বলিল—‘তোমার কি মনে হয় হুণেরা এখানে ছত্রাবাস কেলিয়াছে?’

জম্বুক বলিল—‘না, তাহা মনে হয় না। হুণেরা এত কাছে আসিলে লুটপাট করিত, অত্যাচার করিত। কিন্তু এদিকে হুণ দেখি নাই।’

‘তবে কী হইতে পারে?’

‘জুনশক্তি শুনিয়াছি, সম্রাট স্বন্দগুপ্ত সৈন্যে হুণের গতিবোধ করিতে আশিয়াছেন।’

চিত্রক বিস্মিত হইয়া বলিল—‘স্বন্দগুপ্ত স্বয়ং?’

জম্বুক বলিল—‘এইরূপ শুনিয়াছি। সত্য মিথ্যা বলিতে পারব না। কেন, আপনি কিছ জানেন না?’

চিত্রক চকিতে আশ্বসংবরণ করিয়া বলিল—‘না, আমি কিছু জানি না। বুদ্ধ সন্তানবাব পূর্বেই আমি পাটলিপুত্র ছাড়িয়াছি।’

চিত্রক ও জম্বুক নীচে নামিয়া আসিল।

ভূত্যা ইতিমধ্যে অন্ধার প্রস্তুত করিয়া শূন্য মাংসের উপকরণাদি আনিয়া রাখিয়াছে। চিত্রক তাহা দেখিয়া প্রথমে গিয়া বট্টার বন্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল। কাণ পাতিয়া শুনিল, কিন্তু কিছু শুনিতো পাইল না। তখন সে দ্বার দ্বিঃ ঠেলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। দীপেব স্নিগ্ধ আলোকে রট্টা শয্যায় শুইয়া আছেন, একটি বাছ চক্ষুর উপর

শুভ। বোধহয় নিদ্রাবেশ হইয়াছে। এই নিভৃত দৃশ্য দেখিয়া চিত্রকের মন এক অপূর্ব সম্মোহে পূর্ণ হইয়া উঠিল; মৃগমদ-সৌরভের হ্রাস মাদক-মধুর রসোচ্ছ্বাসে হৃৎকুম্ভ কণ্ঠ পর্যন্ত ভরিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। মনে মনে বলিল—ঘুমাও, রাজকুমারী, ঘুমাও।

চাঁদ উঠিয়াছে। কুম্বা চতুর্থীর চন্দ্র পূর্বাচলের মাথায় উঠিয়া ক্লাস্ত হাসি হাসিতেছে। পাহাশালার অঙ্গন শূন্য, পারসিকেরা নিজ প্রকোষ্ঠে দ্বার বন্ধ করিয়াছে। অঙ্গন স্তিমিত জ্যোৎস্নায় পাণ্ডুর।

চিত্রক রট্টার দ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—দেবি উঠুন উঠুন, আহ্নার প্রস্তুত।’

দ্বার খুলিয়া রট্টা হাসিমুখে সম্মুখে দাঁড়াইলেন, ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে বলিলে,—‘ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।’

সম্মুখেই অগ্নিদে অাহারের আসন হইয়াছিল, দুইটি আসন মুখো-মুখি; মধ্যে বহু কটোর এবং স্থালীতে খাণ্ড সম্ভার। পাশে দুইটি দীপ জ্বলিতেছে। উভয়ে অাহারে বসিলেন; ওষুক দাঁড়াইয়া তৎস্বাধান করিতে লাগিল।

আগারের সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটি কথা শুইতেছে। জন্মক মাঝে মাঝে চিত্তবিনোদনের জন্ত কৌতুকজনক উপাখ্যান বলিতেছে। রাজকন্যা হাসিতেছেন; তাঁহার মুখে তৃপ্তি, চোখে নিরুদ্ধেগ প্রশান্তি। চিত্রক নিজ হৃদয় মধ্যে একটি আন্দোলন অশ্রুভব করিতেছে, যেন সাগর-তরঙ্গে তাহার হৃদয় ছলিতেছে ফুলিতেছে, উঠিতেছে নামিতেছে—

রট্টা বলিলেন—‘কাল পিতার দর্শন পাইব ভাবিয়া বড় আনন্দ হইতেছে।’

চিত্রকের মনের উপর ছায়া পড়িল। রট্টার পিতা... তাহার সহিত চিত্রকের একটা বোঝাপড়া আছে... কিস্ত সে চিন্তা এখন নয়...

চিত্রক বলিল—‘একটা জনরব শুনিলাম।—পরমভট্টারক স্বন্দগুপ্ত নাকি চতুরঙ্গ সেনা লইয়া এদেশে আসিয়াছেন।’

রট্টা চকিত চক্ষু তুলিলেন—‘স্বন্দগুপ্ত !’

চিত্রক নির্লিপ্সুস্বরে বলিল—‘হাঁ। হুণ আবার আসিতেছে, তাই মহারাজ তাহাদের গতিরোধ কবিবার জন্ত স্বয়ং আসিয়াছেন।’

রট্টা কিয়ৎকাল নতমুখে বহিলেন, তাবপব মুখ তুলিয়া বলিলেন—  
‘আপনি সম্ভবত প্রভুর সহিত মিলিত হইতে চাহেন?’

চিত্রক বলিল—‘সে পবেব কথা। আগে আপনাকে চষ্টনভূর্গে পৌছাইয়া দিয়া তবে অস্ত্র কাজ।’

রট্টা তাহাব মুখেব উপর ছায়া-নিবিড চক্ষুদুটি স্থাপন কবিয়া নিশ্চ হািলেন।

আহার সমাপ্ত হইলে রট্টা জম্বুককে বলিলেন—‘তোমাব সেবাধ আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। অন্ন ব্যঞ্জন অতি মুখবোচক হইয়াছে। দেখ, আর্থ চিত্রক কিছুই ফেলিয়া বাধেন নাই।’

জম্বুক কবতল যুক্ত কবিয়া সবিনয়ে হস্ত কবিল। চিত্রক মুহু হাসিয়া রট্টাকে জিজ্ঞাসা কবিল—‘কোন্ ব্যঞ্জন সবাপেশা মুখবোচক লাগিল?’

রট্টা বলিলেন—‘শূলা মাংস। একপ হুয়াহ রন্ধন বাজ-পাচকও পারে না।’

চিত্রক মিটিমিটি হাসিতে লাগিল, রট্টা তাহা দেখিয়া সন্দ্বিগ্ন হইলেন, বলিলেন—‘শূলা মাংস কে রাখিয়াছে?’

জম্বুক তর্জনী দেখাইয়া বলিল—‘ইনি!’

অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া রট্টা হাসিয়া উঠিলেন—  
‘আপনার তো অনেক বিজ্ঞা! এ বিজ্ঞা কোথায় শিখিলেন?’

চিত্রক বলিল—‘আমাব সকল বিজ্ঞা বেথানে শিখিয়াছি সেইখানে।’  
‘সে কোথায়?’



‘বুদ্ধক্ষেত্রে ।’

চিত্রকের মন কল্পনায় স্বন্দগুপ্তের স্বচ্ছাবারের দিকে উড়িয়া গেল।  
ঐ বেথানে দিগন্তের কাছে আলোর আভা দেখা গিয়াছিল সেখানে  
ক্রোশের পর ক্রোশ বস্ত্র-শিবির তালপত্রের ছাউনি পড়িয়াছে ;  
শিবিরের ফাঁকে ফাঁকে সৈনিকেরা আগুন জ্বলিয়াছে ; কেহ ববচূর্ণ  
মাথিয়া ছুই হস্তে স্থল রোটিকা গড়িতেছে ; কেহ ভল্লাগ্রে মাংস গ্রথিত  
করিয়া আগুনে শূলা পক করিতেছে—চীৎকার গান বাগবুদ্ধ...নির্ভয়  
মিক্‌দেগ জীবনযাত্রা...অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই...আছে কেবল নিরক্ষুশ  
বর্তমান

রট্টা চিত্রকের মুখের উপর চিন্তার ক্রীড়া লক্ষ্য করিতেছিলেন, মুহু  
হাসিয়া বলিলেন—‘বুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন ?’

চিত্রক ঐষৎ চমকিয়া বলিল—‘হাঁ। আপনি কি অন্তর্যামিনী ?’

রট্টা রহস্যময় হাসিলেন।

\* \* \* \*

বাত্রি গভীর হইয়াছে। চন্দ্র প্রায় মধ্যাকাশে।

কুমারী রট্টা আপন কক্ষে শয্যাশ্রেণী ঘূমাট্‌বা ছিলেন, একটি নিশ্বাস  
ফেলিয়া গগিয়া উঠিলেন। ঘরের কোণে দীপ জ্বলিতেছে ; জ্বলিয়া  
জ্বলিয়া শিখাটি ক্রমে ক্ষুদ্র বতুলবৎ আকার ধারণ করিয়াছে। তাহাব  
বিন্দু-প্রমাণ আলোকে ঘরের বিশেষ কিছু দেখা যাইতেছে না। শয্যায়  
উঠিয়া বসিয়া রট্টা কিয়ৎকাল ঐ আলোকবিন্দুর পানে চাহিয়া রহিলেন ;  
তারপর উঠিয়া নিঃশব্দে দ্বারের অর্গল মোচন করিলেন।

দ্বার ঐষৎ বিভক্ত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার কক্ষের সম্মুখে দ্বারের  
দিকে পিছন করিয়া অলিন্দের একটি স্তম্ভে পৃষ্ঠ রাখিয়া চিত্রক বসিয়া  
আছে। পদদ্বয় প্রসারিত, জানুর উপর মুক্ত তরবারি। তাহাব  
উর্ধ্বাখিত মুখের উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে—চক্ষু স্বপ্নাতুর—

দীর্ঘকাল এক দৃষ্টিতে দেখিয়া রট্টা আবার ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন ; ফিরিয়া আসিয়া অধোমুখে শয্যায় বস্ক চাপিষা শয়ন করিলেন । তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল ।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### চৈন পবিত্রাজক

সুৰ্যোদয়ের সঙ্গে পাত্শালার দ্বাব খুলিল ।

পারস্যক সার্থবাহ ইতিপূর্বেই উষ্ট্র গর্দভের পৃষ্ঠে পণ্যভার চাপাইয়া প্রস্তুত ছিল, তাহারা পাত্শালার শুষ্ক চুকাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল । তাহারা সাবা আর্থাবর্ত পবিনমণ কবিবে, পথপাশে আবস্তবশে বিলম্ব করিলে চলিবে না ।

চিত্রক রাত্রে ঘুমায় নাট, কিন্তু সেজগ তাহার শরীরে ত্রিলমাণ ক্লাস্তিবোধ ছিল না । সে দেখিয়া, পাত্শালা শূন্য হইয়া গিয়াছে, কিং রট্টার কক্ষদ্বার এখনও বন্ধ । রাজকুমারীর এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই । চিত্রক মনে মনে গত রাত্রির অলীক ভয় ভাবনার কথা চিন্তা কবিত্তে করিতে প্রাচীর বেষ্টনের বাহির্বে গিয়া দাড়াইল ।

নবীন রবিকরে উপত্যকা বলমল করিতেছে. তৃণ-প্রান্তে তখনও শিশিরবিন্দু শুকায় নাই । তিমার্জ ময়ুর বায়ু শরীর পুলকিত করিতেছে । চিত্রক উৎফুল্ল নেত্রে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল । আজ তাহার চোখে প্রকৃতির রঙ বন্দনাইয়া গিয়াছে ।

চারিদিক দেখিতে দেখিতে তাহার চোখে পড়িল, কাল রাত্রে যেখানে

সে আশুনের প্রভা দেখিয়াছিল সেইখানে আকাশ ও দিগন্তের সঙ্গমস্থলে অনেক পক্ষী উড়িতেছে ; আর কোনও দিকে অমন ঝাঁক বাঁধিয়া পক্ষী উড়িতেছে না । পক্ষীগুলিকে আকাশের পটে সঙ্করমান কৃষ্ণবিন্দুব স্ফার দেখাইতেছে †

চিত্রক অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল । এই সময় রত্না বাঁহিরে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইলেন । চিত্রক সগাশ্রু হৃৎতার সজিত তাঁগকে সম্ভাষণ করিল—

• ‘রাত্রে স্নানিভা হইয়াছিল ?’

রত্না তাহার মুখ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া নিম্নে নদীর পানে চাহিলেন, বলিলেন—‘হাঁ । আপনাত ?’

চিত্রক অমানবদনে বলিল—‘আমারও । খুব ঘুমাইয়াছি ।’

রত্না নদীর পানে চাহিয়া রহিলেন । আজ তাহার মনের ভাব অল্প প্রকার ; একটু চাপা, একটু অন্তর্মুখী । চিত্রকের মনোভাব কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত । সে অন্তরে এক অপূৰ্ণ প্রীতি-প্রগল্ভ উদ্দীপনা অল্পভব করিতেছে ; কোনও অজ্ঞাত উপায়ে এই রাজকুমারীর উপর তাহার যেন স্বত্বপূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে । যাহার জন্ম জাগিয়া রাত কাটাইতে হয় তাহার প্রতি সম্ভবত এইরূপ অধিকার-বোধ জন্মে ।

সে জিজ্ঞাসা করিল—‘আপনি কি যাত্রার জন্ম প্রস্তুত ?’

রত্না বলিলেন—‘আমি প্রস্তুত । কিন্তু দু’দণ্ড পরে যাত্রা করিলেও ক্ষতি নাই’—বলিয়া গিঁঠকোড়হ নির্জন পাথুশালাটির প্রতি সম্বোধন দৃষ্টিপাত করিলেন ।

চিত্রক হাসিয়া উঠিল, বলিল—‘সত্য বলুন, এই পাথুশালায় প্রতি আপনাত মমতা জন্মিয়াছে !’

রত্না স্মিতমুখে বলিলেন—‘তা জন্মিয়াছে ।—কিরিবাত পক্ষে আবার এখানে রাত্রিযাপন করিব ।’ মনে মনে ভাবিলেন,

কিরিবার সময় সঙ্গে অনেক লোক থাকিবেন...এমন রাত্রি আর হইবে কি ?

দুই একটি অল্প কথার পৰ চিত্রক পশ্চিম দিকে হস্ত প্রসারিত করিবা বলিল—‘দেখুন তো, কিড় দেখিতে পাইতেছেন ?’

রট্টা চক্ষের উপর করতলের অন্তরাল রাখিবা কিছুক্ষণ দেখিলেন—  
‘অনেক পাখী উড়িতেছে। কী পাখী ?’

চিত্রক বলিল—‘চিল্ল শকুন—’

রট্টা চকিতে চিত্রকের পানে চাভিলেন। কিন্তু এই সময় তাহাদের মনোযোগ অল্প দিকে আবৃষ্ট হইল।

পাছশালার সম্মুখে ও দুই পাশে পথের তিনটি শাখা এতক্ষণ শূচ পড়িয়া ছিল; পারসিক সার্থবাহ অনেক পূর্বেই গির্বিসকটের মধ্যে অদৃশ হইয়া গিয়াছিল; এখন উত্তর দিক হইতে কয়েকটি মানুষ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের সহিত উষ্ট্র গর্দভ নাই, কেবল কয়েকটি মানুষ অল্প বেশভূষা পরিয়া পৃষ্ঠে ঝোলা বহিবা পদব্রজে আসিতেছে।

চিত্রক বিস্মিত হইল। প্রাতঃকালে পাছশালায় যাত্রী আসে না, কোথা হইতে আসিবে? নিকটে কোথাও জনালয় নাই। তবে ইহারা কে ?

যাত্রিগণ আরও কাছে আসিলে চিত্রক দেখিল, ইহাদের বেশভূষাই শুধু অদ্ভুত নয়, আকৃতিও অদ্ভুত। ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষগুণ্ডি; মুখ বস্তুলাকাব, হনু উচ্চ, চক্ষু তির্যক। চিত্রক অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু একপ আকৃতির মানুষ কখনও দেখে নাই।

পাছশালার সম্মুখে আসিয়া পথিকদল দাঁড়াইল। চারিজন পথিক, তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ। মুখে অতি সামান্য স্ত্রু শ্মশ্রুগুচ্ছ আছে, দেহ কৃশ ও প্রমসহিষ্ণু; মুখের ভাব দৃঢ়তাব্যঞ্জক। ইনিই এই দলের নেতা সন্দেহ নাই। চিত্রক ও রট্টা পরম কৌতূহলের সহিত ইহাদের দর্শন করিতেছিলেন,

বুদ্ধও কিছুক্ষণ তাহাদের নিরীক্ষণ কবিয়া সাগ্রহে অগ্রসব হইয়া আসিগেন এবং তাঁহাদের সম্ভাষণ করিলেন।

চিত্রক ও বট্টা অংক হইয়া চাহিয়া বহিলেন। বুদ্ধের বর্গম্বব মধুব ও মদ্র, কিন্তু তাঁহাব ভাষা চিত্রক বুঝি বুঝি কবিয়াও বুঝিতে পাবিল না। যেন পবিচিত ভাষা, অথচ উচ্চারণেব বিকৃতিব জন্ম ধরা বাইতেছে না।

চিত্রক বট্টাকে হৃদয়কণ্ঠে ডিজ্জাসা কবিলেন—‘কিছু বুঝিতে পারিগেন?’

বট্টা বলিগেন—‘না। ইহাবা বোধ হব চীনদেশাব।’

চিত্রক তখন বুদ্ধকে প্রশ্ন বদিব—‘আপনাবা কে? কি চান?’

বুদ্ধ উত্তব দিগেন, কিন্তু এবাবও চিত্রব বিছু বুঝিল না। সে মাথা চুলকাইয়া শেবে জম্বুককে ডাকিল, বলিল—‘তোমাব নূতন অতিথি আসিযাছে। ইহাবা কে?’

জম্বুক নবাগতদেব দেবিযাই বলিল—‘ইহাবা চৈনিক পবিত্রাজক। এহকগ পথিক মাঝে মাঝে এই পথে আসেন।’

‘ইহাদেব ভাবা তুমি বুঝিতে পার?’

‘পারি। ইহাবা পালি ভাষাব কথা বলেন।’

‘ভাল। ডিজ্জাসা কব আমাদেব নিবট দী চান?’

জম্বুক বুদ্ধকে প্রশ্ন কবিব এবং তাঁহাব উত্তব শুনিয়া বলিল—‘তিক্ষু জানিতে চান ইনি বাজকণা বট্টা যশোধবা কিনা।’

চিত্রক সন্দেহপূর্ণ নেদে ভিক্ষুকে নিবীক্ষণ কবিয়া বলিল—‘এ প্রশ্নেব উত্তব পবে দিব, অগ্রে আমাব প্রশ্নেব উত্তব দিতে বল।’

অতঃপব জম্বুকেব মধ্যস্থতায ভিক্ষুব সহিত চিত্রকেব নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তব হইল।

চিত্রকঃ আপনি কে? কোথা হইতে আসিতেছেন?

ভিক্ষু : আমার নাম টো-ইঙ্। আমরা চীনদেশ হইতে আসিতেছি । ইহারা আমার শিষ্য ।

চিত্রক : চীনদেশ কত দূর ?

ভিক্ষু : দুই বৎসরের পথ ।

চিত্রক : কোথায যাইবেন ?

ভিক্ষু : কুলীনগর যাইব । লোকজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ যেখানে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন সেই পবিত্র স্থানে দেহরক্ষা কবিব এই আশা লইয়া চলিয়াছি । এখন বৃদ্ধের ইচ্ছা ।

চিত্রক : এই জ্ঞাত এতদূর পথ আসিযাছেন ? অত্ন কোনও উদ্দেশ্য নাই ?

ভিক্ষু : অত্ন কোনও উদ্দেশ্য নাই ।

চিত্রক : ক্ষমা করুন । আপনারা প্রাতঃকালে এখানে আসিলেন কি করিয়া ?

ভিক্ষু : আমরা অতিসামর্থী বৌদ্ধ, অন্নদান কবা আমাদের নিবেদন । কিন্তু এ পথে দস্যু তরুর আছে ; তাই আমবা বাত্রিকালে পথ চলি, দিবাত্নাগে বিশ্রাম করি । কাল বায়ে চন্দ্রাদয় হইলে যাত্রা করিয়াছিলাম ।

চিত্রক : কোথা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন ?

ভিক্ষু : চষ্টন দুর্গ হইতে ।

রত্না এতক্ষণ নীরবে শুনিহেছিলেন ; এখন চষ্টন দুর্গের নাম শুনিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া আসিলেন—‘চষ্টন দুর্গ ! তবে আমার পিতার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল !’

ভিক্ষু হাসিলেন ; বলিলেন—‘আমি অহুমান করিয়াছিলাম তুমিই রাজকন্তা রত্না যশোধরা ।...আমি তোমার পিতার নিকট হইতে কিছু বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছি । ভাবিয়াছিলাম কপোতকূট যাইতে

হইবে; ভালই হইল, পথেই তোমার দেখা পাইলাম। এখানে আমার কর্তব্য শেষ করিয়া নিজ কর্মে যাইব।’

রত্না : পিতা কী বার্তা পাঠাইয়াছেন ?

ভিক্ষু : ধর্মানিত্যের বীৰ্তা সকলের নিকট প্রকাশ্য নয়। কিন্তু যখন দ্বিভাষীর প্রমুখ্যৎ কথা বলিতে হইতেছে তখন গোপন রাখা অসম্ভব। ভরসা কবি হইতে ক্ষতি হইবে না।

রত্নার মুখে শফার ছায়া পড়িয়াছিল, তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—‘না, ক্ষতি হইবে না, আপনি বলুন।’

ভিক্ষু : ধর্মানিত্য তোমাকে এই বার্তা পাঠাইয়াছেন—তুমি কদাপি চেষ্টন দুর্গে আসিও না, আসিলে ঘোব বিপদ ঘটবে।

রত্না স্থির বিক্ষোভিত নেত্রে ভিক্ষুব পানে চাষ্টিয়া বহিলেন, তারপব ঞ্জলিত স্বরে বলিলেন—‘বিপদ ঘটবে! কিরূপ বিপদ?’

ভিক্ষু : যাত্রাব পূর্বে ক্ষণেকের জগ্ন ধর্মানিত্যের সহিত বিরলে সাগাং হইয়াছিল। দুর্গাধিপতি কিবাত অতিশয দুষ্ট। সে ছলনা দ্বারা তোমাকে চেষ্টন দুর্গে লইয়া গিয়া বলপূবক বিবাহ করিতে চায়। ধর্মানিত্যকে সে বন্দী কবিয়া বাধিয়াছে।

রত্না : পিতাকে বন্দী কবিয়া বাধিয়াছে।

ভিক্ষু : কারাগারে বন্দী কবে নাই। কিন্তু তাঁহার দুর্গ ত্যাগ করিবার অধিকার নাই, পত্র লিখিবাবও অধিকার নাই। কপোতকূটে বে পত্র গিয়াছিল তাহা ধর্মানিত্য ঞ্জছায় লেখেন নাই।

দীর্ঘ নীববতার পব রত্না চিত্রকের দিকে ফিবিলেন। তাঁহার মুখ রক্তহীন, কিন্তু চক্ষে চাপা আশ্বন। রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—‘কিরাতের যে এতদূর স্পর্ধা হইবে তাগ স্বপ্নেও ভাবি নাই। এখন কর্তব্য কি?’

চিত্রক কিছুকাল নীরব থাকিয়া ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করিল—‘মহারাজ কি কোনও অমুজ্জা দিয়াছেন?’

স্ত্রী : না। তিনি কেবল রট্টা যশোধরাকে চষ্টন দুর্গে বাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু তোমাদের কর্তব্য এই দুর্জনের হস্ত হইতে ধর্মান্দিত্যাকে উদ্ধার করা। 'কিরাত গিষ্ট কথায় ধর্মান্দিত্যকে মুক্তি দিবে না। তাহার কূট অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়াছে জানিলে সে আরও ক্রুদ্ধ হইবে ; হয় তো ধর্মান্দিত্যের অনিষ্ট করিতে পারে—

রট্টা ব্যাকুল নেত্রে চিত্রকের পানে চাহিলেন। চিত্রক শান্তভাবে বলিল—‘আপনি অধীর হইবেন না, বিপদের সময় বুদ্ধি স্থির রাখিতে হয়। মহাশয়, আপনারা পথশ্রমে পীড়িত, এখন বিশ্রাম করুন। জন্মুক, তুমি ইঁহাদের পরিচর্যা কর।’

\* \* \* \*

বে ব্যাপারে বৃদ্ধ বিগ্রহের গন্ধ আছে তাগাতে চিত্রক কখনও বুদ্ধিব্রত হয় না ; যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রবীণ সেনাপতির হ্রায় সে সমস্ত দায়িত্ব ভাব নিজ হস্তে তুলিয়া লইল।

রট্টার হাত ধরিয়া সে তাঁহাকে কক্ষে আসিয়া বসাইল। বট্টাব করতল তুবারের মত শীতল, অধর দ্রবং কম্পিত হইতেছে। নারী বাহিবে যতই পৌরুষের অভিনয় করুন, অন্তরে তিনি অবলা।

চিত্রক তাঁহার সম্মুখে বসিল এবং ধীরভাবে তাগাকে দুই চারিটি প্রশ্ন করিয়া কিরাত ও চষ্টন দুর্গ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবয় জানিয়া গেল। রট্টাও চিত্রকের সহিত কথা কহিতে কহিতে অনেকটা আ রুহ হইলেন।

এখন কর্তব্য কি এই প্রশ্নের উত্তরে চিত্রক বলিল—‘দুইটি পথ আছে। কিন্তু আপনি যদি কিরাতকে বিবাহ করিতে সম্মত থাকেন তাহা হইলে কোনও পথেরই প্রয়োজন নাই।’

রট্টা বলিলেন—‘কিরাতকে বিবাহ করার পূর্বে আমি আত্মঘাতিনী হইব।’



চিত্রক বলিল—‘তবে ছুই গথ। এক কপোতকুটে ফিরিয়া যাওয়া, মৈত্রদল লইয়া চষ্টনহুর্গ অবরোধ করা। যতদূর জানি মৈত্র সংগ্রহ করিতে সময় লাগিবে। চষ্টনহুর্গের সার ক্ষুদ্র হুর্গও অন্তত পাঁচশত মৈত্রের কমে অবরোধ করা অসম্ভব।’

রট্টা প্রশ্ন করিলেন—‘দ্বিতীয় পথ কী?’

চিত্রক বলিল—‘দ্বিতীয় পথ, স্বন্দগুপ্তের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করা।’

রট্টা উচ্চকিত হইয়া চাহিলেন—‘স্বন্দগুপ্ত সাহায্য দিবেন?’

চিত্রক বলিল—‘তিনি ক্ষত্রিয়-চূড়ামনি। তাঁহার শরণ লইলে তিনি অবশ্য সাহায্য করিবেন।’

‘তবে স্বন্দগুপ্তেরই শরণ লইব। তাঁহার নাম শুনিলে কিরাত ভয় পাইবে, বিরুদ্ধতা করিতে সাহস পাইবে না।’

‘তাগ সম্ভব। কিন্তু স্বন্দগুপ্তের কাছে কে যাইবে?’

‘আমি যাইব। আপনি সঙ্গে থাকিবেন।’

চিত্রক ক্ষণেক মৌন বহিল, তারপর বলিল—‘আপনি নারী, লক্ষ লক্ষ মৈত্রপূর্ণ স্বাক্ষার নারীর উপযুক্ত স্থান নয়। অবশ্য আমি সঙ্গে থাকিলে নিশেব ভয় নাই, অভিজ্ঞান অঙ্গুবীর দেখাইয়া স্বন্দের সমীপে পৌছিতে পারিব। কিন্তু একটি কথা আছে—’

‘কি কথা?’

‘সকল কথা বলার সময় নাই। কিন্তু আমি যে স্বন্দগুপ্তের দূত একথা তাঁহাকে বলা চলিবে না। আমি বিটক রাজ্যেরই একজন সেনানী, এই পারশ্চয়্য দিলেই হইবে। স্বন্দ আমাকে চেনেন না, সুতরাং কোনও গোলযোগের সম্ভাবনা নাই।’

‘কিন্তু—কেন?’

‘ওকথা এখন জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিব না।’

রত্না বলিলেন—‘আর্থ চিত্রক, আমি সম্পূর্ণ আপনার অধীন। আপনি বাহা বলিবেন তাহাই কারব।’

চিত্রক বলিল—‘আমি আপনার দাস। আপনার মঙ্গলের জন্ত বাহা কর্তব্য তাহা করিব। স্বরূপেশ্বরের শরণ লওয়াই স্থির?’

‘হঁ।’

চিত্রক উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—‘তবে উঠুন। অবিলম্বে বাত্মা কবিতে হইবে।’ দ্বার পর্বন্ত গিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল—‘একটা কথা। আপনি এমনভাবে বস্ত্র পরিধান করুন বাহাতে আপনাকে কিশোর বয়স্ক পুরুষ বলিয়া মনে হয়। ইহা প্রয়োজন।’ বলিয়া তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে বাহিব হইয়া গেল।

রত্নার মুখে ধীরে ধীরে অকণাভা ফুটিয়া উঠিল। তিনি কক্ষের দ্বাব বন্ধ করিয়া দিয়া নূতনভাবে বেশ-প্রসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

চিত্রক বাহিরে আসিয়া দেখিল, পাশেই একটি কক্ষে চৈন ভিক্ষুগণ আশ্রয় লইয়াছেন; জম্বুক তাঁহাদের পরিচর্যায় নিবৃত্ত আছে। চিত্রক তাঁহাদের নিকটে গিয়া বলিল—‘জম্বুক, ভিক্ষু মহাশয়কে আমি একটি প্রার্থ করিতে ইচ্ছা করি—মহারাজ স্বরূপেশ্ব সন্থকে তিনি কিছু জানেন কি?’

প্রার্থ শুনিয়া ভিক্ষু বলিলেন—‘জানি। স্বরূপেশ্ব হুণ দলনের জন্ত আসিয়াছেন। নিকটেই আছেন।’

চিত্রক : কোথায় আছেন ?

ভিক্ষু : এই উপত্যকার পশ্চিমে যে পর্বতশ্রেণী আছে তাহা পার হইলে আর একটি বৃহত্তর উপত্যকা আছে ; স্বরূপেশ্ব তথায় সৈন্য স্থাপন করিয়াছেন।

চিত্রক : একথা আপনি কিরূপে জানিলেন ?

ভিক্ষু : চষ্টনদুর্গে শুনিয়াছি। জনৈক সৈনিক মৃগয়ায় গিয়াছিল, সে দেখিয়া আসিয়াছে।

চিত্রক তখন ভিক্ষুকে সাধুবাদ কবিয়া জম্বুককে আত্মদে ডাকিয়া  
আনিল, বলিল—‘জম্বুক, আমবা স্থিব কবিয়াছি স্কন্দগুপ্তের শিববিবে যাইব ।’

জম্বুক বলিল—‘সে ভাল কথা ।’

চিত্রক বলিল—‘তোমাকে কপোতকুটে বাইতে হইবে । মন্ত্রী চতুব  
ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিবে । তারণব তিনি  
যাহা ভাল হয় করিবেন ।’

‘যথা আজ্ঞা ।’

‘এখন আমাদের অশ্ব আনিতে বল । এই বেলা বাত্রা কবিলে হর্বাশ্বের  
পূর্বে স্কন্দগুপ্তের শিববিবে পৌছিতে পারিব ।’

জম্বুক অশ্ব আনিতে গেল । চিত্রক দিৱিয়া গিয়া বট্টাব দ্বারে করাবাত  
কবিল । বট্টা দ্বার খুলিয়া নত চক্ষু সম্মুখে দাঁড়াইলেন ।

চিত্রক দেখিল, বেশ পরিবর্তন ক’ববা বট্টাকে অন্তরূপ  
দেখাইতেছে, প্রথম যেদিন সে বট্টাকে দেখিয়াছিল সে দিনেব মতই  
তাঁহাকে সহসা নাবী বলিয়া চেনা যায় না, ভয়েব তলে রূপেব আশুন চাপা  
পড়িয়াছে । কিন্তু মস্তকে শিরঙ্গাণ নাই, বেণী শোভা পাইতেছে ।  
তাঁহাব বী হইবে ?

চিত্রক নিজ কটিকক খুলিয়া বট্টাব মাথাব উষ্ণীষ বাঁধিয়া দিল ;  
উষ্ণীষেব অন্তবালে বেনীবন্ধ ঢাকা পড়িল । চিত্রক বিচাবকের দৃষ্টিতে বট্টাব  
আপাদ-মস্তক নিবীজ্ঞণ কবিয়া গস্তীবনুখে বলিল—‘এতক্ষণে ছদ্মবেশ  
সন্তোষজনক হইয়াছে । স্কন্দেব সম্মুখে না পৌছানো পর্যন্ত ছদ্মবেশ  
আবশ্যক । যুদ্ধেত্র কীরূপ স্থান তাহা আপনি জানেন না, কিন্তু আমি  
জানি । তাই এই সাবধানতা ।’

বট্টাব চোখে জল আসিল, তিনি অবরুদ্ধ স্ববে বগিলেন—‘স্বীভাতি  
বড় জঞ্জাল ।’

চিত্রক মাথা নাড়িয়া বলিল—‘না, পুরুষ বড় জঞ্জাল ।’

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

গিরিলজ্জন

রট্টা ও চিত্রক অঞ্চলে আবেহণ করিলে জম্বুক ছুটিয়া অধিয়া চিত্রকের অশ্বাসনে একটি বনের পোড়ুনী বাধিয়া দিল। চিত্রক প্রশ্ন করিল—‘এ কী?’

জম্বুক বলিল—‘কিছু খাও। সঙ্গে থাকা ভাল। হয়তো প্রয়োজন হইবে।’

চিত্রক বলিল—‘ভাল। তুমিও আর বিলম্ব করিও না।’

জম্বুক বলিল—‘না। কিন্তু আমার অর্থ নাই, গর্দভ পৃষ্ঠে বাইতে হইবে। পৌছিতে বিলম্ব হইতে পারে।’

রট্টা জম্বুকের হস্তে একটি স্বর্ণদীনার দিয়া বলিলেন—‘তোমার পারিতোষিক। ভিক্ষুদের কথা ভুগিও না।’

জম্বুক স্বর্ণমুদ্রা সমগ্রমে ললাটে স্পর্শ করিয়া বলিল—‘আজ্ঞা, ভিক্ষুদের জন্ত গোপন লইয়া যাইব। সঙ্গে ভৃত্য থাকিবে, সে সংবে গোপন পৌছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে। আমি কপোতকূটে চলিয়া চাইব।’

অতঃপর জম্বুকেব কুমকুশলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া উভয়ে পশ্চিমদিকে অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। সম্মুখে উপত্যকা; তাহার পরপ্রান্তে পাহাড় আছে, কিন্তু এখান হইতে দেখা যায় না। সেই পাহাড় পার হইয়া সন্দগুপ্তের স্বাক্ষরে পৌছিতে হইবে।

রট্টা বায়ুকোণ হইতে নৈঋত কোণ পর্যন্ত চক্ষু ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কোন স্থানে যাইতে হইবে? দিগদর্শন হইবে কি প্রকারে?’

চিত্রক বলিল—‘ওই যে-স্থানে চিল্ল-শকুন উড়িতেছে উহাই আমাদের গন্তব্য স্থান। উহা লক্ষ্য করিয়া চলিলে স্কন্ধাবাবে পৌঁছিব।’

বিস্মিতা বট্টা বলিলেন—‘কি করিয়া বুঝিলেন?’

চিত্রক একটু হাসিয়া বলিল—‘অনেক দেখিয়াছি। যুদ্ধের প্রাক্কালে সৈন্য-শিবিরের মাথায় চিল্ল-শকুন ওড়ে, উহা বা বোধহয় জানিতে পারে।—স্বাস্থ্য, আব বিলম্ব নয়, আজ দ্রুত অশ্ব চালাইতে হইবে।’

দুইটি অশ্ব নদীর বাম তীরবেথা ধরিয়া ছুটিয়া চলিল। বট্টা একবার চক্ষু ফিরাইয়া পাশ্চাত্যের পানে চাহিলেন; তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভবিয়া উঠিল। মনে হইল, চির পরিচিত গৃহ ছাড়িয়া কোন অজানা নিরুদ্দেশের পথে চলিয়াছেন।

\* \* \* \*

দ্বিপ্রহবেব সূর্য মধ্যাকাশে উঠিয়াছে।

চিত্রক ও বট্টা এক বিশাল শিশুপা বৃক্ষের তলে আসিয়া অশ্ব থামাইলেন। নদীটি এখানে ঈষৎ বক্র হইয়া নৈঋত কোণে চলিয়া গিয়াছে, পরপার্শ্বের ভূমি নিম্ন-স্থল ও উচ্চ হইতে আবস্ত করিয়াছে। ইহা উপত্যকার পশ্চিমপ্রান্ত বলা যাইতে পারে।

চিত্রক চাবিদিক অবলোকন করিয়া বলিল—‘এবার নদী পার হইতে হইবে।’

বট্টা বলিলেন—‘নদীর জল যদি গভীর হয়?’

চিত্রক নদীর অর্ধঘট্ট জলের ভিতর দৃষ্টি প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—‘না, নদীগর্ভ প্রস্থবময়, শ্রোতও মন্দ, স্ত্রুৎবাং অগভীর হইবার সম্ভাবনা। যাহোক তাহা পরে পরীক্ষা করা যাইবে, আপাততঃ আহার ও বিশ্রামের প্রয়োজন।’

বট্টা যেন এই প্রস্তাবের জ্ঞান অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি অশ্ব হইতে

মাথিয়া তরুচ্ছায়ায় শম্পাসনে বসিলেন। চিত্রক অশ্বত্থটিকে বল্গা ধরিয়া নদীর তীরে লইয়া গিয়া জলপান করাইল; তারপর তাহাদের যথেষ্ট বিচরণ করিবার জন্ত ছাড়িয়া দিয়া, খাণ্ডের পোষ্টলী লইয়া রট্টার কাছে আসিয়া বসিল।

পোষ্টলি খুলিয়া দেখা গেল জম্বুক অনেক খাণ্ড দিয়াছে : যবের পিষ্টক ও তণ্ডুলের পোলিক ; কয়েকটি শত্ৰুকৃতি শর্করাকন্দ ; এক কুঞ্চি মধুক ও কিছু গুড়। চিত্রক সহাস্ত্রে বলিল—‘জম্বুক বিচক্ষণ ব্যক্তি। এত দিয়াছে যে দুই দিনেও ফুরাইবে না।’

পোষ্টলী মধ্যস্থলে রাখিয়া উভয়ে তাহা হইতে তুলিয়া তুলিয়া আহাৰ করিতে লাগিলেন। চিত্রক রট্টার প্রতি একটি সকৌতুক কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—‘খাণ্ড কেমন লাগিতেছে?’

রট্টা অর্ধস্মুদিত নেত্রে বলিলেন—‘বড় মিষ্ট।’

চিত্রক তরবারি দ্বারা শর্করাকন্দ কাটিতে কাটিতে বলিল—‘ক্ষুধায় চায় না সুখ। বৈশ্বানর জলিলে তিস্তিভী ও মিষ্ট লাগে।’

আহাৰ শেষ হইলে চিত্রক পুটুলি আবার সযত্নে বাধিয়া রাখিল। ছইজনে নদীতীরে গিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিলেন। তারপর আবার তরুচ্ছায়া তলে আসিয়া বসিলেন। রট্টা তৃপ্তির একটি নিশ্বাস কেণিয়া অজিনের স্রায় ঘন শম্পশয্যায় অর্ধ-শয়ান হইলেন।

চিত্রক জিজ্ঞাসা করিল—‘আপনার কি ক্লান্তি বোধ হইতেছে?’

‘না, আমি প্রস্তুত।’ বলিয়া রট্টা উষ্ণিবার উপক্রম করিলেন।

চিত্রক বলিল—‘স্বরা নাই। অশ্বত্থটির আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম প্রয়োজন।’

অশ্বত্থইটি ইতিমধ্যে শম্পাহরণ করিতে করিতে নদীতীর হইতে কিছু দূরে চলিয়া গিয়াছিল; অলস নেত্রে তাহাদের একবার দেখিয়া লইয়া চিত্রকও শ্রামল তৃণশয্যায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর রট্টা ধীরে ধীরে বেন আঙ্গুগতভাবে বলিলেন—‘পৃথিবীতে যদি যুদ্ধবিগ্রহ স্বার্থপরতা কুটিলতা না থাকিত !’

চিত্রক চক্ষু মুদিত করিয়া একটু হাসিল ।

বট্টা বলিলেন—‘কেন এই হিংসা ? কেন এত লোভ ? এত কাড়া-কাড়ি ? আর্থ চিত্রক, আপনি বলিতে পারেন ?’

‘চিত্রক উঠিয়া বসিল ; কিছুক্ষণ নত নেত্রে চিন্তা করিয়া বলিল—‘না । বোধহয় ইহাই মানুষ্যের নিয়তি । মানুষ বাহা চায় তাহা পাইবার অল্প উপায় জানেনা বলিয়াই যুদ্ধ করে, হিংসা করে ।’

‘কিন্তু অল্প উপায় কি নাই ?

চিত্রক ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল—‘জানিনা । হয় তো আছে—’

নদীর দিকে চক্ষু তুলিয়া চিত্রক সহসা নীরব হইল । রট্টা তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলেন, নদীর পরপারে প্রায় ত্রিশ দণ্ড দূরে একটি সুন্দর গৃহধর যুগ মদগর্বিত পদক্ষেপে আসিতেছে । নদীর কূলে আসিয়া সে জলপান কবিল, তারপর নির্ভয়ে নদী উত্তরণ কবিয়া এপারে আসিয়া উপস্থিত হইল, নদীব জল তাহাব উদর স্পর্শ কবিল না । সে বৃক্ষচ্ছায়ায় মানুষ্যের অস্তিত্ব দৃশ্য করে নাই, প্রত্যাশাও করে নাই । তীরে উঠিয়া সহসা তাহাদের দেখিতে পাইয়া নিমেষ মধ্যে অতি দীর্ঘ লক্ষ প্রদানপূর্বক বিদ্রাঘে পলায়ন করিল ।

চিত্রক হাসিয়া উঠিল । পোষ্টলী হস্তে উঠিয়া পাড়াইয়া সে বলিল—‘চলুন এবার যাত্রা করি । নদীর গভীরতা সত্বে প্রশ্নের সমাধা হইয়াছে ।’

\* \* \* \*

পশ্চিম দিগ্বলয় সুরঞ্জিত করিয়া সূর্য অস্ত যাইতেছে । চারিদিকে পাহাড় ; দীর্ঘশায়িত অশুচ পর্বত শ্রেণী, মাঝে মাঝে প্রস্তরের স্বচ্ছ উচ্চ

হইয়া আছে। পর্বত-গাত্রে সর্বত্র ববুর ও বন-বন্দরীর গুহ। এই দৃশ্যের মধ্যস্থলে অস্বাভূত চিত্রক ও রট্টা দাঁড়াইয়া।

রট্টা নীরবে চিত্রকের পানে চাহিলেন; তাঁহার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাঁহাদের পর্বত-সজ্জনের চেষ্টা বহু পথে বিপথে আবর্তিত হইয়া এই কুটিল গিরিসঙ্কটের চক্রে আবদ্ধ হইয়াছে। রাত্রি আগন্ন; গম্ভব্য স্থান এখনও সূদূরী পরাহত।

এই সময় দুরাগত দুন্দুভির ডিঙিম শব্দ তাঁহাদের কর্ণে আসিল; শব্দ নয়, স্থির বায়ুমণ্ডলে একটা অস্পষ্ট স্পন্দন মাত্র। চিত্রক উৎকর্ণ হইয়া শুনিল; তারপর রট্টার দিকে ফিরিবা বলিল—‘স্বন্ধাবারে সন্ধার ভেদী বাজিতেছে! শুনিলেন?’

রট্টা বলিলেন—‘হাঁ। এখান হইতে কতদূর অল্পমান হয়?’

চিত্রক ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিল—‘সিধা আকাশ পথে অন্তত এক ঘোজন। আজ স্বন্ধাবারে পৌছানো অসম্ভব।’

‘তবে—?’

চিত্রক চারিদিকে চাহিল।

‘এই স্থানেই রাত্রি কাটাইব। এখানে জল আছে।’ বলিয়া সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

কিছু দূরে নয় পর্বত গাত্র প্রাচীরের ছায় উর্ধ্বে উঠিয়াছে; তাহাৎ অঙ্গ বহিয়া ক্ষীণ ধারায় জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

‘আন্ন, আলো থাকিতে থাকিতে রাত্রির জগ্ন একটা আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া লইতে হইবে।’ বলিয়া চিত্রক অঙ্গ চালাইল।

গিরি-স্রুত জলধারা যেখানে সঞ্চিত হইয়াছে তাহার চারিপাশে তৃণ জন্মিয়াছে। চিত্রক ও রট্টা অশ্বজুটিকে এই স্থানে ছাড়িয়া দিয়া পদব্রজে এই পর্বত স্বন্ধের পাদমূলে ইতস্তত খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন। অল্প দূর গিয়া একটি গুহা দেখা গেল। ঠিক গুহা নয়, দুইটি বিশাল পাথর খণ্ড



শরম্পরেব অন্ধে হেলিয়া পড়িয়া অধোদেশে ক্ষুদ্র একটি কোটর রচনা করিয়াছে। পর্বতের তুলনায় কোটর ক্ষুদ্র হইলেও দুইটি মাছুর তাহাব মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাজি বাপন করিতে পাবে। রঞ্জগুণ ক্ষুদ্র বটে কিন্তু ভিতরে বেশ পরিসরন।

গুহা মধ্যে প্রবেশ কবিয়া বট্টা মানন্দে বলিয়া উঠিলেন—‘এই তো ক্ষুদ্র গৃহ পাওয়া গিয়াছে।’

চিত্রক হাসিল—‘স্বন্দব গৃহই বটে! আদিম যুগেব মানব মানবী বোধ কবি এমনই গৃহে বাস করিত। বাহোক, মুক্ত আকাশেব তলে রাজি-খাপন অপেক্ষা এ ভাল। আগনি অপেক্ষা কবন।’ বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া অশ্বেব পৃষ্ঠ হইতে কদলাসন দুইটি নহা আসিল, বট্টাব পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিল, ‘আপনি গৃহেব সাজসজ্জা কবন, আমি অল্প চেষ্টা করিতেছি।’

দিনের আলো ক্ষত ফুবাঁইয়া আসিতেছে। চিত্রক স্বরিতে বর্ব্ব-গুণ ও বদবী বনেব মধ্য হইতে শুদ্ধ শাখাপত্র কুড়াইয়া আনিয়া গুহাব ভিতর জমা কবিতো লাগিল। এইরূপে শুদ্ধ পত্র ও কাষ্ঠের স্তূপ প্রস্তুত হইলে সে একখণ্ড প্রস্তবেব উপর তববাবিব লৌহ পুনঃপুন আঘাত কবিয়া অগ্নি উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইল।

কিছুক্ষণ মত্বনের পব অগ্নি জলিল, চড়্-চড়্-পট্ পট্ শব্দ কবিয়া শুদ্ধ শাখাপত্র জলিতে লাগিল।

বট্টা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন—‘আমাদেব অভাব কি? অগ্নি-দেবতাও উপস্থিত!’ বলিযাই তিনি সহসা লজ্জাষ বক্তয়ুথী হইয়া উঠিলেন।

অগ্নির দুই পাশে দুইটি কদম পাতিয়া চিত্রক বলিল—‘আপনি বসুন, আমি অল্প ছুটির ব্যবস্থা করিয়া আসি।’

চিত্রক বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তখন দিবা-দীপ্তি প্রায় নিবাপিত হইয়াছে।

রট্টা প্রোঙ্কন অগ্নিশিখার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, জীবন কী অদ্বুত, কী ভয়ঙ্কর, কী সুন্দর! এতদিন তিনি কেবল বাঁচিয়া ছিলেন, আজ প্রথম জীবনের স্বাদ পাইলেন।

চিত্রক ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, রট্টা মস্তক হইতে উষ্ণীয় মোচন করিয়াছেন। অগ্নিশিখার চঞ্চল আলোকে ছদ্মবেশমুক্ত সুন্দর স্কুমার মুখখানি দেখিয়া চিত্রকের চিত্ত ক্ষণকালের জন্ত যেন স্কুলিকের মত চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ মনকে সংহত করিয়া সহজভাবে বলিল—‘যোড়া দুটিকে বসুগা খুদিয়া ছাড়িয়া দিলাম। এদিকে যদি ঋপদ থাকে—সন্তবত নাই—তাহারা পলাইয়া আশ্রয়লা করিতে পারিবে।’

ঋপদ! এই পার্বত্য বনানীর মধ্যে ঋপদ থাকিতে পারে একথা রট্টার মনে আসে নাই।

চিত্রক রট্টার সম্মুখে থাকের পুঁটুলি রাখিয়া বলিল—‘এইবার আহার।’

দুইজনে এক কথনাসনে সিয়া আহার আরম্ভ করিলেন। পিষ্টক পৌলিক কিছু অবশিষ্ট ছিল চিত্রক সেগুলি রট্টাকে দিয়া নিজে শুষ্ক চণক চিবাইতে লাগিল। রট্টা তাহা দক্ষ্য করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া মুহু হাসিলেন; কিন্তু বলিলেন না। তিনিও দুই চারিটি চণক লইয়া মুখে দিলেন।

কিছুক্ষণ নীরবে আহার চলিবার পর চিত্রক বলিল—‘আপনার এই হৃদস্পার জন্ত আমি বড় কুষ্ঠাবোধ করিতেছি।’

রট্টা বলিলেন—‘আপনার কুষ্ঠা কেন? আমি তো স্বেচ্ছায় আসিয়াছি।’

চিত্রক বলিল—‘কিন্তু আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম।’

রট্টা দৃঢ়স্বরে বলিলেন—‘অস্তায় প্রস্তাব করেন নাই। এ পর্বত যে এত দুর্গম তাহা আপনি জানিতেন না।’

চিত্রক অগ্নিতে একটি শাখাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া বলিল—‘তাহা সত্য। তবু ভয় হয়, আপনি সন্দেহ করিতে পারেন আমার কোনও ছুরভিসন্ধি আছে—’

‘আর্য চিত্রক !’ রট্টার চক্ষুহুটি দীপ্ত হইয়া উঠিল—‘আমার অন্তঃকরণ এত নীচ মনে করিবেন না।’

চিত্রক দীনকণ্ঠে বলিল—‘ক্ষমা করুন, রাজকুমারী। কিন্তু আপনার ক্রেশের নিমিত্ত হইয়া আমি প্রাণে শান্ত পাইতেছি না।’

রট্টা তেমনই উদীপ্তস্বরে বলিলেন—‘আপনি আমার ক্রেশের নিমিত্ত হন নাই। আব ক্রেশ! স্বীজাতির কিসে ক্রেশ হয় তাহা আপনি কি বুঝিবেন?’

চিত্রকেব বুক ছুরুছুরু কবিয়া উঠিল। সে আর কথা কহিল না। স্বীলোকের কিসে ক্রেশ হয়—কিসে সুখ হয়, তাহা অধম যুদ্ধজীবী কি করিয়া বুঝিবে? স্বীজাতির চরিত্র এবং পুরুষের ভাগ্য দেবতারাও জানেন না, মানুষ কোন্ ছার। কিন্তু তবু, রট্টা যশোধরা নাম্নী এই যুবতীটির চরিত্র যতই বহুস্ময় হোক, তাহা যে অনন্ত, অনিন্দ্য এবং অনবশ্য তাহাতে চিত্রকেব মনে সংশয়মাত্র রহিল না।

আছাবেব পব দুইজনে গুহার বাহিরে জলাধারে গিয়া জলপান করিলেন। চিত্রক একটি জলস্ত কাষ্ঠখণ্ড হাতে লইয়া আলো দেখাইল। বাহিরে তখন গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে ছাইয়া গিয়াছে; কেবল এখানে ওখানে কয়েকটি জ্যোতিরিক্ত নীল নেত্রানল জালিয়া কোন্ অলক্ষ্য বস্তুর সন্ধান করিয়া ফিবিতেছে।

গুহায় ফিবিয়া আসিয়া চিত্রক অবশিষ্ট কাষ্ঠগুলি অগ্নিতে সমর্পণপূর্বক বলিল—‘এইবার শয়ন।’

এক পাশে রট্টা শয়ন করিলেন, অন্য পাশে চিত্রক। মধ্যস্থলে অগ্নিদেবতা জাগ্রত রহিলেন।

শয়ন করিয়া চিত্রক চক্ষু মুদিত করিল। আজিকার এই অপক্লম পরিষ্কৃতি, রত্নার সহিত এই কোটরে দুই হস্ত ব্যবধানে শয়ন, চিত্রকের শ্রায়ুসঙলে আলোড়নের সৃষ্টি করিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার চিন্তাগুলি মস্তিষ্কের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিবার পূর্বেই ছায়াবাজির শ্রায়ু মিলাইয়া যাইতে লাগিল। দুই দিন অশ্বপুটে এবং এক রাত্রি বিনিদ্র চক্ষে ধাপন করিয়া তাহার দৌহময় শরীরেও ক্লান্তি প্রবেশ করিয়াছিল। সে অচিরায় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

\* \* \* \*

মধ্য রাত্রির পর চিত্রক জাগিয়া উঠিল। একেবারে পরিপূর্ণ চেতনা লইয়া উঠিয়া বসিল। অগ্নি নিঃশেষ হইয়া নিভিয়া গিয়াছে, চতুর্দিকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। তাহার মধ্যে চিত্রক অন্তর্ভব করিল, বট্টা আসিয়া তাহার বাহু চাপিয়া ধরিয়াছেন, তাহাব কানে কানে বলিতেছেন—‘ত্রৈ দেখুন—গুহার দ্বারের দিকে দেখুন—’

গুহামুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া চিত্রক দেখিল, অন্ধারের হায় রক্তবর্ণ দুইটি চক্ষু তাহাদের পানে চাহিয়া আছে। অন্ধকারে এই অন্ধার-চক্ষু জীবের শরীর দেখা যাইতেছে না; মাঝে মাঝে চক্ষুর পলক পড়িতেছে—

চিত্রক জানিত হিংস্র জঙ্ঘর চক্ষু অন্ধকারে রক্তবর্ণ দেখায়; সূত্রায় এই জঙ্ঘটা তরক্ষু হইতে পারে, আবার ব্যাঘ্রও হইতে পারে। বোধহয় গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস পাইতেছে না। কিন্তু ক্রমে সাহস পাইবে; রক্ত-লোলুপতার কাছে ভয় পরাজিত হইবে।

চিত্রকের দেহের পেশীগুলি শক্ত হইয়া উঠিল। রত্না তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার বাহু জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন; কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, —‘উহা কি ব্যাঘ্র?’

চিত্রক রত্নার কথার উত্তর দিল না। তৎপরিবর্তে তাহার কণ্ঠ হইতে

এক দীর্ঘ-বিকট শব্দ বাহির হইল। শব্দ এত বিকট ও ভয়ঙ্কর যে কোনও হিংস্র জন্তুর কণ্ঠ হইতে এরূপ শব্দ বাহির হয় না; অথের হেঁসা, হস্তীর ঝংহিত এবং তূর্ঘ্যনিদাদ মিশাইয়া এইরূপ ঘোর শব্দ সৃষ্টি হইতে পারে।

এই নিনাদ ধামিবার পূর্বেই গুহা-মুখ হইতে রক্তচক্ষু দুইটি সহসা অন্তর্হিত হইল, বাহিবে গুহা পত্রাদির উপর পলায়মান জন্তুব দ্রুত পদধ্বনি ক্ষণেক শুনা গেল। তারপর আশার সব নিস্তরঙ্গ।

চিত্রকেব মুখ-নিঃসৃত রোমহর্ষণ শব্দ শুনিয়া বট্টার সংজ্ঞা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। চিত্রক এখন তাঁহাকে কোমল স্বরে বলিল—‘বাজকুমারি, আর ভয় নাই, জন্তুটা পলাইয়াছে।’

বট্টা মুখ তুলিগোন। অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। রট্টা ক্ষীণস্বরে বলিলেন—‘ও কী ভয়ানক শব্দ! আপনি করিলেন?’

চিত্রক বলিল—‘হাঁ। উহাব নাম সিংহনাদ। যুদ্ধকালে ঐরূপ হুঙ্কার ছাড়িবার প্রথা আছে।’—বলিয়া লঘুকণ্ঠে হাসিল।

রট্টা একটি অতি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অঙ্গুলিগুলি নামিয়া আসিয়া চিত্রকের অঙ্গুলি জড়াইয়া লইল, তাঁহার কপোল চিত্রকের বাহুব উপর ন্যস্ত হইল।

চিত্রক উদ্গত হৃদযাবেগ দমন করিয়া বলিল—‘রাজকুমারি—’

অশ্রুটকণ্ঠে বট্টা বলিলেন—‘রাজকুমারী নয়, বলো রট্টা।’

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া চিত্রক কম্পমানকণ্ঠে বলিল—‘রট্টা!’

‘বলো, বট্টা যশেধরা।’

‘রট্টা যশোধরা।’

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর রট্টা বলিল—‘আজ অন্ধকার আমার লজ্জা ঢাকিয়া দিয়াছে তাই বলিতে পারিলাম। তুমি আমার। জন্ম-জন্মান্তরে আমি তোমার ছিলাম, এ জন্মেও তোমার। পরজন্মেও তোমার হইব।’

অন্তঃপর তাহারা পর্বতগাত্র অবরোধ করিয়া উশতাকায় নামিল। কিন্তু এখনও তাহাদের পথের প্রতিবন্ধক শেষ হয় নাই। একদল অস্বারোহী শিবির-রক্ষী আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ধরিল। কে তোমরা ? কী অভিপ্রায় ?

চিত্রক স্বন্দগুপ্তেব অভিজ্ঞান-মুদ্রা দেখাইয়া পরিচয় পাইল। তারপব আরও কয়েকবার রক্ষীরা তাহাদের গতিবোধ করিল; সাধারণ সৈনিকরা নূতন লোক দেখিয়া রঙ্গ তামাসা করিল। কিন্তু ভাগ্যবলে রট্টাকে নারী বলিয়া কেহ চিনিতে পাবিল না।

অবশেষে তাহারা স্বন্দগুপ্তের গ্রহরি-বেষ্টিত শিবির সম্মুখে উপস্থিত হইল; অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া শূলধারী প্রধান দ্বারপালের সম্মুখে দাঁড়াইল।

দ্বারপাল বলিল—‘কি চাও ?’

চিত্রক বলিল—‘ইনি বিটক রাজ্যের রাজদুহিতা কুমারী বট্টা যশোধরা—পরম ভট্টারক সম্রাট স্বন্দগুপ্তের সাক্ষাৎপ্রার্থিনী।’ বলিয়া রট্টার মস্তক হইতে উক্ষীষ খুলিয়া লইল। বন্ধনমুক্ত বিসর্পিল বেণী রট্টার পৃষ্ঠে বুটাইয়া পড়িল।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

স্বন্ধাবারে

মধ্যাহ্ন ভোজনের পব স্বন্দগুপ্ত শিবিরের একটি কক্ষে শব্দায় শায়িত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। দুইজন সম্বাহক ঠাঁহার পদসেবা করিতেছিল, একজন কিঙ্গরী চামর ঢুলাইয়া বাজন করিতেছিল। ভুক্ত, রাজ-বন্দাচরেৎ! সেকালে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রামের রীতি ছিল; রাজা হইতে আপামর সাধারণ সকলেই দ্বিপ্রহরে কিয়ৎকালের জন্ত রাজবৎ আচরণ করিতেন।

স্বন্দেব বস্ত্রাবাসে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ, তন্মধ্যে এইটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এটি মন্ত্রগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত; সেনাপতি ও অমাত্যগণের সহিত বসিয়া রাজা মন্ত্রণা করিতেন। সিংহাসনাদি কিছুই ছিলনা; ভূমির উপর শুল আস্তরণ বিস্তৃত; তত্পরি রাজার জন্ত উচ্চ গদির শব্দা। মন্ত্রণাকালে ইহাই রাজার আসন; দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের জন্ত ইহাই ঠাঁহার পালক।

কিন্তু বিধাতা বাহাকে অসামান্য কর্মভাব প্রদান করিয়াছেন তাহার বিশ্রামের সময় কোথায়? স্বন্দের তন্দ্রা থাকিয়া থাকিয়া বিদ্রিত হইতেছিল। গুপ্তচর চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া ঠাঁহার কানে কানে কথা বলিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিল। আবার কিছুক্ষণ পরে অন্য গুপ্তচর আসিতেছিল—

এইরূপ অর্ধ-তন্দ্রিত অবস্থায় স্বন্দের মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলিতেছিল—  
হুণ পঞ্চাশ কোশ উত্তরে দল বাঁধিতেছে...কোন দিকে যাইবে? এক—  
আমাকে আক্রমণ করিতে পাবে.....তাহা বোধচয় করিবে না! দুই—  
আমাকে পাশ কাটাইয়া আর্ধাবর্তের সমতল ভূমিতে নামিবার চেষ্টা করিতে

পারে……তাহা করিতে দিব না। তিন—আমাকে দক্ষিণে রাখিয়া বিটক রাজ্যটা অধিকার করিয়া বসিতে পারে…বিটক রাজ্যের রাজ্যটা হুণ……সম্মুখে শত্রু ভাল, কিন্তু পিছনে শত্রু যদি ঘাটি গাড়িয়া বসে……

দুই তিন দণ্ড এইভাবে কাটিবার পর স্বন্দের তজ্জাবে দূর হইল; তিনি শয্যা উঠিয়া বসিলেন। সখাহকদের হস্ত সঞ্চালনে বিনায় করিয়া ডাকিলেন, ‘পিপুল!’

কঙ্কের এক অক্ষকর কোণে বিপুলকায় রাজবয়স্ক পিপলী মিশ্র অঙ্ক প্রত্যয় বথেছা প্রসারিত করিয়া রাজবৎ আচরণ করিতেছিলেন, স্বন্দের আহ্বানে জাগিয়া উঠিয়া একটি প্রকাণ্ড জুস্তন ত্যাগ করিলেন। বলিলেন—‘বয়স্ক, আমি ঘুমাই নাই, চক্ষু মুদিয়া ব্রাহ্মণীর চিন্তা করিতেছিলাম।’

রাজা প্রশ্ন করিলেন—‘পিপুল, ব্রাহ্মণীর জ্ঞান কি বড়ই বিরহ-বেদনা অন্তর্ভব করিতেছে?’

‘ঠিক বিরহ নয়; তবু চারিদিক ফাঁক-ফাঁক ঠেকিতেছে।’ বলিয়া ব্রাহ্মণ রাজসমীপে আসিয়া বসিলেন।

যে কিস্করী চামর তুলাইতেছিল, রাজা তাহাকে বলিলেন—‘লহবি, বয়স্কের জ্ঞান তাষূল আনয়ন কর।’

কিস্করী চামর রাখিয়া চলিয়া গেল। লহরী নামী এই দাসীটি উত্তীর্ণ-যৌবনা কিন্তু সুদর্শনা। স্বন্দের যৌবন-কাল হইতে সে তাঁহার সেবা করিয়াছে, বৃদ্ধক্ষেত্রেও তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। রাজপরিজনদের মধ্যে লহরীই একমাত্র নারী; স্বন্দ তাহার হস্তে আপন গৃহস্থানীর সমস্ত ভাব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে তাঁহার পাড়িকা সম্মুখতা তাষূল-করকবাহিনী দেহরক্ষিণী। বৃদ্ধ শিবিরে ছায়ার ছায়ায় সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, বক্ষিণীর ছায় তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিত। স্বন্দ তাহাকে সহোদবার ছায় স্নেহ করিতেন।

পিপলী মিশ্র দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—‘কবি কালিদাস লিখিয়া-



ছেন—কিং পুনর্বসংস্থে ; মেঘ দেখিলে প্রবাসী ব্যক্তিব নাকি বড়ই কষ্ট হয় । মেঘ না দেখিয়াই আমার যেরূপ অবস্থা—’

‘তোমার কিরূপ অবস্থা ?’

‘এত সৈন্তসামন্ত বহিয়াছে, তবু মনে হয় বেন কেহ নাই । বয়স্ক, বয়স যতই বাড়িতে থাকে গৃহিণীর অভাবে দশদিক ততই শূন্য মনে হয় । কিন্তু এসকল গুট বৃত্তান্ত তুমি বুঝবে না । গৃহিণী কী বস্তু তাহা তো ইহজন্মে জানিলে না !’

• ‘গৃহিণী কী বস্তু ?’

পিপ্লনী বললেন—‘গৃহিণী সচিব : সখী প্রিয়শিক্ষা ললিতে কলাবিধৌ ।’

স্বন্দ বলিলেন—‘তোমাব অবস্থা দেখিতেছি শঙ্কাজনক, বারম্বার কালিদাস আয়ুক্তি করিতেছ । তোমাব যুদ্ধ দেখিবাব সাধ হইয়াছিল তাই সঙ্গে আনিয়াছিলাম, এমন জানিলে তোমাব ব্রাহ্মণীকেও সঙ্গে লইয়া আসিতাম ।’

‘না বয়স্ক, এই ভাল । আমার একটু ক্লেশ হহতেহে তাহাতে ক্ষতি নাই । দে যদি আসিত, এত সৈন্ত আব হাতী ঘোড়া দেখিয়া ভবেই মবিষা বাইত ।’ পিপ্লনী মিশ্র অত্রিদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিলেন, মনে হইল নিশ্বাসটি তাঁহার মূলাধাব চক্রে জমলাভ করিয়া ষট্চক্র ভেদ করিয়া বাস্তির হইয়া আসিল ।

এই সময় লহরী তাধূল কবন্ধ আনিয়া পিপ্লনী মিশ্রের অগ্রে বাধিল এবং পুনবাব চামব লইবা ব্যঞ্জন কবিতে লাগিল । তাধূল পাইয়া ব্রাহ্মণের মুখ প্রকুম্ব হহল, তিনি শঙ্কলাব সাচাদৌ গুবাক কাটিয়া স্ববং তাধূল বচনায প্রবৃত্ত হইলেন ।

স্বন্দ তখন বলিলেন—‘পিপুল, এবাব হুণেব সহিত যুদ্ধ কবাব নূতন এক পস্থা আবিস্কার করিবাছি ।’

পিপুল হুট্ট হইয়া বলিলেন—‘ভাল ভাল। পলাণ্ডুসেবী দুর্গন্ধ ছুছন্দর-  
গুলাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দাও। কী পছা বাহির করিয়াছ?’

স্বন্দ বলিলেন—‘দেখ, হুণেরা ঘোড়ার পিঠে ছাড়া যুদ্ধ করিতে  
পারেনা। কিন্তু পার্বত্য দেশে ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ ভাল হয় না! তাই  
স্থির করিয়াছি—’

পিপুল বলিলেন—‘বুঝিয়াছি, হস্তী চড়িয়া যুদ্ধ করিবে।’

স্বন্দ বলিলেন—‘তুমি একটি হস্তি-মূর্খ। আমি পদাতি দিয়া যুদ্ধ  
করিব।’

পিপুল অর্থাৎ হইয়া বলিলেন—‘পদাতি দিয়া! তবে পাল পাল  
হাতী আনিয়াছ কেন?’

স্বন্দ বলিলেন—‘হাতীও কাজে লাগিবে। কিন্তু আসল যুদ্ধ করিবে  
পদাতি।’

‘কিন্তু ইহাতে নূতন আবিষ্কার কী আছে?’

‘নূতন আবিষ্কার এই যে, পদাতিদের হাতে দ্বাদশহস্ত পরিমিত দীর্ঘ  
বংশদণ্ড থাকিবে।’

‘জ্যা! বাশ দিয়া হুণ তাড়াইবে?’

স্বন্দ হাসিলেন—‘শুধু বাশ নয়, বাশের অগ্রভাগে ভল্লের ফলক  
থাকিবে। বর্তমানে যে ভল্ল ব্যবহৃত হয় তাহার দৈর্ঘ্য মাত্র ছয় হস্ত।  
কিছু বুঝিলে?’

পিপুলী মিশ্র কিছুক্ষণ তুফীভাব অবলম্বন করিয়া শেষে মাথা  
নাড়িলেন—‘যুদ্ধবিজ্ঞায় আমার তেমন পারদর্শিতা নাই। কিন্তু তুমি যখন  
আবিষ্কার করিয়াছ তখন নিশ্চয় কিছু মানে আছে।’

স্বন্দ হতাশ হইয়া নিশ্বাস ফেলিলেন—‘কাহাকেই বা বলি!’

এই সময় দ্বারপাল আসিয়া সংবাদ দিল, বিটঙ্ক রাজ্যের রাজকন্যা এক  
অম্বচরসহ আয়ুত্মানের দর্শন ভিক্ষা করেন।

স্কন্দ ঈষৎ বিস্ময়ে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন, তাৎপর বলিলেন—  
‘বিটঙ্কের রাজকন্যা! হুণ দুহিতা! লইয়া এস।’

দ্বারপাল চলিয়া গেল। লহরী একটি স্কন্দ মন্ত্রবস্ত্রের উত্তরীয় দিয়া  
রাজার নগ্ন স্কন্দ আবৃত করিয়া দিল। পিপুল তাঁহার তাঘূল করক লইয়া  
একপাশে সরিয় বসিলেন।

অনতিকাল পরে রট্টা আসিয়া শিবির দ্বারের অগ্রে দাঁড়াইল, পশ্চাতে  
চিত্রক। রট্টার হৃদবস্ত্র দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল; সে দেখিল কক্ষের  
মধ্যস্থলে এক পুরুষ সিংহ বসিয়া আছেন। রট্টা অচ্যমান করিয়াছিল  
ভারতবর্ষের চক্রবর্তী অধীশ্বর স্কন্দ অবশ্য বয়স্ক পুরুষ হইবেন; কিন্তু  
স্কন্দের স্তম্ভের দোহে জরার করাক চিহ্নিত হয় নাই। তেজঃপুঞ্জ মুখমণ্ডল  
হইতে যৌবনের লাবণ্য বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার অন্তর্ভাব এত প্রবল যে  
শিবির প্রকোণ্ডে অন্য কেহ আছে তাহা সহসা লক্ষ্য হয়না।

অপরপক্ষে রাজা দেখিলেন, এক অপরূপ স্কন্দরী কন্যা। মনে  
হইল এক বলক বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার  
সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে চাহিয়া  
রহিলেন।

‘রট্টা স্বরিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া নতজান্ন হইল, পুটাঞ্জলি হইয়া  
বলিল—‘রট্টা যশোধরার প্রণতি গ্রহণ করুন রাজাধিরাজ।’ চিত্রকও  
রট্টার পশ্চাতে থাকিয়া রাজাকে প্রণাম করিল।

স্কন্দ হস্তের ইঙ্গিতে উভয়কে বসবার অচ্যমতি দিয়া দীর্ঘকণ্ঠে  
বলিলেন—‘রট্টা যশোধবা! তুমি বিটঙ্ক রাজের দুহিতা?’

‘হাঁ রাজাধিরাজ।’

‘হুণ কন্যা?’

‘রট্টার গ্রীবা ঈষৎ বক্র হইল। সে বলিল—‘হাঁ, আমি হুণ কন্যা।  
কিন্তু সেজন্য আমার লজ্জা নাই। আমার পিতা মহাভুব পুরুষ।’

স্বন্দেয় অধরে অল্প হাসি দেখা দিল; তিনি বলিলেন—‘তোমাকে লজ্জা দিবার জন্ত এ প্রশ্ন করি নাই। তোমাকে দেখিয়া আর্ধকচ্ছা বলিয়া মনে হয় তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।’

রট্টা বলিল—‘আমার মাতা আর্ধ ছিলেন।’

স্বন্দ বলিলেন—‘ভাল, এখন বুঝলাম। রাজা কি তোমাকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন?’

‘না মহারাজ, আমি নিজ ইচ্ছায় আসিয়াছি।’

স্বন্দেব ক্র ঙ্গে উখিত হইল; বলিলেন—‘তুমি সাহসিনী বটে। এই বিপুল সেনা-সমুদ্রে অস্ত্র কোনও নারী প্রবেশ করিতে পারিত না। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?’

রট্টা বলিল—‘উপস্থিত এক পাহাশালা হইতে। পাত পাব হইতে দুই দিন লাগিয়াছে।’

‘দুই দিন! রাজি কোথায় বাপন করবো?’

‘পর্বতের গুহায়।’

স্বন্দ প্রশ্ন-কুঞ্চিত চক্ষে রট্টাব পানে চাতিলেন। রট্টাও নির্ভীক অকপট নেত্রে রাজার পানে চাহিয়া বহিল। বাজাব চক্ষু নিমেষেব জন্ত একবার চিত্রকের মুখেব উপব গিয়া দিবিষা আসিল। তিনি বলিলেন—‘ভাল কথা, তুমি কুমারী না বিবাহিতা?’

রট্টা বলিল—‘আমি কুমারী।’ চিত্রকের দিকে নিদেশ করিয়া বলিল—‘ইনি চিত্রক বর্মা, বিটঙ্ক রাজ্যেব এক সেনানী।’

চিত্রক আবার বোড়হস্তে প্রশ্নাম করিল। অভিজ্ঞান হৃদ্বীব সে পূর্বেই কাটদেশে লুকাইয়াছিল।

স্বন্দ বলিলেন—‘তোমরা অবশ্য কোনও প্রযোজনে আমার নিকট আসিয়াছ। কিন্তু পর্বত লঙ্ঘন করিয়া তোমরা ক্লাস্ত; আজ বিশ্রাম কর, কাল তোমাদের কথা শুনিব।’

রট্টা বলিল—‘দেব, গুরুতর রাজকার্যে আপনার নিকট আসিয়াছি ;  
অগ্রে আমার বক্তব্য নিবেদন করিব, তারপর বিশ্রাম।’

স্কন্দ বলিলেন—‘ভাল ; কিন্তু তৎপূর্বে একটি কথা জানিতে ইচ্ছা করি ।  
বিটম্ব রাজ্যের নিকট পত্র দিয়া আমি এক দূত পাঠাইয়া ছিলাম । সে দূত  
কি পৌছে নাই ?’

পিপ্লগী অদূবে বসিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন, জনান্তিকে বলিলেন—  
‘শুশিশেখর—আমার ব্রাহ্মণী ব্রাতৃপুত্র।’

‘রট্টা একবার চিত্রকের দিকে কটাক্ষ করিল ; চিত্রক বলিল—‘দূতের  
কথা জানি না আয়ুধন, কিন্তু রাজকীয় পত্র পৌছিয়াছে।’

স্কন্দ বলিলেন—‘তবে পত্রের উত্তর আমি পাই নাই কেন ?’

রট্টা বলিল—‘মহারাজ আমার বক্তব্য শুনিলেই সকল কথা বুঝিতে  
পারিবেন।’

স্কন্দ শিরঃসঞ্চালনে সন্মতি দিলেন । রট্টা তখন চষ্টনহর্গ ঘটিত সমস্ত  
বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিল—‘কংল চিত্রকের দূত পরিচয় গোপন  
বাখিল । রাজা মনোযোগের সহিত শুনিলেন । বৃত্তান্ত শেষ হইলে জিজ্ঞাসা  
করিলেন—‘এই কিরাত কি হুণ ?’

রট্টা বলিল—‘হাঁ মহারাজ, আমারই মতন।’

স্কন্দ সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া বলিলেন—‘তোমার মতন অল্পই আছে ।  
তোমার শ্রায় পিতৃভক্তি কর্তব্যনিষ্ঠা সাহস অতি বিরল । কিরাতের দোষ নাই ;  
রূপে ও গুণে তুমি সকল পুরুষের লোভনীয়।’ বলিয়া মৃদু হাসিলেন ।

রট্টা নতমুখে রহিল । স্কন্দ তখন বলিলেন—‘আমি তোমার পিতাকে  
উদ্ধার করিব । আমার নিঃশঙ্ক স্বার্থ আছে।’ লহরীর দিকে ফিরিয়া  
বলিলেন—‘লহরি, গুলিক বর্মাকে ডাকিয়া পাঠাও।’

লহরী এতক্ষণ একাগ্রমনে বাক্যলাপ শুনিতেছিল এবং স্কন্দের মুগ্ধভাব  
নিরীক্ষণ কবিতোছিল । সে চামর রাখিয়া ক্ষত বাষ্টির হইয়া গেল ।

শুলিক বর্মা একজন কনিষ্ঠ সেনানায়ক এবং স্বন্দের পার্শ্বচর ; ব্যাটোরক্ বৃষক মূর্তি ; ধূমকেতুর স্নায়ু গৌক । সে আসিয়া প্রণাম করিয়া পাড়াইলে স্বন্দ প্রশ্ন করিলেন—‘শুলিক, চষ্টনভূর্গ কোথায় জানো ?’

শুলিক বলিল—‘জানি আয়ুয়ন্ । চষ্টন ভূর্গ বিটক রাজ্যের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত । এখান হইতে প্রায় বিংশ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে ।’

স্বন্দ বলিলেন—‘শোনো । চষ্টনভূর্গের ভূর্গাধিপ কিরাত বিটক রাজকে ছলে নিজ ভূর্গে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে । তুমি একশত অশ্বারোহী লইয়া কল্যা প্রত্যুষে যাত্রা করিবে । বিটক রাজ্যের এই সেনানী চিত্রক বর্মা তোমার সঙ্গে যাইবেন । তুমি ভূর্গাধিপ কিরাতকে আমার নাম করিয়া বলিবে যেন তদুৎপেই বিটকরাজকে তোমার হস্তে সমর্পণ করে । অতঃপর রাজাকে লইয়া তুমি অবিলম্বে ফিরিয়া আসিবে ।’

শুলিক বলিল—‘বথা আজ্ঞা । যদি কিরাত রাজাকে সমর্পণ কবিত্তে সম্মত না হয় ?’

‘তাহাকে বলিও—আদেশ উপেক্ষা করিলে সহশ্র রণহস্তী লইয়া আমি স্নয়ং গিয়া তাহার ভূর্গ সমভূমি কবিব ।’

‘আজ্ঞা । যদি তাহাতেও ভয় না পায় ?’

‘তখন আমার কাছে দূত পাঠাইবে । উপস্থিত চিত্রক বর্মাকে তোমার শিবিরে লইয়া যাও, উত্তমরূপে অতিথি সংকার কর ।’

চিত্রক একটু ইতস্তত করিল, কিন্তু স্বন্দের আদেশ অলঙ্ঘনীয় । সে রট্টার প্রতি একবার পশ্চাদ্গষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শুলিক বর্মার সহিত প্রস্থান করিল ।

চিত্রককে চলিয়া যাইতে দেখিয়া রট্টার মনে ঈষৎ শঙ্কার উদয় হইল । কিন্তু সে তাহা দমন পূর্বক অল্প হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—‘আর আমি ? আমি কি চষ্টন ভূর্গে যাইব না ?’

স্বন্দ মাথা নাড়িয়া বলিলেন—‘না । তুমি আমার শিবিরে থাকিবে ।

তুমি রাজকন্যা ; অনেক বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া আমার কাছে আসিয়াছ ।  
আবার তোমাকে বিপদের মুখে পাঠাইব না ।’

রত্না বলিল—‘দেব, আপনার অসীম করুণা । কিন্তু—’

স্বন্দ বলিলেন—‘রত্না বশোধরা, ভয় করিও না । তুমি তোমার পিতাব  
প্রাসাদে বেকপ নিবাপদে থাকিতে আনাব শিবিরে তদপেক্ষা অধিক  
নিবাপদে থাকিবে ।—লহরী, রাজকন্যাকে লইয়া যীও । উনি পথশ্রান্ত ;  
তোমার উপর মাননীয়া অতিথিব পবিচর্যা ভার রহিল ।’

ইহা পব রত্নার মুখে আর আপত্তিব কথা যোগাইল না । লহরী  
তাঁহাব পাশে আসিয়া শিঙ্কস্বরে বলিল—‘আজ্ঞন কুমাৰ ভট্টারিকা ।’

লহরী বট্টাকে লইয়া প্রস্থান করিলে পিঙ্গলী মিশ্র জাগ্র সাহায্যে বাজার  
পাশে আসিয়া বসিলেন, তাঁহাব কানে কানে বলিলেন—‘বয়স্ক, কেমন  
দেখিলে ?’

স্বন্দ মুদুহাস্তে বলিলেন—‘অপূব ।’

পিঙ্গলী বলিলেন—‘তবে আঁব বিলম্ব করিও না । যদি গার্হস্থ্য ধম অবলম্বন  
কবিত্তে চাও, এই সুর্যোগ । গৃহিণী সচিবঃ সখী—এমনটি আঁব পাইবে না ।’  
স্বন্দ স্মিতমুখে নাঁবব বহিলেন ।

\* \* \* \*

নৈশ ভোজনের পব বাত্রি প্রথম প্রহরে চিত্রক বট্টার সচিত্ত সাক্ষাৎ  
কবিত্তে আসিল । প্রত্যুষে বাত্রা কবিত্তে হইবে ।

কক্ষ আর কেহ ছিল না , দীপমণ্ডে শিঙ্ক জ্যোতি বর্তিকা জলিত্তেছিল ।  
রত্না আসিয়া চিত্রকেব হাত ধবিবা দাঁড়াইল, বলিল—‘আমি তোমাব সঙ্গে  
বাইতে পাহলাম না ।’

নিম্নস্ববে কথা হইতে লাগিল । চিত্রক বলিল—‘এট ভাল । এখানে  
তুমি নিরাপদে থাকিবে ।’

রট্টা বলিল—‘তুমি কাছে না থাকিলে আর নিরাপদ মনে হয় না।’

চিত্রক রট্টার স্বকের উপর হাত রাখিল—‘রট্টা, লক্ষ্য করিয়াছ কি, স্বন্দ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।’

চিত্রকের মুখের কাছে মুখ আনিয়া রট্টা বলিল—‘লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাতে ভালই হইবে।’

‘সে তুমি জানো।’ চিত্রক রট্টার স্বক হইতে হাত নামাইয়া লইল।

রট্টা বলিল—‘হাঁ, আমি জানি। আমার মন আমি জানি।’

‘তবে আজ চলিলাম। আবার কবে দেখা হইবে, দেখা হইবে কিনা জানি না।’

‘তুমি নিশ্চিত থাকো। আবার শীঘ্রই দেখা হইবে।’

চিত্রকের মনে কিন্তু কাঁটা ফুটিয়া রহিল। চতুঃসাগরা পৃথীর একচ্ছত্র অধীশ্বর, তাঁহার একমাত্র মহিষী—এ প্রলোভন কোন্ নারী ছাডিতে পারে? কিন্তু সে মুখে কিছু প্রকাশ করিল না; আরও দুই চাবিটি কথার পর রট্টার নিকট বিদায় লইল। মনে মনে ভাবিল, এই বুঝি শেষ সাক্ষাৎ।

অতঃপর রট্টা শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। কিঞ্চৎকাল শূন্যে চক্ষু মেলিয়া থাকিবার পর দেখিল, দাসী লহরী নিঃশব্দে পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। লহরী মূহুর্তে বলিল—‘দেবি, আপনার পদ-সম্বাহন করিয়া দিই?’

রট্টা স্মিতমুখে বলিল—‘তুমি অনেক সেবা করিয়াছ। আর প্রয়োজন নাই।’

লহরী বলিল—‘সে কি কথা। আমি পদসেবা করি, আপনি ঘুমান। আপনি ঘুমাইলে আমিও আপনার পদতলে ঘুমাইব।’

রট্টা বৃক্ষিল, এই কক্ষটি এবং এই শয্যা লহরীর; যে বস্ত্র রট্টা পরিধান করিয়াছে তাহাও লহরীর। সৈন্ত শিবিরে অস্ত্র নারী-বস্ত্র কোথা হইতে



আসিবে? রট্টা আর আপত্তি কবিল না, লহরী শয্যা প্রান্তে বসিয়া তাহার পদসেবা কবিত্তে লাগিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল, তাবপব বট্টা বলিল—‘শিবিরে অগ্র নারী কি নাই?’

‘না দেবি।’

‘তোমার নাম লহরী? তুমি কতদিন বাজ-সংসাবে আছ?’

‘দশ বৎসর ববসে কুমার স্বন্দেব তাম্বুাকরঙ্গবাধিনী হইয়া রাজ-সংসারের প্রবেশ কবিয়াছিলাম, সে আজ বিশ বছরের কথা। সেই অবধি আছি।’

‘যুদ্ধক্ষেত্রেও তোমাকে আসিতে হয়?’

‘আমি না থাকিলে কুমার স্বন্দেব সেবা হয় না। তিনি সেবা লইতে জানেন না। ভৃত্যেবা অবহেলা করে। তাই আমাকে আসিতে হয়।’

‘তুমি এখনও বাজাকে কুমার স্বন্দেব বলা?’

‘হঁা দেবি। পুৰাতন অভ্যাস চাডিতে পারি নাই।’

‘তুমি বিবাহিতা?’

‘না দেবি।’

‘বিবাহ কর নাই কেন?’

‘আমি বিবাহ কবিলে কুমার স্বন্দেব সেবা কে কবিলে?’

বট্টা কিছুক্ষণ লহরীর মুখে পানে চাহিয়া বহিল। স্বন্দেব প্রক্তি এই দাসীর মনেব ভাব কিরূপ? দাস্ত্রভাব? বাৎসল্য? সখ্য? প্রেম? হয়তো সব ভাব মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

রট্টা প্রশ্ন করিল—‘মহাবাজ বিবাহ করেন নাই কেন?’

লহরী বহিল—‘যুদ্ধ কবিয়াই জীবন কাটিয়া গেল, বিবাহ করিবেন কখন? তাহাড়া, কোন্ জ্যোতিষী নাকি বলিয়াছিল তিনি চিবকুমার থাকিবেন।’

‘ইহাই বিবাহ না কবার কারণ ?’

লগ্নরী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল—‘কুমার স্বপ্নের ভোগে রুটি নাই। মনের মধ্যে তিনি বড় একাকী; কখনও মনেব সঙ্গিনী পান নাই। পাইলে হয়তো বিবাহ করিতেন।’

রট্টা বলিল—‘বিবাহ করিলে হয়তো মনেব সঙ্গিনী পাইতেন। কিঞ্চ এখন উপায় নাই।’

‘উপায় নাই কেন ?’

‘এখন কি তিনি আবার বিবাহ করিবেন ?’

‘তাঁহার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হয় নাহি। অন্তরে বাঞ্ছাবে তিনি সুবাপুরুষ। উপযুক্ত সঙ্গিনী পাইলে কেন বিবাহ করিবেন না ?’

‘তা বটে।’

আর কোনও কথা হইল না। ক্রমে বট্টা ঘুনাইয়া পড়িল। বাণে কিঞ্চ ভাল নিদ্রা হইল না; বারবার কোন নিভৃত উৎকর্ষার পীড়নে ভাঙ্গিয়া বাইতে লাগিল।

শিবিরের আর একটি কক্ষে স্বন্দ শয়ন কবিয়াছিলেন। তাঁহাবও আজ ভাল নিদ্রা হইল না।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

### রমণীব মন

স্বক্কাবাব তখনও জাগে নাই, পূর্বদিকেব পর্বতবেথা আকাশেব গাঁবে পবি'ফুট, হইতে আবস্ত কবিয়াছে। চিত্রক ও গুলিক বমা একশত মশত্র অস্বা'রোহী লইয়া যাত্রা করিল। চতুর্দিকেব সুবিপুল নিস্তরুতাব মধ্যে অশ্বেব ক্ষুবধনি ও অশ্বেব বাণংকাব অতি শ্রীণ শুনাইল।

স্বন্দেব অধিকৃত এই উপত্যকা হইতে নির্গমনেব একটি পথ উত্তর দিকে, ছই গিবিশ্রেণী মধ্যস্থলে প্রণালীব চাব সঙ্গী' সঙ্গট পথ। এই সঙ্গট প্রায় ছই ক্রোশ দূব পর্যন্ত এক সমস্ত স'র্ক প্রহরী দ্বাবা বক্ষিত। পাছে শত্রু অভর্কিতে স্ক্কাবাব আক্রমণ কবে তাই দিবাবাত্র প্রহবার ব্যবস্থা। গুলিক বর্মা ও চিত্রক এই সঙ্গটমার্গ দিখা চাইল। প্রহরীবা সংবাদ জানিত, তাহাবা নিঃশব্দে পথ ছা'ড়িয়া দিল। ক্রমে স্থগ উঠিল, বেলা বাড়িতে লাগিল। সঙ্গট কখনও প্রশস্ত হহতেছে, আ'বাব শীর্ণ হইতেছে; কদাচ ৫ হইয়া অল্প উপত্যকায় মিশিতেছে। মাঝে মাঝে স্বন্দেব গুপ্তচবেবা গ'ছন্ন গুল্ম বচনা কবিয়া অবস্থান কবিতোছে, তাহাদেব নিকট পথেব সন্ধান জানিয়া গইয়া গুলিক বমাব দল অগ্রসব হইল।

গুলিক ও চিত্রকেব অশ্ব অগ্রে চািবিয়াছে, পৃশাতে শত বোকা। গুলিক স্বভাবত একটু বহুভাগী, এক রাত্রিব পবিচমে চিত্রকেব প্রতি তাহাব স'চাব জন্মিয়াছে, ছ'জনেই সমপদস্ত সমায়স্ক এবং ব'দ্বজীবী। গুলিক নানারিধ প্রগল্ভ ছন্ননা কবিতো কবিতো ঘাইতেছে; কোন্ বাস্বেব বোদ্ধারা কেমন যুদ্ধ কবে, কোন্ দেশেব যুব'ীদের কিরূপ প্রণয়রীতি, আপন অভিজ্ঞতা হইতে এই সকল কাহিনী শুনাইতে শুনাইতে ধুমকেতুর

ছায় গুপ্ত স্বাক্ষর করিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে চলিয়াছে। গুলিকের সরল চিত্তে মুক্ত ও যুবতী ভিন্ন অত্ৰ কোনও চিন্তার স্থান নাই।

চিত্রক গুলিকের কথা শুনিতেছে, তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া উচ্চ হাস্য করিতেছে, কদাচিত্ নিজেও দুই একটি সরস কাহিনী শুনাইতেছে। কিন্তু তাহার হৃদয়ের মর্মস্থলে একটি ভাবনা লুতা-কীটের দ্বায় নিভৃত্তে জ্বল বুলিতেছে। রট্টা...মন বলিতেছে রট্টা আর তাহার হইবে না। বিদ্বাৎ-শিখার মত অক্ষুণ্ণ সে তাহার অন্তরে আসিয়াছিল, আবার বিদ্বাৎ-শিখার মতই অস্থিতি হইল, শুধু তাহার শূন্য অন্তরলোকের অন্ধকার বাড়াইয়া দিয়া গেল। কাল রাএ সে বলিয়াছিল—ইহাতে ভালই হইবে। স্বন্দগুপ্ত রট্টার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন ইহাতে ভালই হইবে।...কাহার ভাল হইবে ?

কিন্তু রট্টার দোষ নাই। নব-মোবনের স্বভাববশে সে চিত্রকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল; দুই দিনের নিত্য-সাহচর্য প্রীতির স্বজন করিয়াছিল... রাত্রে গুহার অন্ধকারে ভয়ব্যাকুদ, চিত্তে রট্টা যে-কথা বলিয়াছিল, যে-রূপ ব্যবহার কবিয়াছিল তাহার প্রতি অত্যধিক গুপ্ত আরোপ করা যায় না; ক্ষণিকের আবেগ-বিহ্বলতাকে স্থায়ী মনোভাব মনে করা অস্বাভাবিক। রমণী মন কোমল ও তরল—অল্প তাপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এই সময় চিত্রক গুলিকের কণ্ঠস্বব শুনিতে পাইল; গুলিক একটি গল্প শেষ করিয়া বলিতেছে—‘স্বন্দ চিত্রক বর্মা, নারী যতক্ষণ তোমার বাছ মণ্ডে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তোমার, বাছযুক্ত হইলে আব কেহ নয়। অনেক দেশের অনেক নারী দেখিলাম; সকলে সমান, কোনও প্রভেদ নাই।’

চিত্রক হাসিয়া বলিল—‘আমারও তাহাই অভিজ্ঞতা।’

গুলিক আবার নূতন কাহিনী আরম্ভ করিল।

না, চিত্রক রট্টাকে মন্দ ভাবিবে না। রট্টা রাজকন্তা; স্বন্দকে দেখিয়া সে যদি মনে মনে তাহার অল্পরাগিনী হইয়া থাকে, ইহাতে বিচিত্র

কি? স্বপ্নের স্রাব অল্পবয়সের যোগ্য পাত্র আর্থাভাবে আর কে আছে?...  
ইহাতে ভালই হইবে—মণিকাঞ্চন যোগ হইবে।...

জল নিম্নে অবতরণ করে; অগ্নিব স্কুলিঙ্গ উর্ধ্বে উচ্ছিত হয়। রট্টা  
অগ্নির স্কুলিঙ্গ; এত রূপ এত গুণ কি সাধারণ মানুষের ভোগ্য  
হতে পারে?

কিন্তু—

চিত্রকের এখন কী হইবে? সাতদিনের মধ্যে তাহার জীবন সম্পূর্ণ  
ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। সাতদিন আগে সে যে-মানুষ ছিল, এখন  
আর সে-মানুষ নাই। সে রাজপুত্র; কিন্তু নিঃস্ব অজ্ঞাত রাজপুত্র;  
ষতদিন সে নিজেকে সামান্য দৈনিক বলিয়া জানিত ততদিন তাহার  
চরিত্র অল্পরূপ ছিল. আর কি সে সামান্য দৈনিক সাজিয়া যুদ্ধ করিতে  
পারিবে? তবে তাহার কী দশা হইবে? কী লইয়া সে জীবন কাটাইবে?  
লক্ষ্যহীন নিরালস্য জীবন...যে আশাতীত আকাঙ্ক্ষার বস্তু অনাহুত তাহার  
হৃদয়ের উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রাণতর স্রোতের টানে সে দুবে  
ভাসিয়া যাইতেছে—

এখন সে কী করিবে? তাহার জীবনে আর কিছু অবশিষ্ট আছে কি?

শুলিক বদাঁব হাশ্ব কণ্টকিত কর্ণস্বর চিত্রকের কর্ণে স্পষ্ট হইয়া উঠিল।  
শুলিক বলিতেছে—‘তিন বৎসর পবে সেই শত্রুর সাক্ষাৎ পাইলাম।  
বন্ধু ভাবিয়া দেখ, পুরাতন শত্রুকে তরবারি ব অগ্রে পাওয়ার সমান আনন্দ  
আর আছে কি?’

চিত্রক বলিল—‘না, এমন আনন্দ আব নাই।’

শুলিক বলিল—‘সেদিন শত্রুর রক্তে তরবারি ব তর্পণ করিয়াছিলাম,  
সেকথা স্মরণ করিলে আজিও আমার হৃদয় হর্ষোৎফুল্ল হয়। ইহা ব  
ভুলনায় রমণীর আলিঙ্গনও তুচ্ছ।’

চিত্রকের মনে পড়িয়া গেল। পুরাতন শত্রুর উপর প্রতিহিংসা সাধন।

এই কাণ্ডটি বাকি আছে। বে ভাণ্ডার পিতাকে হত্যা করিয়াছিল তাহাকে বধ করিয়া ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালন এখনও বাকি আছে। নিয়তি কুটিল পথে তাহাকে সেইদিকেই লটয়া যাইতেছে। রোষ্ট্র ধর্ষাদিত্যকে হত্যা করিয়া সে পিতৃশ্রগ্ন মুক্ত হইবে।

তারপর ? তারপর কি হইবে তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। সকল পথের শেষেই তো মৃত্যু।

চিত্রক চঠনভূর্গ অভিযুখে চলুক, আমরা স্বপ্নের শিবিরে ফিরিয়া যাই।

প্রাতঃকালে স্বপ্ন বহিঃকক্ষে আসিয়া বসিলে পিপ্লনী মিশ্র তাঁহাকে স্বস্তিবাচন করিয়া বলিলেন—‘বয়স্ক, কাল রাত্রে বড় বিপদ গিয়াছে।’

স্বপ্ন অশ্রুমনস্ক ছিলেন ; বলিলেন—‘বিপদ !’

পিপ্লনী বলিলেন—‘শত্রু আমাদের সন্ধান পাইয়াছে। বয়স্ক, এ স্থান আর নিরাপদ নয়।’

স্বপ্ন তাঁহার বয়স্ককে চিত্তিতেন, তাই উদ্ভিগ্ন হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কাল রাত্রে কি ঘটয়াছিল ?’

পিপ্লনী বলিলেন—‘কাল পবন স্রুখে নিদ্রা গিরাহিনাম, মধ্য রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অচভব করিলাম, মেরুদণ্ডের অধোভাগে কি কিলবিল করিতেছে। ভারি আনন্দ হইল ; বুঝিলাম কুলকুণ্ডলিনী জাগিতেছেন। জপতপ ধ্যানধারণা অধিক করি না বটে কিন্তু গোত্রক্ষণ কোণায় যাইবে ? অতঃপর সহসা অচভব করিলাম, কুণ্ডলিনী আমাকে দংশন করিতেছেন—দাবণ আলা। দ্রুত উঠিয়া অচসন্ধান করিলাম। কি বলিব বয়স্ক, কুণ্ডলিনী নয়—পরম-ঘোর কাষ্ঠ-পিপীলিকা। তদবধি আর দুমাইতে পারি নাই।’

স্বপ্ন দ্বেষ বিমনাভাবে বলিলেন—‘কাল আমিও দুমাইতে পারি নাই।’

পিপ্লনী বলিলেন—‘আঁ ? তোমারও কাষ্ঠ-পিপীলিকা ?’

স্বন্দ উত্তর দিলেন না, মনে মনে বলিলেন—‘প্রায় ।’

এই সময় মহাবলাধিকৃত ও কয়েকজন সেনাপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন নৃক সংক্রান্ত মঙ্গলা আবস্ত হইল। শত্রুপক্ষ সত্বে যে সকল সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা লইয়া বাক্বিতণ্ডা তর্কবিচার চলিল। পরিশেষে স্থিব হইল, শত্রুর অভিপ্রায় যতক্ষণ না স্পষ্ট হইতেছে ততক্ষণ তাহাদেব আক্রমণ করা হইবে না, শত্রু যদি আক্রমণ করে তখন তাহাদেব প্রতিবোধ করা হইবে বর্তমানে স্বন্দেব স্বক্কাবার এই উপস্থিতকালেই থাকিবে, স্থান পরিবর্তনেব প্রয়োজন নাই। এখান হইতে, শত্রু যে-পথেই থাক তাহাব উপব দৃষ্টিব রাখা চলিবে।

মঙ্গলা সমাপ্ত হইতে দ্বিপ্রহর হইল। আত্মবাদি সম্পন্ন কবিতা স্বন্দেব বিশ্রাম গ্রহণ কবিলেন। লহরী আজ বট্টাব সেবায় নিযুক্ত ছিল, একজন তৃত্য স্বন্দকে ব্যজন কবিল।

বিশ্রামান্তে স্বন্দ গাত্ৰোত্থান করিলে লহরী আসিয়া বলিল—‘কুমার ভট্টাবিকা রট্টা যশোধবা আদিত্তেছেন।’

বট্টা আসিয়া বাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। সগাঙ্গে স্বর্ণভূষা বলমল কবিত্তেছে, পবিধানে অবাপুস্পেব ঝাষ বক্রবর্ণ চীনপট্ট, সীমন্তে মুক্তাকলের নাম। লহরী অতি বন্দে কবরী বাধিয়া দিয়াছে। বাজা মুক্ত বিস্কারিত নেত্রে নই কন্দর্প-বিজয়িনী মূর্তিব পানে চাহিয়া বহিলেন। স্বপেকের জন্ত নিজ অন্তবেব দিকে দৃষ্টি বিন্নাইলেন, ভাবিলেন, জীবন ভঙ্গুব, স্মৃচ চঞ্চল, সার্বা জীবন যাতা খুঁসিয়া পাই নাই, তাগা যখন আপনি কাছে আনিয়াছে তখন আব বিলম্ব কবিব না—

বট্টা বাজাকে প্রণাম কবিতা গদগদ কণ্ঠে বলিল—‘দেব, এই সকল উপহ্যবেব জন্ত আপনাকে ধন্যবাদ দিব কি, বিশ্বয়ে আমি হতবাক্ব হইয়াছি। আপনি কি ইন্দ্রজাল জানেন? নারী-বর্জিত মৈত্র-শিববে এই সকল অপূর্ব নূতন বস্ত্র অলঙ্কার কোথায় পাইলেন?’

স্মিতহাস্য করিয়া স্বন্দ বলিলেন—‘সুচরিতে, চেষ্টা এবং পুরুষকার দ্বারা অপ্রাপ্য বস্তুও লাভ করা যায়।’

রট্টা নম্রকণ্ঠে বলিল—‘তাহাই হইবে। আমি নারী, পুরুষকারের শক্তি কি করিয়া বুঝিব? প্রার্থনা করি আপনার সর্বজয়ী পুরুষকার চিরদিন অক্ষয় থাকুক। উপহারের জন্ত আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন আর্ঘ্য।’

স্বন্দ বলিলেন—‘ধন্যবাদের প্রয়োজন নাই। তোমাকে উপহার দিয়া এবং সেই উপহার তোমার অঙ্গে শোভিত দেখিয়া আমি তোমার যুগ্মশক্তি আনন্দ উপভোগ করিতেছি।’

স্বন্দর প্রশংসাদীপ্ত নেত্রতলে রট্টা সলজ্জ নতমুখে রহিল। স্বন্দ তখন বলিলেন—‘যুদ্ধের চিন্তায় সর্বদা মগ্ন আছি, তোমার চিন্তাবিনোদনের কোনও চেষ্টাই করিতে পাবি নাই। এই সৈন্ত-শিবিরে একাকিনী থাকিয়া তোমার মন নিশ্চয় উচাটন হইয়াছে, এস পাশা খেলি। খেলিবে?’

স্মিতমুখে তুলিয়া রট্টা বলিল—‘খেলিব মহাবাজ।’

\* স্বন্দের আদেশে লঙ্করী পাশক্রীড়াব উপদ্রব অক্ষবাট প্রভৃতি আনিয়া পাতিয়া দিল। রট্টা ও স্বন্দ অক্ষবাটের দুইদিকে বসিলেন।

রাজা পাশাগুলি দুই হস্তে ঘষিতে ঘষিতে মুহু হাসিয়া বলিলেন—‘কি পণ রাখিবে?’

রট্টা দীনভাবে বলিল—‘আমার তো এমন কিছুই নাই মহারাজ, যাহা আপনার সম্মুখে পণ রাখিতে পারি।’

স্বন্দ শ্রীতকণ্ঠে বলিলেন—‘উত্তম, পণ এখন উছ থাক। যদি জয়ী হই তখন দাবী করিব।’

রট্টা বলিল—‘কিন্তু আর্ঘ্য, যে পণ আমার সাধ্যাতীত তাহা যদি আপনি আদেশ করেন, কী করিয়া দিব? পণ দিতে না পারিলে আমার যে কলঙ্ক হইবে।’



স্বন্দ বলিলেন—‘তোমার সাধ্যাতীত পণ চাহিব না—তুমি নিশ্চিত থাক ।’

‘ভাল মহারাজ ।—আপনি কি পণ রাখিবেন ?’

‘তুমি কী পণ চাও ?’

রট্টা বলিল—‘যদি বল দণ্ড-মুকুট—ছত্র-সিংহাসন ? মহারাজ পণ রাখিবেন কি ?’

অহুরাগপূর্ণ চক্ষুে রট্টার দিকে অবনত হইয়া স্বন্দ গাঢ়স্বরে বলিলেন—  
‘এই পণ কি তুমি সত্যই চাও ?’

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া রট্টা বীরস্বরে বলিল—‘আপনার পণও এখন উহু থাক, যদি জিতিতে পাবি তখন চাহিয়া লইব ।’

‘ভাল ।’ বলিয়া স্বন্দ রুদ্ধশ্বাস মোচন করিলেন ।

অতঃপর অক্ষত্রীড়া আরম্ভ হইল । মহাবাজ স্বন্দওপ্ত নবযুবকের স্নায় উৎসাহ ও উত্তেজনা লইয়া নানা প্রকাব রন্ধ পরিহাস করিতে করিতে খেলিতে লাগিলেন । রট্টাও হাস্যকৌতুকে বোগ দিয়া পরম আনন্দে খেলিতে লাগিল । উভয়ে খেলায় মগ্ন হইয়া গেলেন ।

এতক্ষণ লচরী ও পিপ্লী মিশ্র এই কক্ষে উপস্থিত ছিলেন । পিপ্লী অদৃবে বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন ; কিছুক্ষণ খেলা চলিবার পর মুখ তুলিয়া দেখিলেন, লচরী তাঁহাকে চোখের ইঙ্গিত করিতেছে । পিপ্লী মিশ্র ইঙ্গিত বুঝিলেন । তারপর লচরী যখন লঘুপদে কক্ষ হইতে বাতির হইয়া গেল, তখন পিপ্লীও নিঃশব্দে পা টিপিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন । রট্টা ও স্বন্দ ভিন্ন কক্ষে আর কেহ রহিল না । তাঁহারাও খেলায় এমনই নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন যে তাহাদের অলক্ষ্য অন্তর্ধান জানিতে পাবিছেন না ।

প্রায় তিন ঘটিকা মহা উৎসাহে খেলা চলিবার পব বাগ্নি শেষ হইল । পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ স্বন্দ পরাজিত হইলেন ।

রট্টা করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল । স্বন্দ বলিলেন—‘রট্টা যশোধরা,

আমি তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করলাম। এখন কী পণ লইবে লও। দণ্ড-মুকুট ছাত্র-সিংহাসন সমস্তই লইতে পার।’

বট্টা বলিল—‘না মহাবাজ, অত স্পর্ধা আমার নাই। আমার ক্ষুদ্র পণ বখাসময় বাচনা করিব।’

স্বন্দ কিয়ৎকাল রট্টাব মুখেব পানে চাতিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—‘ভাবিয়াছিলাম, পাশার বাজিতে তোমার নিকট হইতে এক অমূল্য বস্তু জিতিয়া লইব। কিন্তু তাহা হইল না। এখন নিতান্ত দীনভাবে তোমার নিকট ভিক্ষা চাওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই। তুমি ভিক্ষা দিবে কি?’

স্বন্দ যে-কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা বট্টার অপ্রত্যাশিত নয়, তবু তাহার হৃৎপিণ্ড দ্রুত দ্রুত কবিষা উঠিল। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—‘আদেশ করুন আর্য।’

স্বন্দ বলিলেন—‘আমার বয়স পঞ্চাশ বৎসব, কিন্তু আমি বিবাহ করি নাই। বিবাহেব প্রয়োজন কোনও দিন অনুভব করি নাই। এইকপে দিনসম্প্রতি জীবন কাটিয়া বাইবে ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া, তোমার পবিচয় পাইয়া তোমাকে জীবনসঙ্গিনী কবিবাব ইচ্ছা হইয়াছে।’

স্বন্দ এইটুকু বলিয়া নীবব হইলেন। বট্টাও দীর্ঘকাল নতমুখে নির্বাক রহিল। তারপর অতি কণ্ঠে স্থগিত বাক সংযত করিয়া বলিল—‘দেব, আমি এ সৌভাগ্যেব বোগার্য নই। আমাকে ক্ষমা করুন।’

স্বন্দেব চোখে ব্যাথাবিন্দু বিক্ষয় দৃষ্টিয়া উঠিল—‘তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান কবিতেন?’

সতল চক্ষু তুলিয়া বট্টা বলিল—‘মহাবাজ, আপনি অসীম শক্তিবব, সমুদ্রমেৎলা আর্ঘ্যমির অধীশ্বর, কেবল এই তুচ্ছ নাবীদেহ লইয়া সঙ্কট হইবেন?’

তীক্ষ্ণতক্ষে রট্টার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্বন্দ বলিলেন—‘না, তোমার দেহ-মন দুই-ই আমার কান্দা। যদি হৃদয় না পাই, দেহে আমার প্রয়োজন নাই। এই বয়সে প্রাণশূন্য নাবীদেহ বহন করিয়া বেড়াইতে পারিব না।’

গলদশনেত্রী রট্টা কৃতাজ্জলি হইয়া বলিল—‘রাজাধিরাঙ্গ, তবে মার্জনা কখন। হৃদয় দিবার অমিকার আমার নাই।’

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া স্বন্দ বলিলেন—‘হৃদয়কে হৃদয় অর্পণ করিয়াছ?’

‘রট্টা’ মুখ অবনত কবিল, পুষ্পের মনকোষে সঞ্চিত শিশির বিন্দুর তায় কবেক ফোঁটা অশ্রু বাধিয়া তাঁহাব বক্ষে পড়িল।

দীর্ঘকাল উভয়ে নীবব। স্বন্দ ভূমিতে এক হস্ত রাখিয়া অক্ষবাটের দিকে চাহিয়া আছেন; তাঁহাব মুখে বিচিত্র ভাবব্যঞ্জনা পরিষ্কৃত হইয়া আবার মিলাইয়া বাইতেছে। শেষে তিনি একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন; তাঁহার অধরে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—‘কিছুক্ষণ পূবে আমি বলিয়াছিলাম, পুংসক্যে দ্বারা অপ্ৰাপ্য বস্তুর লাভ করা যায়। তুমি বলিয়াছিলাম। ভাগ্যই বদবান। কিন্তু তুমি ধন্য, ধন্য তোমার প্রেম। তোমার প্রেম পাইলাম না, এ ক্ষোভ মরিলেও যাইবে না।’

বট্টা সঙ্কচিত হইয়া বসিয়া রহিল, কথা বলিতে পারিল না। স্বন্দ আঁচল বলিলেন—‘ধাত্যকে তুমি হৃদয় দান কবিয়াছ সে যেই হোক—আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে প্রলোভন দেখাইব না, বদপূক তোমাকে গ্রহণ করিবার চেষ্টাও করিব না। দীর্ঘকাল বলের চর্চা কবিনা দেখিয়াছি, বলের দ্বারা হৃদয় জয় করা যায় না। তুমি কাদিও না। আমি কখনও পরস্ব হরণ করি নাট, আজও তাহা করিব না।—তোমার নিকট একটি প্রার্থনা—আমাকে ভুলিও না, আমি যখন ইহলোকে থাকিব না, তখনও আমাকে মনে রাখিও।’

স্বন্দের পদস্পর্শ করিয়া বাপ্পাকুলকণ্ঠে রট্টা বলিল—‘দেব, বতদিন

বাচিয়া থাকিব, আমার হৃদয় মন্দিবে আপনাব মূর্তি দেবতার স্রাব  
পূজা পাইবে।’

স্বন্দর স্টোর মস্তক স্পর্শ কবিয়া বলিলেন—‘সুখী হও।’

স্বন্দরের শিবিরে যখন এই দৃশ্যেব অভিনয় হইতেছিল, সেই সময় চিত্রক  
ও গুলিক বর্মা দলবল লইয়া চষ্টন দুর্গেব সম্মুখে উপস্থিত হইল। দিবা তখন  
একপাদ অবশিষ্ট আছে।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

### হুণ বক্ত

মৎস্যের স্রাব আকৃতি বিশিষ্ট একটি উপত্যকায চষ্টনদুর্গ অবস্থিত।  
উত্তরদিক হইতে আর্ষাবর্তে প্রেশের যতগুণি সঙ্কট-পথ আছে, এত  
উপত্যকা তাহার অস্তম, তাই এখানে দুর্গেব প্রতিষ্ঠা। এই পথে  
পূর্বকালে বহু দুর্মদ যোদ্ধাজাতির অভিযান আবতুমিতে প্রবেশ করিযাছে,  
রনিকের সার্থবাহ মহামূল্য পণ্য লইয়া বাণ্যাত কবিযাছে, চৈন  
পরিব্রাজকগণ তীর্থযাত্রা করিযাছেন। উপত্যকাটি উত্তবে দক্ষিণে প্রায়  
পাঁচ ক্রোশ দীর্ঘ, প্রস্থে মাত্র অর্ধক্রোশ। পূর্বে ও পশ্চিমে অতট  
গিরিশ্রেণী।

চষ্টনদুর্গের সিংহদ্বাব দক্ষণমুখী। দুর্গটি দৃঢ়গঠন, কর্মঠাবৃতি, কিন্তু  
আয়তনে বৃহৎ নয়। উচ্চ প্রাকারবেষ্টনীর মধ্যে তিন চাবিশত লোক  
বাস করিতে পাবে।

অপরাত্তে দুর্গের দ্বাব খোলা ছিল, দুব হইতে অখারোহীব দল  
আসিতে দেখিযা ঝনৎকার শব্দে লৌহ-কবাট বন্ধ হইয়া গেল।

গুলিক ও চিত্রক দুর্গদ্বাবে প্রায় শত হস্ত দুব পর্যন্ত আসিয়া অশ্বেব গতিরোধ কবিল। এই স্থানে কবেকটি পার্বত্য বৃক্ষ ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া একটি বৃক্ষ-বাটিকা বচনা কবিয়াছে। গুলিকেব ইদ্রিতে সৈনিকের দল অশ্ব হইতে নক্ষমিয়া অশ্বেব পবিচর্যায় নিযুক্ত হইল। আজ বাত্রি সম্ভবত এই তরুতলেই কাটাইতে হইবে। সকলের সঙ্গে দুই তিন দিনের আহার্য ছিল।

চিত্রক ও গুলিক অশ্ব হইতে নামিল না। ওদিকে দুর্গের দ্বার তো বন্ধ হইয়া গিয়াছিলই, উপবস্ত্র ভর্গ প্রাকাবেব উপর বহু লোকের প্যস্ত গাতায়াত দেখিয়া মনে হয় তাগাবা আক্রমণ আশঙ্কা কবিয়া দুর্গ রক্ষার আযোজন কবিতেছে।

ইহাদেব যুৎসা অভিনিবেশ সচকাবে নিবীক্ষণ করিয়া চিত্রক মুহুঃশ্র কবিল, বলিা—‘মনে হইতেছে ইহাবা বিনা বৃদ্ধে আমাদের দুর্গে প্রবেশ কবিতে দিবে না। আমবা কে কোথা হইতে আসিতেছি তাহা না জানিবাঈ দুর্গবন্দায় উত্তত হইয়াছে।’

গুলিক বলিল—‘আমাদেব সংখ্যা দেবিয়া বোধহয় ভয় পাইয়াছে। আমবা সকলে দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলে উহাবা তীব্র ছুড়িবে, পাথর ফেলিবে, কিন্তু চই এক জন যাইলে বোধহয় কিছু বলিবে না। আমবা কে তাহা জানিবার আগ্রহ নিশ্চয় উহাদেব আছে। চল, আমবা দুইজনে যাই। আমাদের পবিচয় পাইলে নিশ্চয় দুর্গে প্রবেশ কবিতে দিবে।’

চিত্রক বলিল—‘সম্ভব। কিন্তু আমাদের দুইজনেব যাওয়া উচিত হইবে না। যদি দুইজনকেই ধবিয়া বাধে তখন আমাদের নেতৃগীন সৈন্তেবা কী করিবে?’

• গুলিক বলিল—‘সে কথা সত্য। তবে তুমি থাক আমি যাই।’

চিত্রক বলিল—‘না, তুমি থাক আমি যাইব। প্রথমত তোমাকে যদি ধবিয়া রাখে তখন আমি কিছুই করিতে পাবিব না; সৈন্তেবা তোমার

অধীন, আনার সকল আদেশ না মানিতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমি যদি কিরাত বর্মার সাক্ষাৎ পাই, আমি তাহাকে এমন অনেক কথা বলিতে পারিব যাগা তুমি জাননা। স্মৃতবাং আনার বা ওয়াই সমীচীন।’

যুক্তিব সারবত্তা অল্পভব কবিষা গুলিক সম্মত হইল। বলিল—‘ভান। দেখ যদি দুর্গে প্রবেশ কবিতে পাব। কিন্তু একটা কথা, স্বর্ধাস্তের পূবে নিশ্চয় কিরিয়া আসিওগ না আসিলে বুঝিব তোমাকে ধরিয়া বাধিয়াছে কিষা বধ করিয়াছে। তখন যথাকর্তব্য করিব।’

চিত্রক দুর্গের দিকে অধ চালাইল। সে তোরণ হইতে বিশ হাত দুবে উপস্থিত হইলে তোরণশীর্ষ হইতে পক্ষকণ্ঠে আদেশ আসিল—‘দাঁড়াও।’

চিত্রক অধ স্থগিত কবিল; উর্ধ্বে চক্ষু তুলিয়া দেখিল, প্রাকাবহু সারি সারি ইন্দ্রকোষের ছিদ্রপথে কয়েকজন ধাহুকী ধন্তে শব সংযোগ করিয়া তাহার পানে লক্ষ্য কবিষা আছে। একটি ইন্দ্রকোষের অন্তবান হইতে প্রশ্ন আসিল—‘কে তুমি? কী চাও?’

চিত্রক গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—‘আমি পরম ভট্টারক শ্রীমন্মহাবাঈ স্বন্দশ্বপ্তের দূত। তুর্গাধিপ কিরাত বর্মাব জন্ম বার্তা আনিয়াছি।’

প্রাকারের উপর কিছুক্ষণ নিম্নমবে আদ্যাপ হইল, তারপব আদ্যাব উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—‘কী বার্তা আনিষাছ?’

চিত্রক দৃঢ়মবে বলিল—‘তাহা সাধারণেব জ্ঞাতব্য নয়। তুর্গাধিপকে বলিব।’

আদ্যাব কিছুক্ষণ হুমকণ্ঠ আলোচনার পর তোবণ হইতে শব্দ আসিল—‘উত্তম। অপেক্ষা কর।’

কিয়ৎকাল পরে দুর্গেব কবাট ঈষৎ উন্মোচিত হইল। চিত্রক তুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। কবাট আদ্যাব বন্ধ হইয়া গেল।

তোরণ অতিক্রম করিয়া দুর্গেব অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার ধোড়ার বলা ধরিল। চিত্রক অধপৃষ্ঠ হইতে অবতবণ

করিল। চারিদিক হইতে প্রায় ত্রিশজন সশস্ত্র যোদ্ধা তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। চিত্রক লক্ষ্য করিল, ইহাদেব অধিকাংশই আকৃতিতে হুণ; খর্বকায় গঙ্গস্কন্ধ ক্ষুদ্রক্ষু, মুখে শাশ্রু গুম্ফব বিরসতা। সকলের চোখেই সন্দিগ্ধ কুটিল দৃষ্টি।

বে-ব্যক্তি বোড়া ধরিয়াছিল সে কর্কশকণ্ঠে বলিল—‘তুমি দূত! যদি মিথ্যা পসিচব দিয়া ছুর্গে প্রবেশ করিয়া থাক টুপুজ শাস্তি পাইবে। চল, ছুর্গাবিণ নিম্ন ভবনে আছেন, সেখানে সাফাং হইবে।’

চিত্রক এই ব্যক্তিকে শাস্ত্রক্ষে নিরীক্ষণ করিল। চক্ষুঃ ৭৭মব বয়স্ক দৃঢ়বীর হুণ; বামগাও অসির গভীর ফতচিহ্ন মুখের শ্রীধর্ষণ করে নাই; বাচনভঙ্গী অভিযম অশিষ্ট। চিত্রক কিঞ্চ কোনও রূপ কোধ প্রকাশ না করিয়া তাচ্ছিল্য সহিত প্রণ কবিল—‘তুমি কে?’

হুণের মুখ কালো হইয়া উঠিল, সে চিত্রকের প্রতি কষাণিত নেত্রগাত করিয়া বলিল—‘আমার নাম মকসিংহ। আমি চষ্টনছুর্গের রক্ষক— ছুর্গপাল।’

আর কোনও কথা হইল না। চিত্রক মিনঃস্বক চক্ষে ছুর্গের চারিদিক দেখিতে দেখিতে চলিল। ছুর্গট সাধারণ প্রাকারগোষ্ঠিত পুরীর মতই, বিশেষ কোনও বৈচিত্র্য নাই। মধ্যস্থলে ছুর্গাবিণের প্রাস্তর নির্মিত দ্বিভূমক ভবন।

ভবনের নিম্নতলে প্রশস্ত বহিঃক্ষে কিরাত বাহু দ্বারা বক্ষ আবদ্ধ করিয়া ক্রকুটি বিকৃত মুখে পাদচারণা কবিত্তেছিল; ক্ষেব চার দ্বারে চাবজন অস্ত্রধারী রক্ষী। চিত্রক ও মকসিংহ ক্ষে প্রবেশ কবিলে কিরাত তাহাদেব লক্ষ্য করিল না, পূর্ববৎ পাদচারণা কবিত্তে লাগিল। তাবপর সঙ্গ্য মুখ তুলিয়া ক্ষিপ্রপদে চিত্রকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরম্পরের দর্শনে উভয়ের মনে আনন্দ উপজাত হইল না। চিত্রক দেখিল কিরাতের আকৃতি হুণদের মত নয়; সে দীর্ঘকায় ও স্তদর্শন;

কেবল তাহাব চক্ষুহুটী ক্ষুদ্র ও জুর। চিত্রক মনে মনে বলিল—তুমি কিরাত! রট্টার প্রতি লুকু দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে।

কিরাত বলিয়া উঠিল—‘কে তুমি? কোথা হইতে আসিতেছ?’

চিত্রক বলিল—‘পূর্বেই বলিয়াছি আমি সম্রাট স্বন্দগুপ্তের দূত। তাঁহার স্বন্ধাবার হস্তে আসিয়াছি।’

ক্রোধ-সীক্স স্বরে কিরাত বলিল—‘স্বন্দগুপ্ত! কী চায় স্বন্দগুপ্ত আমার কাছে? আমি তাহাব অধীন নহি।’

চিত্রক বলিল—‘সম্রাট স্বন্দগুপ্ত কী চান তাহা তাঁহার বার্তা হইতেই প্রকাশ, পাইবে।’ এদটু থামিবা বলিল—‘শিষ্টসমাজে মাননীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে বিনয় বাক্য প্রয়োগের বীতি আছে।’

কিরাত অগ্নিবৎ জলিয়া উঠিল—‘তুমি যুট। আমার দুর্গে আসিয়া আমার সহিত বে যুটতা করে আমি তাহাব নানাকর্ণ ছেদন কবিয়া প্রাকার বাহিরে নিষ্ক্ষেপ কার।’

চিত্রক্বেব লগাটেব তিলকচিহ্ন ক্রমশ লাল হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু সে বীরস্বরে বলিল—‘সম্রাট স্বন্দগুপ্তেব দূতকে লাঞ্ছিত কবিলে স্বন্দ সহস্র রণ-হস্তী আনিয়া তোমাকে এং তোমার দুর্গকে হস্তাব পদতলে নিপিষ্ট কবিবেন। মনে রাখিও আমি একা নই; বাহিবে শত অশ্বারোহী অপেক্ষা করিতেছে।’

মনে হইল কিরাত বুঝি কাটয়া পড়িবে; কিন্তু সে দস্ত দ্বারা অধর দংশন করিয়া অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ কবিল। অপেক্ষাকৃত শাস্তস্বরে বলিল—‘তুমি যে স্বন্দগুপ্তের তাহার প্রমাণ কি?’

চিত্রক নিঃশব্দে অভিজ্ঞান অঙ্গুবীয় বাহির করিয়া দিল।

নতমুখে কিছুক্ষণ অঙ্গুবীয় পর্যবেক্ষণ করিয়া কিরাত যখন মুখ তুলিল তখন তাহার মুখ দেখিয়া চিত্রক অবাক হইয়া গেল। কিরাতের মুখে অগ্নিবর্ণ ক্রোধ আর নাই, তৎপরিবর্তে অধরপ্রান্তে মুহু কোঁচুকহাস্ত ক্রীড়া



করিতেছে। কিরাত মিষ্টম্বরে বলিল—‘দূত মহাশয়, আপনি স্বাগত। আমার রূঢ় ব্যবহারের জ্ঞান কিছু মনে করিবেন না। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় কোনও আগন্তুক দুর্গে প্রবেশ করিলে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়।’  
আপনি যদি আমার তর্জনে ভয় পাইতেন তাহা হইলে বুঝিতাম—অঙ্গুরীয় সবেও আপনি সম্রাটের দূত নয়, শত্রুর গুপ্তচর। বাহোক আপনার ব্যবহারে আমার সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। আসুন—উপবেশন করুন।’

চিত্রক কথায় ভিজিল না; মনে মনে বুঝিল কিরাত তাহাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া এখন অস্ত পথ ধরিয়াছে। সে আরও সতর্ক হইল। কিরাত শুধু ক্রুব ও ক্রোধী নয়, কপটতায় ধুরন্ধর।

উভয়ে আসন পরিগ্রহ করিলে কিরাত বলিল—‘সম্রাট কি বার্তা পাঠাইয়াছেন? লিখিত লিপি?’

চিত্রক গুরুম্বরে বলিল—‘না, সম্রাট সামান্য দুর্গাধিপকে লিপি লেখেন না। মৌখিক বার্তা।’

কিরাত এই অবজ্ঞা গলাধঃকরণ করিল। চিত্রক তখন বলিল—‘সম্রাট সংবাদ পাইয়াছেন সে বিটম্ববাজ রোষ্ট্র ধর্মান্দিত্য চষ্টন দুর্গে আছেন—’

চকিতে কিরাত প্রশ্ন করিল—‘এ সংবাদ সম্রাট কোথায় পাইলেন?’

চিত্রক বলিল—‘কুমার ভট্টারিকা রট্টা যশোধরার মুখে।’

কিবাতেল চক্ষু ক্ষণেকের জন্ত বিস্ফারিত হইল; সে কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল—‘তারপর বলুন।’

‘সম্রাট জানিতে পারিয়াছেন যে আপনি ছলপূর্বক ধর্মান্দিত্যকে দুর্গে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।’

কিরাত পরম বিস্ময়ভরে বলিয়া উঠিল—‘আমি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি! সে কি কথা! ধর্মান্দিত্য আমার রাজা, আমার প্রভু—’

চিত্রক নীরসকণ্ঠে বলিয়া চলিল—‘কুমার ভট্টারিকা রট্টা যশোধরাকেও আপনি কপট-পত্র পাঠাইয়া দুর্গে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—’

গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কিরাত বলিল—‘সকলেই আমাকে ভুল বুঝিয়াছে। ইহা দুর্দৈব ছাড়া আর কি হইতে পারে? ধর্মাদিত্য স্বয়ং কন্ডাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন—’

চিত্রক বলিল—‘সে বা হোক, সম্রাট স্বন্দগুপ্ত আদেশ দিয়াছেন অচিরেই বিটঙ্করাজকে আমাদের হস্তে অর্পণ করুন। সম্রাট তাঁহার সাক্ষাতের অভিলାষী।’

কিরাত বলিল—‘কিন্তু বিটঙ্করাজ আমার অধীন নয়, আমিই তাঁহার অধীন। সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করা না করা তাঁহার ইচ্ছা।’ ৩

‘তবে বিটঙ্করাজকেই সম্রাটের আদেশ জানাইব। তিনি কোথায়?’

‘তিনি এই ভবনেই আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অতিশয় অসুস্থ। তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইতে পারে না।’

কিছুক্ষণ উভয়ে চোখে চোখে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কিরাতের দৃষ্টি অবনত হইল না। শেষে চিত্রক বলিল—‘তবে কি বুঝিব সম্রাটের আজ্ঞা পালন করিতে আপনি অসম্মত?’

কিরাত ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—‘দূত মহাশয়, আপনিও আমাকে ভুল বুঝিতেছেন। আমি অসহায়। ধর্মাদিত্য আমাব রাজা, আমার পিতৃ-ভুল্য, তাঁহার জীবন বিপন্ন করিয়া আমি আপনাব সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটাইতে পারি না। বৈজ্ঞ আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন, কোনও প্রকার উত্তেজনার কারণ ঘটিলেই ধর্মাদিত্যের প্রাণবিয়োগ হইবে।’

কণেক চিন্তা করিয়া চিত্রক বলিল—‘মহারাজের সঙ্গে সন্ধিধাতা আসিয়াছিল, তাহার নাম হর্ষ। সে কোথায়?’

স্বন্দগুপ্তের দূতের কাছে কিরাত এ প্রশ্ন প্রত্যাশা করে নাই, সে চমকিয়া উঠিল। তারপর দ্রুতকণ্ঠে বলিল—‘হর্ষ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু গতকল্য কপোতকুটে ফিরিয়া গিয়াছে।’

‘আর নকুল? এবং তাহার সহচরণ?’

‘রাজকন্যা রট্টা যশোধরা আসিলেন না দেখিয়া তাহারাও কিরিয় গিয়াছে।’

কিরাত যে মিথ্যা কথা বলিতেছে তাহা চিত্রক বুঝিতে পারিল; হর্ষ ও নকুলের দল দুর্গই কোনও কূটকক্ষে বন্দী আছে। সে নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—‘দুর্গাধিপ মহাশয়, আমার দৌত্য শেষ হইয়াছে। সম্রাটকে সকল কথা নিবেদন করিব; তারপর তাঁহার যেরূপ অভিরূচি তিনি করিবেন। তিনি আপনাকে জানাইতে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তিনি স্বয়ং আসিয়া সহস্র হস্তী দ্বারা দুর্গ সমভূমি করিবেন। আপনাকে একথা জানাইয়া রাখা উচিত বিবেচনা করি।’

চিত্রক কিরিয়া দ্বারের দিকে চলিল।

‘দূত মহাশয়!’

কিরাত তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কিরাতের কর্ণধর মর্শ্বাহত, মুখের ভাব বংশবদ। সে বলিল—‘আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন মহাপরাক্রান্ত সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়া আমার লাভ কি? নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আমি—’

‘সে কথা সম্রাট বিবেচনা করিবেন।’

‘দূত মহাশয়, আপনাব প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে। আপনি কয়েকদিন অপেক্ষা করুন, এখনি কিরিয়া যাইবেন না। ইতিমধ্যে যদি ধর্মান্দিত্য আরোগ্য হইয়া ওঠেন তখন আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথোচিত কর্তব্য করিবেন। আমার দায়িত্ব শেষ হইবে।’

এ আবার কোন্ নূতন চাতুরী? চিত্রক বিবেচনা কবিয়া বলিল—‘আমি আগামী কণ্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা কবিত্তে পারি। তাহার অধিক নয়।’

কিরাত ললাট কৃষ্ণিত করিয়া বলিল—‘মাত্র কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত! ভাল, আপনাব যেরূপ অভিরূচি। আপনাদের সকলকে দুর্গ মধ্যে স্থান দিতে

পারিলে স্মৃথী হইতাম ; কিন্তু দুর্গে স্থানাভাব।—মরুসিংহ, দূত-প্রবরকে সসন্মানে দুর্গ বাহিরে প্রেরণ কর।’

মরুসিংহ হিংস্রচক্ষে চিত্রকের পানে চাহিল ; তারপর বাস্তব্যয় না করিয়া বাহিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। চিত্রক তাহার অমুগামী হইল।

ভবনের প্রতিহারতুমি পর্যন্ত আসিয়া চিত্রক একবার ফিরিয়া চাহিল। ঘোরের কাছে কিরাত পাড়াইয়া আছে। তাহার মুখে বংশবদ্য ভাব আর নাই, দুই চক্ষু হইতে কুটিল হিংসা বিকীর্ণ হইতেছে। চারি চক্ষুর মিলন হইতেই কিরাত ফিরিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

\* \* \* \*

চিত্রক যখন বৃক্ষবাটিকায় ফিরিয়া আসিল তখন সূর্যাস্ত হইতেছে। গুলিকে সমস্ত কথা বলিলে গুলিক গুম্ফের শ্রান্ত আকর্ষণ করিতে করিতে বলিল—‘হুঁ। অসভ্য বর্বরটার কোনও হুরভিসন্ধি আছে। রাত্রে সাবধান থাকিতে হইবে ; অতর্কিতে আক্রমণ করিতে পারে।’

কিরাতের যে কোনও গুপ্ত অভিপ্রায় আছে তাহা চিত্রকও সন্দেহ করিয়াছিল ; কিন্তু রাত্রে আক্রমণ করিবে তাহা তাহার মনে হইল না। অন্য কোনও উদ্দেশ্যে কিরাত কালবিলম্ব করিতে চাহে। কিন্তু কী সেই উদ্দেশ্য ? চিত্রকের দল ফিরিয়া না গিয়া এখানে থাকিলে কিরাতের কী সুবিধা হইবে ? কিবাত কি ধর্মান্দিত্যকে হত্যা করিয়াছে ? কিছা হত্যা করিতে চায় ? সম্ভব নয়। ইচ্ছা থাকিলেও আর তাহা সাহস করিবে না। তবে কী ?

গুলিক বলিল—‘দণ্ডেন গো-গদভে—লোকটাকে হাতে পাইলে লাঠোঁবাধ দিয়া সিধা করিতাম। যাহোক উপস্থিত সতর্ক থাকা দরকার। আমি দশজন গ্রহরী লইয়া মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পাহারায় থাকিব, বাকি রাত্রি তুমি পাহারা দিও।’

সন্ধ্যার পর চিত্রক বৃক্ষতলে কহল পাতিয়া শয়ন করিল। দেহ ও মন দুইই ক্লান্ত, সে অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

মধ্যরাত্রে গুলিক আসিরা তাহাকে জাগাইয়া দিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই গুলিক তাহার কহলে শয়ন করিয়া নিমেঘ মধ্যে নিদ্রাভিত্ত হইল এবং ঘর্ষর শব্দে নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিল।

বৃক্ষবাটিকায় ঘোব অঙ্ককার, চারিদিকে সৈন্যগণ ভূ-শব্দায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তরু-ছায়ার বাহিরে আসিয়া চিত্রক সাবধানে বৃক্ষবাটিকা পরিক্রমণ করিল। ভূমি সমতল নয়; অত্রতত্র বৃহৎ পাষণ খণ্ড পড়িয়া আছে, অঙ্ককারে দৃষ্টিগোচর হয় না। দশজন সৈনিক স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে প্রহরা দিতেছে। বাটিকার পশ্চাদ্ভাগে অশ্বগুলি ছন্দবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। বাহিরের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ কবিয়া চিত্রক কিছুই দেখিতে পাইল না; বন তমিশ্রাঘ সমস্ত একাকার হইয়া গিয়াছে। কেবল দুর্গেব উন্নত স্কন্ধ আকাশের গায়ে গাঢ়তর অঙ্ককাবের স্রায় প্রতীয়মান হইতেছে।

সতর্ক থাকি ব্যতীত প্রহরীর আব কিছু করিবার নাই। চিত্রক তরবারি কোমবে বাঁধিয়া অলস মস্তুর পদে বৃক্ষবাটিকা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। দুর্গ নিস্তর, শব্দ মাত্র নাই। নানা অসংলগ্ন চিন্তা চিত্রকের মস্তিষ্কে ক্রীড়া করিতে লাগিল। রটা .. স্কন্ধগুপ্ত . কিরাত ..

ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল। চন্দ্রের পবিপূর্ণ মহিমা আর নাই, অনেকখানি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তবু তাহার ক্ষীণ প্রভায় চতুর্দিক অস্পষ্টভাবে আলোকিত হইল।

পরিক্রমণ করিতে করিতে চিত্রক লক্ষ্য করিল, যে-দশজন সৈনিক পাহারা দিতেছে তাহারা প্রত্যেকেই একটি বৃক্ষকাণ্ডে বা প্রস্তরখণ্ডে পৃষ্ঠ রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের চক্ষু মুদিত। চিত্রক বিস্মিত হইল না; দাঁড়াইয়া ঘুমাইবার অভ্যাস প্রত্যেক সৈনিককে আয়ত্ত করিতে হয়।

অন্নমাত্র শব্দ শুনিলেই তাহার জাগিয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে তাহাদের জাগাইল না।

শত হস্ত দূরে দুর্গের তোরণ ও প্রাকার ম্নান জ্যোৎস্নায় ছায়াচিত্রবৎ দেখাইতেছে। অকারণেই চিত্রক সেই দিকে চলিল। ঐকবার তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে একটি চিন্তা ক্ষণিক রেখাপাত করিল—এই দুর্গ ত্রায়ত ধর্মত আমার !

অর্ধেক দূর গিয়া চিত্রক থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ; তারপব দ্রুত এক প্রস্তরখণ্ডের পশ্চাতে লুকাইল। তাহাব চোখের দৃষ্টি স্বভাবতই অতিশয় তীক্ষ্ণ। সে দেখিল, দুর্গের দ্বার নিঃশব্দে খুলিতেছে ; অন্ন খুলিবার পর দ্বারপথে একজন অশ্বারোহী বাহিব হইয়া আসিল।

চিত্রক কুক্ষিত পলকহীন নেত্রে চাষ্টিয়া রছিল। কিন্তু আর কোনও অশ্বারোহী বাহিরে আসিল না, দুর্গদ্বার আবার বন্ধ হইয়া গেল। যে অশ্বারোহী বাহিরে আসিয়াছিল, এতদূর হইতে মন্দাণেকে চিত্রক তাহার মুখ দেখিতে পাইল না। অশ্বারোহী বাম দিকে অশ্বের মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দ ছায়ার ত্রায় প্রাকারের পাশ দিয়া চলিল।

অশ্বারোহীর ভাব-ভঙ্গীতে আশ্চর্যগোপনের চেষ্টা পরিস্ফুট ; অশ্বক্ষুর হইতে কিছুমাত্র শব্দ বাহির হইতেছে না। চিত্রক একাগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিল—অশ্বের চারি পায়ে ক্ষুরের উপর বস্ত্রের মতো কিছু বাঁধা রহিয়াছে, তাই শব্দ হইতেছে না। কোথায় বাইতেছে এই নৈশ অশ্বারোহী—?

সহসা তড়িচ্চমকের ছায় চিত্রকের মস্তিষ্ক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পলকের মধ্যে কিরাতের সমস্ত কুটিল ছুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল। চিত্রক বুকিল অশ্বারোহী চোরের মত কোথায় ঘাইতেছে।

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

### উপসংহার

দুর্গ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে গিয়া অশ্বারোহী অশ্ব থামাইল। উপত্যকা এখানে সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, চারিদিকে উচ্চ নীচ প্রস্তরখণ্ড বিকীর্ণ ; সাবধানে অশ্ব চালাইতে হয়। পথ এত বিষসঙ্কুল বলিয়াই অশ্বারোহীকে চন্দ্রোদয়ের পর যাত্রা করিতে হইয়াছে ; উপরন্তু চন্দ্রালোক সবেও বেগে অশ্বচাণনা কবা সম্ভব হয় নাই। শব্দ নিবারণের জন্য ঘোড়ার পায়ে কর্পট বাঁধা ; এরূপ অবস্থায় ঘোড়া অধিক বেগে দৌড়িতে পারে না।

অশ্বারোহী পশুদিকে ফিরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দূর পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিল। প্রস্তরখণ্ডগুলি চারিদিকে কালো কালো ছায়া ফেলিয়াছে, সচলতার আভাস নাই ; সব স্থির নিথর। অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবরোধন করিল। ঘোড়ার ক্ষুরের কর্পট খুলিয়া এবার বেগে ঘোড়া ছুটানো যাইতে পারে ; শব্দ হইলেও শুনিবার কেহ নাই।

তিনটি ক্ষুরের বস্ত্র খুলিয়া অশ্বারোহী চতুর্থ ক্ষুরে হাত দিয়াছে এমন সময় ঘোড়াটা ভয় পাইয়া দুবে সরিয়া গেল। অশ্বারোহী চকিতে উঠিয়া গিছু ফিরিল, অমনি তরবারির অগ্রভাগ তাহার বুকে ঠেকিল। চিত্রক বলিল—‘মরুসিংহ, অশুভক্ষণে যাত্রা করিয়াছিলে। আমার সঙ্গে ফিরিতে হইবে।’

মরুসিংহের বুকে নোহুৎখালিক ছিল, সে এক লাফে পিছু হটিয়া সঙ্গে সঙ্গে তরবারি বাহির করিল। চিত্রকেব অসি তাহার বুকে বিঁধিল না, তাঁহাকে আব একটু দুবে ঠেলিয়া দিল মাত্র।

তখন মলিন চন্দ্রালোকে দুইজনে অসিযুক্ত হইল।

যুদ্ধ শেষ হইলে চিত্রক মরুসিংহের বুকের উপর বসিয়া তাহার হস্তদ্বয়

তাহারই উষ্ণীষ-বস্ত্র দিয়া বাঁধিল ; তারপর তাহাকে দাঁড় করাইয়া উষ্ণীষ-বস্ত্র তাহার কটিতে জড়াইল ; উষ্ণীষ-প্রাস্ত্র বামহস্তে এবং তরবারি দক্ষিণহস্তে ধরিয়া বলিল—‘এবার চল । হাঁটিয়া ফিরিতে হইবে । তুমি আগে চল, আমি পিছনে থাকিব । পলায়নের চেষ্টা করিও না—’

মরুসিংহ এতক্ষণ একটি কথা বলে নাই, এখনও বাঙ নিষ্পত্তি করিল না ।

তাহারা যখন তরুবাটিকায় ফিরিল তখন উবার আলোক ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে ; কিন্তু তখনও বাত্রি বোর কাটে নাই ।

চিত্রকের রহস্যময় অন্তর্ধান ইতিমধ্যে লক্ষিত হইয়াছিল । ছাঁউনীতে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল ; সকলে জাগিয়া উঠিয়াছিল । চিত্রক বন্দীসহ ফিরিতেই গুলিক ছুটিয়া আসিয়া বলিল—‘একি, কোথায় গিয়াছিলে ? এ কে ?’

চিত্রক বলিল—‘ইনি চষ্টনদুর্গের দুর্গপাল—মরুসিংহ । আগে ইহাকে শক্ত করিয়া গাছের কাণ্ডে বাঁধ । তারপর সব বলিতেছি ।’

মরুসিংহকে গাছে বাঁধিয়া দুইজন রক্ষী খোলা তলোয়ার হাতে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল । তখন নিশ্চিত হইয়া চিত্রক গুলিককে অন্তরালে লইয়া গিয়া রাত্রির সমস্ত ঘটনা বলিল ।

শুনিয়া গুলিক বলিল—‘তোমার অহুমানই সত্য । কিন্তু কেবল অহুমানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, হুগটার মুখ হইতে প্রকৃত কথা জানিতে হইবে ।’

চিত্রক বলিল—‘উহার নিকট হইতে কথা বাহির কবা শক্ত হইবে ।’

গুলিক বলিল—‘যদি সহজে না বলে তখন কথা বাহির করিবার অল্প পথ ধরিব ।’

তখন সূর্যোদয় হইয়াছে । চিত্রক ও গুলিক গিয়া মরুসিংহকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল । মরুসিংহ কিন্তু নীরব ; একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিল না ।



ক্রমে বেলা বাড়িয়া চলিল। নিরামিষ প্রশ্নে ফল হইতেছে না দেখিয়া গুলিক লাঠোঁষধের প্রয়োগ করিল। কিন্তু মরুসিংহের মুখ খুলিল না। দৈহিক পীড়ন ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। প্রাণে না মারিয়া যতদূর নৃশংসতা প্রয়োগ করণ যাইতে পারে তাহা প্রযুক্ত হইল।

দ্বিপ্রহর হইল। তথাপি মরুসিংহের মুখের অর্গল খুলিল না দেখিয়া গুলিক বর্ষা সহসা হুঙ্কার ছাড়িল—‘হতবুদ্ধি হুণ যখন প্রশ্নের উত্তর দিবেনা তখন উহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া লাভ নাই। উহাকে ঘোড়া দিয়া চিরিয়া ফেলিব। তবু একটা হুণ কমিবে।’

ঘোড়া দিয়া চিরিয়া ফেলার প্রক্রিয়া অতি সহজ। ষাঠাকে চিরিয়া ফেলা হইবে তাহার দুই পায়ে দুইটি রজ্জ্ব প্রান্ত বাঁধিয়া রজ্জ্ব দুটির অন্য প্রান্ত দুইটি ঘোড়ার সচিত বাঁধিয়া দিতে হইবে; তাঁরপর ঘোড়া দুইটিকে এক সঙ্গে বিপরীত দিকে ছুটাইয়া দিতে হইবে—

মরুসিংহকে মাটিতে ফেলিয়া তাহাব গুলকে রজ্জ্ব বাঁধা হইলে মরুসিংহ প্রথম কথা কহিল। বলিল—‘প্রশ্নের উত্তর দিব।’

দুইজন রক্ষী মরুসিংহকে টানিয়া দাঁড় করাইল।

অতঃপর প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল।

প্রশ্ন : গত রাত্রে চুপি চুপি কোথায় ঘাইতেছিলে ?

উত্তর : হুণ শিবিরে।

প্রশ্ন : হুণ শিবির কত দূর ?

উত্তর : এখান হইতে ত্রিশ কোশ বায়ুকোণে।

প্রশ্ন : পথ আছে ?

উত্তর : গুপ্তপথ আছে।

প্রশ্ন : তুমি হুণদের পথ দেখাইয়া আনিতে ঘাইতেছিলে ?

উত্তর : হাঁ।

প্রশ্ন : কে তোমাকে পাঠাইয়াছিল ?

উত্তর : দুর্গাধিপ ।

প্রশ্ন : তুমি নিজ ইচ্ছায় যাও নাই ? প্রমাণ কি ?

উত্তর : দুর্গাধিপের পত্র আছে ।

প্রশ্ন : কোথায় পত্র ?

উত্তর : আমার তরবারির কোষের মধ্যে ।

মরুসিংহের কটি ম্হটেতে তখনও শূন্য কোষ ঝুলিতেছিল। কোষ ভাঙ্গিয়া তাহার নিম্ন প্রান্ত হইতে লিপি বাহির হইল। অগুরুত্বকের পত্র, তদুপরি ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত লিপি। লিপি পাঠ করিয়া মরুসিংহকে 'আর প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইল না। গুলিক বলিল—'বন্দীকে পানাহার দাও। কিন্তু বাঁধিয়া রাখ। উহার ব্যবস্থা পরে হইবে।'

তারপর চিত্রক\*ও গুলিক দিবলে গিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিল। মন্ত্রণার ফলে দুইজন অস্বারোহী বার্তা লইয়া স্কন্দের স্কন্ধাবারের দিকে যাত্রা করিল। গুরুতর সংবাদ; অবিলম্বে সম্রাটের গোচর করা প্রয়োজন।

তারপর মন্ত্রণাহুযায়ী, অপরাহ্নেব দিকে চিত্রক একাকী দুর্গতোরণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল—'দুর্গস্বামীব সাক্ষাৎ চাতি।'

আজ্ঞ আর বিলম্ব হইল না। দুর্গদ্বার খুলিয়া গেল; চিত্রক প্রবেশ করিল।

কিরাত নিজ ভবনে ছিল, হাসিয়া চিত্রককে সম্ভাষণ করিল—'দূত মহাশয়, আপনি ফিরিয়া যাইবার জন্ত নিশ্চয় বড় চঞ্চল হইয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ধর্মান্ধিত্যের অবস্থা পূর্ববৎ, কোন উন্নতি হয় নাই। আপনাকে আরও দুই একদিন অপেক্ষা কবিত্তে হইবে।'

চিত্রক উত্তর দিলনা, স্থির দৃষ্টিতে কিরাতের পানে চাহিয়া রহিল।

কিরাত পুনশ্চ বলিল—'অবশ্য আপনারা যদি নিতান্তই থাকিতে না পারেন তাহা হইলে কল্যাণপ্রাপ্তে ফিরিয়া যাওয়াই কর্তব্য। কিন্তু যে কার্য

করিতে আসিয়াছেন তাহার শেষ না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া উচিত হইবে কি ?' কিরাতের কণ্ঠস্বরে গোপন ব্যঙ্গের আভাস ফুটিয়া উঠিল।

কিরাতের মুখের উপর স্থিবদৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া চিত্রক বলিল—‘আমরা ফিবিয়া না বাই ইহাই আপনার ইচ্ছা ?’

‘হাঁ—অদৃশ্য। সম্রাটের আদেশ—’

‘কিন্তু তাহাতে আপনার কোনও লাভ হইবে না।’

‘আমাব লাভ—?’ কিরাত প্রথর চক্ষে চাহিল।

চিত্রক শান্ত স্বরে বলিল—‘আপনি আশা কবিতোছেন আপনার নিমন্ত্রণ লিপি পাইয়া হুগ সেনাপতি সৈন্যে আসিয়া আমাদের হত্যা করিবে। কিন্তু তাহা হইবার নয়। মরুসিংহ ধরা পড়িয়াছে; যে অধম গুপ্তচর হুগদের পথ দেখাইয়া আনিতে পারিত, সে এখন আমাদের হাতে।’

কিরাত প্রশ্নবমূর্তিব হ্রায় দাঁড়াইয়া রতিল।

কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া চিত্রক আবার বলিতে লাগিল—‘আপনার পত্র হইতে আপনার অভিপ্রায় সমস্তই ব্যক্ত হইয়াছে। আপনি শত্রুকে ধরে ডাকিয়া আনিয়া প্রথমে নিরু দুর্গ এবং ধর্মানিত্যকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে চান; তারপব হুগেরা যাহাতে সহজে বিটক রাজ্য অধিকার করিয়া সম্রাট সন্দেহপূর্ব বন্টকস্বত্ব হইতে পারে সে জন্ম তাহাদের সাহায্য ববিত্তেও উচ্চত আছেন। আপনি রাজদ্রোহী—দেশদ্রোহী। কিন্তু সম্রাট সন্দেহ গুপ্ত ক্ষমাশীল পুণ্য। এখনও যদি আপনি তাঁহার বশতা স্বীকার কবিয়া বোট্ট ধর্মানিত্যকে আমাদের হস্তে অর্পণ করেন তাহা হইলে সম্রাট হয় তো আপনাকে ক্ষমা করিতে পারেন।’

এতক্ষণে কিরাত আশ্চর্যগিরির বিশ্লেষণের হ্রায় ফাটিয়া পড়িল। তাঁহার অগ্নিবর্ণ মুখে শিবা উপনিরা স্ফীত হইয়া উঠিল; সে উন্মত্তবৎ গর্জন করিবা বলিল—‘রাজদ্রোহী! দেশদ্রোহী! মূর্খ দূত, তুমি কী বুঝবে কেন আমি হুগকে ডাকিয়াছি! এ রাজ্য আমার—অধম ধর্মানিত্য

প্রবঞ্চনা করিয়া আবার পৈতৃক অধিকার অপহরণ করিয়াছে ! আমি বিটক রাজ্যের শ্রাব্য রাজা—’

চিত্রক বলিয়া উঠিল—‘তুমি শ্রাব্য রাজা ?’

বাধা অগ্রাহ্য করিয়া কিরাত ফেনায়িত মুখে বলিয়া চলিল—‘তথাপি আমি ধৈর্য ধরিয়া ছিলাম, বিদ্রোহ করিয়া নিজ অধিকার সবলে গ্রহণ করিতে চাহি নাই। আমি শুধু চাহিয়াছিলাম, ধর্মানিত্যের কণ্ঠকে বিবাহ করিয়া উত্তরাধিকার স্বত্রে সিংহাসন লাভ করিব। তাহাতে কাহারও ক্ষতি হইত না। কিন্তু নষ্টবুদ্ধি ধর্মানিত্য এবং তাহার নষ্টবুদ্ধি কণ্ঠা—’

চিত্রক বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল—‘বিটক রাজ্য জায়ত তোমার একথার অর্থ কি ?’

‘তাহা তুমি বুঝিবে না। হুণ হইলে বুঝিতে। আমার পিতা জুবুফাণ স্বহস্তে পূর্ববর্তী আর্থ রাজার মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়াছিলেন ; সেই অধিকারে বিটক রাজ্য আমার পিতার প্রাপ্য। হুণদের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে। কিন্তু চতুর ধর্মানিত্য—’

‘কি বলিলে ? তোমার পিতা পূর্ববর্তী আর্থ রাজাকে হত্যা কবিয়াছিল ? ধর্মানিত্য হত্যা করে নাই ?’

‘না। এ কথা সকলে জানে। কিন্তু এ পৃথিবীতে সূচিচার নাই—’

চিত্রকের তিলক ত্রিলোচনের ললাট বহির শ্রাব্য জলিতেছিল। সে কিরাতের দিকে একপদ অগ্রসর হইল—

এই সময় বাহিরে উচ্চ গণ্ডগোল শুনা গেল। দুই তিনজন প্রাকার স্কন্ধী কক্ষের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। একজন স্কন্ধধারী বলিল—‘দুর্গেশ, শত শত রণহন্তী লইয়া একদল সৈন্য দক্ষিণদিক হইতে আসিতেছে। বোধ হয় স্বয়ং স্কন্ধগুপ্ত। একটি হস্তীর মাথায় শেত ছত্র রহিয়াছে।’

\* \* \* \*

স্বন্দগুপ্ত বলিলেন—‘রট্টা বশোধরার নিকট পাশার বাজি হারিয়া-  
ছিলাম, তাই পণ রক্ষাব জ্ঞান আসিতে হইয়াছে। এখন দেখিতেছি  
আসিয়া ভাঙুই করিয়াছি।’

দুর্গেব মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে সভা বসিয়াছিল; স্বন্দের রণহস্তীর দল  
চক্রাকাৰে সভাস্থল ঘিরিয়া ছিল। দুর্গ এখন স্বন্দের অধিকারে। কিরাত  
স্বন্দেব বিকক্ষে দুর্গবাব রোধ করিতে সাহসী হয় নাই; প্রাণ বাঁচাইবার  
ক্ষীণ আশা লইয়া তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

এদিকে কপোতকূট হইতে চতুরানন ভট্ট অহুমান চারিশত সৈন্য সংগ্রহ  
করিয়া প্রায় স্বন্দের সমকালেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গর্ভপৃষ্ঠে  
আরোহণ করিয়া জম্বুক ও সঙ্গে আসিয়াছে।

স্বন্দ একটি প্রশস্ত বেদীৰ উপব বসিয়াছিলেন; পাশে ধর্মানিত্য।  
ধর্মানিত্যেব দেহ শুষ্ক শীর্ণ, মুখে ক্লেণের চিহ্ন বিद्यমান; কিন্তু তাঁহাকে  
দেখিয়া মৰণাপন্ন বোণা ববিষা মনে হয়না। বট্টা বশোধবা তাঁহার জাম্ব  
আলিঙ্গন করিয়া পদপ্রান্তে বসিয়াছিল। চিত্রক গুলিক ও আরও অনেক  
সেনামুখ্য সভাব সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান ছিল। কিরাত কিছু দূরে একাকী  
বক্ষ বাজবন্ধ কবিষা দাঁড়াইয়া ছিল।

ধর্মানিত্য ভগ্নস্ববে বলিলেন—‘আমার আব বাজাস্থে স্পৃহা নাই।  
আমি সংঘেব শবণ লইব। বাজাধিরাঞ্জ, আপনি আমার এই ক্ষুদ্র রাজ্য  
গ্রহণ করুন; আততায়ীৰ সন্ত্রাস হইতে প্রত্যকে রক্ষা করুন।’

স্বন্দ বলিলেন—‘তাগ করিতে পারি। কিন্তু আমি তো বিটক রাজ্যে  
থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতে পাবিব না। একজন স্থানীয় সামন্ত প্রয়োজন,  
যে সিংহাসনে বসিয়া প্রজা শাসন কবিবে। এমন কে আছে?’

ধর্মানিত্য বলিলেন—‘আমার একমাত্র কন্যা আছে—এই রট্টা  
বশোধরা।’ ববিয়া রট্টার মন্তকে হস্ত রাখিলেন।

স্বন্দ বলিলেন—‘রট্টা আপনার কুমারী কন্যা। যদি আপনার জামাতা থাকিত সে আপনার স্থলাভিষিক্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে পারিত, কাহারও ক্ষোভের কারণ হইত না। কিন্তু অনধিকারী ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইলে রাজ্যে অশান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, বর্তমান অবস্থায় তাহা বৃঙ্লনীয় নয়। ধর্মানিত্য, আপনি আরও কিছুকাল রাজদণ্ড ধারণ থাকুন। তারপর—’

ধর্মানিত্য সর্বিনয়ে যুক্তকরে বলিলেন—‘আমাকে ক্ষমা করুন। সংসারে আমার নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনার রাজ্য আপনি যাহাকে ইচ্ছা দান করুন; আমার কন্যার জ্ঞাত্য আর আমি অমুগ্রহ ভিক্ষা করি না। রট্টা আপনার স্নেহ পাইয়াছে, সে আপনারই কন্যা। আপনি প্রজার কল্যাণে যেরূপ ইচ্ছা করুন।’

সভা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; তার রট্টা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার চিত্রকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মূছ হাসিল; তারপরে স্বন্দের দিকে ফিরিল। বলিল—‘আয়ুস্মন, রাজ্যের শ্রাঘ্য অধিকারীর যদি অভাব ঘটিয়া থাকে আমি একজন শ্রাঘ্য অধিকারীর সন্ধান দিতে পারি।’

সকলে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিল। রট্টা বলিল—‘যে আর্ঘ্য রাজ্যকে জয় করিয়া পিতা বিটক রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন সেই আর্ঘ্যরাজ্যের বংশধর জীবিত আছেন—’

স্বন্দ বলিয়া উঠিলেন—‘কে সে? কোথায় সে?’

উত্তর না দিয়া রট্টা ধীর পদে গিয়া চিত্রকের সম্মুখে দাঁড়াইল। চিত্রক অস্তিত্বভাবে স্মৃজিত স্বরে একবার ‘রট্টা—!’ বলিয়া নীরব হইল।

রট্টা চিত্রকের হাত ধরিয়া স্বন্দের সম্মুখে লইয়া আসিল, বলিল—‘ইনিই সিংহাসনের শ্রাঘ্য অধিকারী।’

স্বন্দ সর্বিনয়ে বলিলেন—‘চিত্রক বর্মা—!’

রট্টা বলিল—‘ইহার প্রকৃত নাম তিলক বর্মা।’

স্বন্দ বলিলেন—‘তিলক বর্মা, তুমি ভূতপূর্ব আর্ঘ্য রাজ্যের পুত্র?’

চিত্রক বলিল—‘হাঁ। পূর্বে জানিতাম না, সম্প্রতি জানিয়াছি।’

স্বন্দ প্রশ্ন করিলেন—‘প্রমাণ আছে?’

চিত্রক বলিল—‘যিনি আমার গোপন পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন তিনিই প্রমাণ দিবেন। আমার কোনও আগ্রহ নাই।’

রট্টা বলিল—‘প্রমাণ আছে ; প্রয়োজন হইলেই দিব। কিন্তু আর্থ, প্রমাণের কি কোনও প্রয়োজন আছে?’

স্বন্দ তীক্ষ্ণ চক্ষে একবার রট্টার মুখ ও একবার চিত্রকের মুখ দেখিলেন। তাঁহার অধরে ঈষৎ ক্লিষ্ট হাসি দেখা দিল। তিনি বলিলেন—‘না, প্রয়োজন নাই। তিলক বর্মা, বিটঙ্কের সিংহাসন তোমাকে দিলাম। রট্টা যশোধরা, বিটঙ্কের রাজমহিষী হইতে বোধকরি তোমার কোনও আপত্তি নাই?’

রট্টা অধোমুখী হইয়া আবার পিতার পদতলে বসিয়া পড়িল। সভাস্থ সকলে চিত্রার্পিতবৎ এই দৃশ্য দেখিতেছিল, এখন হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

রোষ্ট্র ধর্মান্দিতা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; চিত্রককে সন্বেদন করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—‘বৎস, যৌবনের প্রচণ্ডতায় যে হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম তজ্জন্ম অন্ততাপে আনাব হৃদয় দম্ব হইতেছে। বিটঙ্কের সিংহাসন তোমাব, তুমি তাগ ভোগ কর। আব, আমার রট্টা যশোধরাকে গ্রহণ কবিয়া আমাকে ঋণমুক্ত কব।’

চিত্রক মস্তক অবনত করিয়া বলিল—‘আপনি যেচ্ছায় ঋণ পরিশোধ করিলেন ; আপনি মহাশুভব। কিন্তু অশ্রু একটি আদান প্রদান এখনও বাকি আছে।’

চিত্রক দ্রুতপদে কিরাতের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল ; বলিল—‘আমার পরিচয় শুনিয়াছ। পিতৃঋণ শোধ কবিতে প্রস্তুত আছ?’

রক্তহীন মুখ তুলিয়া কিরাত বদিল—‘আছি।’

চিত্রক বলিল—‘তবে তরবারি লও। আমাকেও পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।’

## পরিশিষ্ট

আবার কপোতকুট।

রাজপ্রাসাদ আলোকমালায় ঝলমল করিতেছে। চারিদিকে, বাতোগ্রাম।  
ঝলরী মুরলী মৃদঙ্গ বাজিতেছে; নগরীর পথে পথে নাগরিক নাগরিকার  
নৃত্যগীত আর শাস্ত্র হইতেছে না। পুরাতন রাজপুত্র ও নূতন রাজকুমারীর  
বিবাহ। দুই রাজবংশ মিলিত হইয়াছে। রোট ধর্মান্দিতা জামাতার হস্তে  
রাজ্যভার অর্পণ করিয়া চিত্রকুট বিভাবে আশ্রয় লইবেন। সম্রাট স্বন্দশুশ্র  
বরবধুর জন্ত স্বন্ধাবার হইতে পাঁচটি হস্তী উপহার পাঠাইয়াছেন। বিখ্যাম-  
ষাতক কিরাত মরিয়াছে।

সকলেই স্মৃধী; সকলেই আনন্দবন্ত। এমন কি বৃদ্ধ হুণ-বোদ্ধা মোঙের  
অধরে হাসি ফুটিয়াছে। প্রত্যেক মদিরা-ভাগনে নাগরিকেরা আনন্দ  
কোলাহল করিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে এবং মদ পান করাইতেছে। তাহার  
বহুশ্রুত গল্প শুনিয়া কেহই পলায়ন করিতেছে না, বরং উচ্চকণ্ঠে হাসি-  
তেছে; বলিতেছে—‘মোঙ, তারপর কী হইল? তারপর কী হইল?’  
মোঙের স্মরণাভিষিক্ত মন আনন্দে টলমল করিতেছে। সে ক্রমাগত গল্প  
বলিয়া চলিয়াছে।

রাজপ্রাসাদে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। গভীর বায়ে একটি পুষ্প-  
স্বরভিত কক্ষে চিত্রক রট্টা আর স্মরণোপা ছিল।

চিত্রক বলিল—‘স্মরণোপা, তুমি আমার সচিত্র দিশাসবাতকতা  
কল্পিয়াছ।’

স্মরণোপা চটুগকণ্ঠে বলিল—‘বিশাসবাতকতা না করিলে সন্দ্বীকে  
পাইতেন কি?’

পুষ্পাভরণভূষিতা রট্টার হাতে একটি রোপ্যনির্মিত বাণ \* ছিল;

\* আধুনিক কাঞ্চললতা



কঙ্কাকে বিবাহকালে ইহা ধারণ করিতে হয়। সেই বাণ দিয়া সুগোপার উরুর উপর মৃদু আঘাত করিয়া রট্টা বলিল—‘সুগোপা কি আমার কাছে কিছু শ্লোপন করিতে পারে। পর দিনই প্রাতে আসিয়া আমাকে তোমার সকল পরিচয় দিয়াছিল।’

চিত্রক রট্টার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—‘রট্টা, আমার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া তোমার কৌ মনে হইয়াছিল?’

রট্টার চক্ষুহুটি ক্ষণকাল তন্দ্রাবিষ্ট হইয় রহিল; তারপর সে বলিল— ‘সেদিন সন্ধ্যার পর চাঁদের আলোয় প্রাকারের উপর তোমার সহিত দেখা হইয়াছিল, মনে আছে? তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তোমাকে প্রতিহিংসা লইবার সুযোগ দিব, নচেৎ তোমার হৃদয় জয় করিব। কিন্তু তুমি প্রতিহিংসা লইলে না। তাই তোমার হৃদয় জয় করিলাম; আর তোমাকে ভালবাসিলাম।’

রট্টা চিত্রকের প্রতি বিদ্বাদ্বিলাস তুল্য কটাক্ষ হানিল, তারপর সুগোপার কানে কানে বলিল—‘সুগোপা, তুই এখন গৃহে যা—রাজি শেষ হইতে চলিল। আজিকার রাতে মালাকরকে আর বন্ধিত করিস না।’

সুগোপাও চুপি চুপি বহিল—‘বল না, নিজের মালাকর পাইয়াছ তাই আমাকে বিদায় করিতে চাও। আর বুঝি ত্বন্ সহিতেছে না?’ সুগোপা দৃংকাবে প্রদীপ নিভাইয়া দিবা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

তারপর সুখ স্বপ্নের স্রায় ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে।

ওদিকে হুণের সহিত রন্দগুপ্তের যুদ্ধ চলিতেছে। হুণ কখনও হটিয়া যাইতেছে, কখনও অতর্কিত পথে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। বিটক রাজ্যে এখনও হুণ প্রবেশ করিতে পারে নাই। চষ্টন দুর্গে অধিষ্ঠিত হইয়া গুলিক বর্মা সহস্র চক্ষু হইয়া সঙ্কট পথ পাহারা দিতেছে।

চিত্রক নিজ বাজ্যে এক সৈন্ত দল গঠিত করিবাছে। তিন সহস্র সৈন্ত  
কপোতকূট রক্ষার জন্ত সবদা প্রস্তুত হইয়া আছে।

একদিন সূর্যাস্তের সময় প্রাসাদ শীর্ষে উঠিয়া বট্টা দেখিল, চিত্রক স্থির  
হইয়া দাঁড়াইয়া পশ্চিম দিগন্তের পানে তাকাইয়া আছে। ‘

বট্টা কাছে গিয়া তাহাব বাহু জড়াইয়া দাঁড়াইল। ‘কি দেখিতেছ?’

চমক ভাঙিয়া চিত্রক বলিল—‘কিছু না। সূর্যাস্তের বর্ণগোরব কী  
অপূর্ব, মেঘ পাহাড় ও আকাশ একাকার হইয়া গিয়াছে—যেন বক্র-  
বর্ণ রণক্ষেত্র।’

বট্টা কিছুক্ষণ চিত্রকের মুখের উপর চক্ষু পাতিয়া রহিল, তাবপব  
বলিল—‘যুদ্ধে যাইবার জন্ত তোমাব মন বড় চঞ্চল হইয়াছে?’

ধরা পড়িয়া গিয়া চিত্রক একটু কবণ হাসিল। বট্টা তাহাব স্বক্কে  
হস্ত রাখিয়া বলিল—‘যদি মন অবীচ হইয়া থাকে, যুদ্ধে যাও না কেন?’

চিত্রক চকিতে একবার তাহাব পানে চাছিল, কিন্তু নীচব রহিল।  
বট্টা তখন দ্রব্য হাসিয়া বলিল—‘তোমার মনের কথা বুঝিয়াছি। তুমি  
ভাবিতেছ, হুণ আমাব স্বভাতি, তাহাদেব বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ বাধা কবিলে  
আমি হুঃখ পাইব। তোমাব বোধ হয় বিশ্বাস, স্বভাতিব বিবন্ধে যুদ্ধ  
করিতে হইবে বলিয়া পিতা বাধ্য ভ্যাগ কবিয়াছেন। সত্য কি না?’

চিত্রক বলিল—‘না, ধর্নাদিত্য অন্তব হইতে যুদ্ধ ওথাগতের শবণ  
লইয়াছেন। কিন্তু তুমি বট্টা? তোমাব দেষে হুণ বক্র আছে। আমি  
হুণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধা কবিলে সত্যই কি তুমি হুঃখ পাইবে না?’

বট্টা দৃঢ় ধবে বলিল—‘না। হুণ যেমন তোমাব শত্রু তেমনই আমার  
শত্রু। আমাব দেশ যে আক্রমণ কবে, পবমান্বীয় হইলেও সে আমার  
শত্রু। তোমার মন টানিয়াছে, তুমি বক্র যাও, স্বন্দগুপ্তের সহিত  
যোগদান কব।’

চিত্রক বট্টাকে বাহু বন্ধ কবিয়া বলিল—‘বট্টা, ভাবিয়াছিলাম আমার

রাজা বতদিন আক্রান্ত না হইবে ততদিন নিবপেক্ষ থাকিব। কিন্তু তবু গদম্ব স্বর্গীয় হইয়াছিল। তুমি আমার মনের কথা কি কবিয়া জানিলে?’

‘আমি অম্বর্গামিনী তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই?’ বট্টা হাসিল।

উৎসাহ ভবে চিত্রক বলিল—‘তবে নাই? আমি এক সহস্র সৈন্য লইয়া যাইব, বাকি দুই সহস্র পুত্রী বক্ষ্যাব জ্ঞাত থাকিবে।’

বট্টা বলিল—‘তুমি বাজা, তোমার বাগ হুচ্ছা কর। কিন্তু আমার অপস্থিতিতে বাজা দেখিবে কে?’

চিত্রক বলিল—‘তুমি দেখিবে। চতুর্ভুজ দেখিবেন।’

বট্টা অনেকক্ষণ স্বামী ব মুখে পানে চাহিয়া বহিল। চোখ দুটি ছিল ছল ছল কবিত্তে নাগিল। শেষে বাষ্পবদ্ধস্ববে বলিল—‘তুমি বখন বদ্ধ ভব ববধা দিবিয়া আসিবে, একটি নূতন মানুয পুবদ্বাবে নোমাকে বসার্থনা জানাহবে।’ বলিয়া স্বামী ব বক্ষে মুখ লুকাইল।

শেষ

---

শুকদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এর পাবলিশার্স  
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষ প্রিন্ট ওয়ার্কস  
২০৭/১১ কৰ্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট কলিকাতা—৬

---







